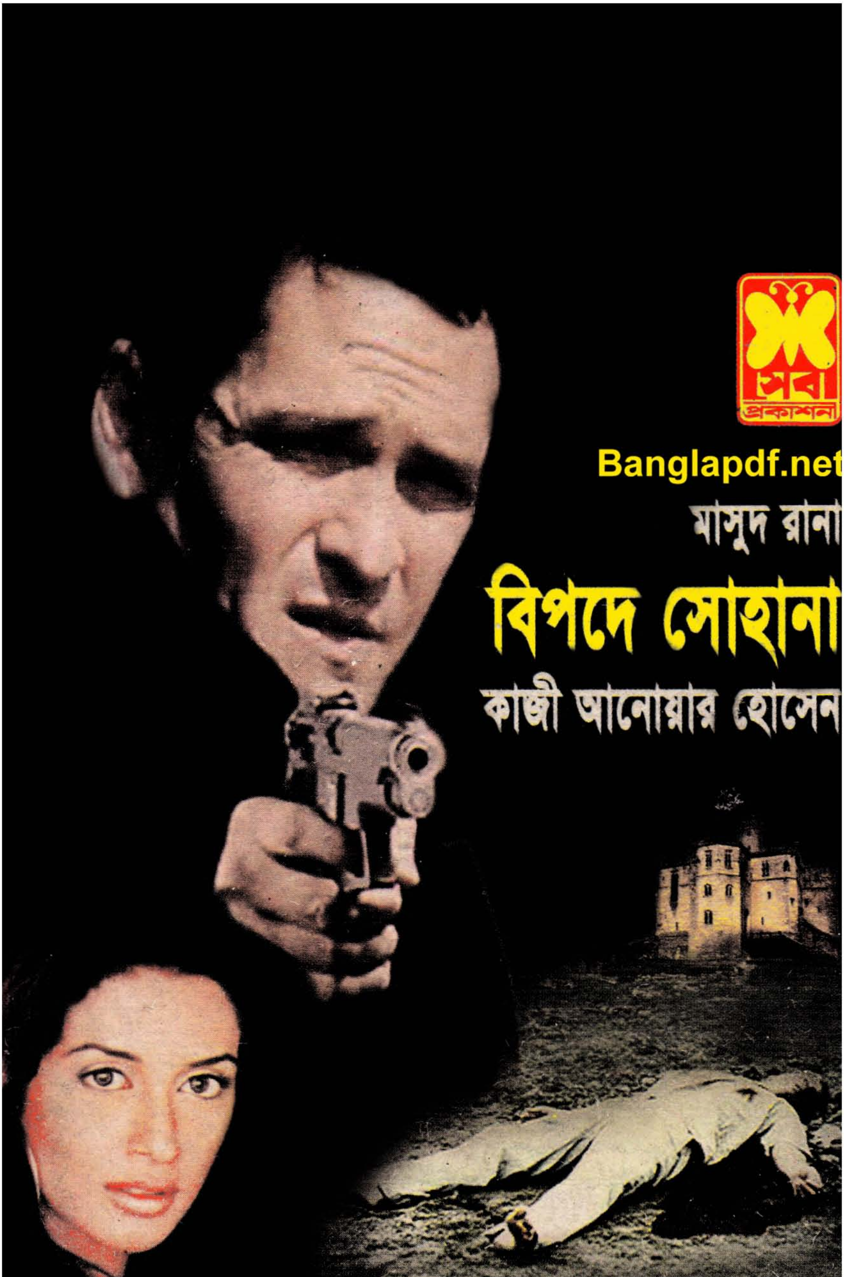
Banglapdf.net
মাসুদ রানা
বিপদে সোহানা
কাজী আনোয়ার হোসেন

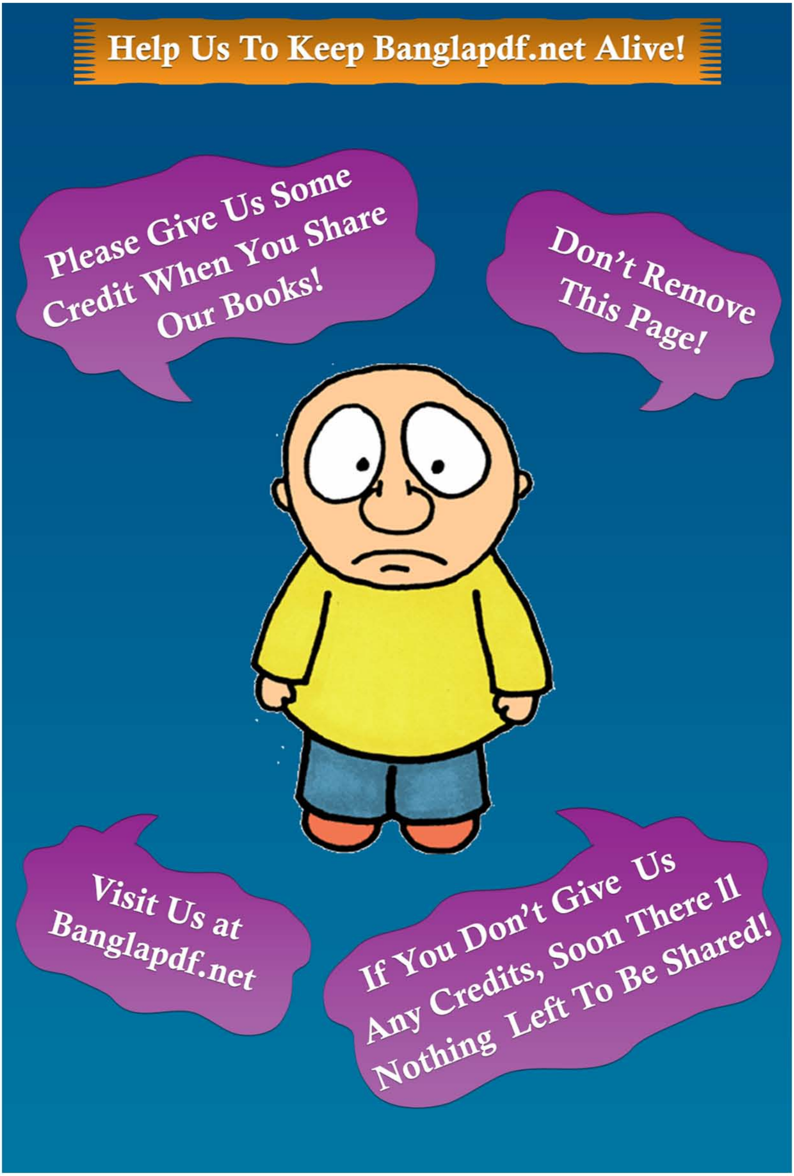
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৩৯৯

বিপদে সোহানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7399-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-399
BIPAUDEY SOHANA
Thriller Novelette
By: Qazi Anwar Husain

বাহান্ন টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

সূচি

বিপদে সোহানা	৫
খুনের দায়	৪৭
রানা-সোহানা	৮২
খুনে পিশাচ	১৩০
বিদেশি বৈজ্ঞানিক	১৯৭

বিপদে সোহানা

এক

আমি রানা বলছি।

ইংল্যাণ্ড। বার্কশায়ার কাউন্টির উইক্সফোর্ড গ্রামের ভেতর দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে চলেছি। যাচ্ছি সোহানার বান্ধবী লেডি জোয়ালিনের খামারবাড়ির উদ্দেশে। ছাদ নামিয়ে দিয়েছি বেণ্টলি কনভার্টিব্‌লের, মনে হচ্ছে যেন পক্ষিরাজে চড়ে উড়ে চলেছি—এমন মসৃণ রাস্তা। পশ্চিমের মেঘগুলোকে নানান রঙে রাঙিয়ে দিয়ে অস্ত গেছে সূর্য, এখন কালচে হয়ে বুজে আসছে গোধূলির আলো। রাস্তার দুপাশে কোমর-সমান সবুজ খেত, দুলছে জোর হাওয়ায়। পুবে আবছা ঢেউয়ের মত দেখাচ্ছে পাহাড়গুলোর আলোকিত চূড়া। কুয়াশা ঢেকে ফেলছে বিশ্ব চরাচর।

অনেকদিন ধরে সোহানা আর আমাকে ওর ওখানে একটা সপ্তাহ বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করছিল লেডি জোয়ালিন হেইফোর্ড। এতদিনে সময় করতে পেরেছি, সোহানা কী-এক কাজে আটকে গেছে, ও-ও এসে পড়বে দু'এক দিনের মধ্যে। কয়েকটা দিন গ্রামের নিরিবিলি, শান্ত পরিবেশে বিশ্রাম নিয়ে তরতাজা হয়ে ফিরে যাব যে-যার কাজে।

ড্রাইভওয়েতে গাড়ি থামতেই যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে, এমনি ভঙ্গিতে চার ধাপ সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল জোয়ালিন। খুবই সমাদর করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালো। বাটলার উইলিকে হুকুম দিল, 'রানার সুটকেস দোতলায় ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখতে

বলো গিলামকে। আর শার্লিকে বলো আমাদের বিকেলের কফি দিতে।'

ঘরে বানানো কেক-বিস্কুট আর ইয়া-বড় এক কাপ ভর্তি কফি শেষ হতেই দোতলায় নিয়ে গিয়ে আমার ঘরটা দেখিয়ে দিল ও। 'একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও, তারপর আমার বাগান আর নতুন জিমনেশিয়াম দেখাব তোমাকে। আগে দেখি, সাপারের কী ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'অত ব্যস্ত হওয়ার কিচ্ছু নেই, জোয়ালিন,' বললাম। 'রাত দশটার আগে খিদে লাগবে না। চলো, দেখি কী দেখাবে।'

হাত-মুখ ধুয়ে নেমে এলাম নীচে।

রান্নাঘরে একবার উঁকি দিয়েই চলে এল জোয়ালিন। বেরিয়ে পড়লাম ওর ফুল-ফলের বাগান আর জিমনেশিয়াম দেখতে। ওর চলাফেরায় কোনও আড়ষ্টতা নেই দেখে ভাল লাগল—বোঝাই যায় না, হাঁটুর নীচ থেকে কেটে বাদ দেয়া হয়েছে একটা পা।

এক বিশিষ্ট স্কটিশ আর্লের মেয়ে জোয়ালিন। বয়স আটাশ কি ঊনত্রিশ। দেখতে বেশ-ভাল থেকে অপূর্বর মধ্যে—যার যেমন লাগে। মা ছিল না, বাপের আদর ছিল অঢেল—একটু বখেই গিয়েছিল, বিশেষ করে আঠারোয় সাবালিকা হওয়ার পর। প্রথম দিকে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পার্টি, ক্লাব, ডান্স; স্পিডবোট, রেসিংকার ও বাপের প্লেন চালিয়ে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ানোতেই সীমাবদ্ধ ছিল দস্যিপনা; তারপর হঠাৎ করেই আর্লের অমতে বিয়ে করে বসল সুদর্শন এক টগবগে, স্মার্ট, বখাটে প্লেবয়কে।

সে তখন উঠতি বড়লোক, বিশাল ফার্মের মালিক। খুব অল্পদিনেই পৈত্রিক সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ খুইয়ে মদ ধরল ছোকরা, তারপর একদিন মাতাল অবস্থায় বেপরোয়া গাড়ি চালাতে গিয়ে মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট করল। ওর সঙ্গে জোয়ালিনও ছিল। হেইফোর্ড তো মরে বাঁচল, জোয়ালিন পড়ে গেল মহা বিপদে। দুই মাস নরকযন্ত্রণার পর হাসপাতালে একটা পা রেখে বেরিয়ে এল ও

ক্রাচে ভর দিয়ে। একজন নতুন মানুষ। বাবা ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজি হয়নি জোয়ালিন, স্বামীর খামার পরিচালনার ভার তুলে নেয় নিজের হাতে। চার বছর কঠোর পরিশ্রমের পর খামার থেকে লাভ আসতে শুরু করে। এখন তো ওটা রীতিমত সোনার খনি। ওর অসময়ে প্রায়ই এসেছি আমি এখানে সোহানার সঙ্গে, সাহায্য করেছি সাধ্যমত। তারপর কাজের চাপে ধীরে ধীরে কমে গেছে আসা-যাওয়া; দেখা হয় না বেশ অনেকদিন।

বছরখানেক আগে অবশ্য আর একবার এসেছিলাম। একা। সোহানার অনুরোধে আসতে হয়েছিল। ঢাকা থেকে ফোন করে বলেছিল, যেন একবার দেখা করি মেয়েটির সঙ্গে।

প্রথমে মুখ খুলতে চায়নি জোয়ালিন, তারপর চাপাচাপি করায় দু-এক কথায় যেটুকু আভাস দিল তাতে বুঝলাম: এত কষ্ট করে গড়ে তোলা ফার্মটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছে কেউ। এলাকারই কুখ্যাত কোন সন্ত্রাসী ওকে একা-মেয়েমানুষ পেয়ে নানান রকম জ্বালাতন শুরু করেছে। ওকে তাড়িয়ে দিয়ে সম্পত্তিটা দখল করতে চায়। ওর বিপদের কথা শুনে আমি যে এসেছি, তাতেই জোয়ালিন যার-পর-নাই কৃতজ্ঞ; কিছু করতে হবে না আমাকে, লোকটা অত্যন্ত নীচ ও ভয়ঙ্কর—আমি কিছু বলতে গেলে ক্ষতি হবে আমারও। গোলমালে না গিয়ে এখন মানে মানে কেটে পড়াই ভাল।

ও ভেবেছে, আমি নিরীহ ভদ্রলোক মানুষ, এসবে জড়িয়ে মহাবিপদ ডেকে আনব নিজের ওপর। বুঝলাম, আমাদের দুজনের পেশা সম্পর্কে কিছুই জানায়নি ওকে সোহানা। আমিও আর ও-নিয়ে উচ্চ-বাচ্য করলাম না। শুধু বললাম, এ-ধরনের রোগী আগেও দেখেছি আমি, আমার কাছে এ-রোগের ভাল দাওয়াই আছে—শুধু নামটা বলো। ও যখন বুঝল, সত্যিই সাহায্য করতে চাই, তখন ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল।

একেবারে ভেঙে পড়ার অবস্থা হয়েছিল বেচারির।

প্রথমে ওদের সর্দারটার সঙ্গে দেখা করে ভদ্র ভাবে বললাম

মেয়েটি একা নয়, ওকে যেন আর জ্বালাতন করা না হয়। প্রত্যুত্তরে সেইদিনই বিকেলে ষণ্ডামার্কা তিন স্যাঙাতকে নিয়ে হাজির হলো লোকটা, জোয়ালিনের চোখের সামনে পিটিয়ে আমাকে দুরস্ত করবে, এবং ওকেও হাতেকলমে শিখিয়ে দিয়ে যাবে কী করিলে কী হয়।

ওদের চারজনকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে লণ্ডন-পুলিশের এক সুপারকে জানিয়েছিলাম আমি ঘটনাটা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ যখন ওদেরকে ক'দিন হাজতে আটকে রেখে নরম জায়গা বেছে বেছে সকাল-বিকেল দাওয়াই দিল, তখন হুঁশে এল ওরা। লেডি উইলফোর্ডকে আর কখনও ঝামেলা পোহাতে হয়নি কোনওদিন।

দুই

রাতটা সেঁটে ঘুম দিলাম। পরপর দুটো দিন অপেক্ষা করেও সোহানা যখন এল না, তখন অস্থির হয়ে উঠলাম। একা একা কতদিন আর পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়! পরদিন খেত থেকে পার্ট্রিজ আর কবুতর শিকার করে, নদী থেকে মাছ ধরে তিত-বিরক্ত হয়ে ঘরে ফিরছি, পথেই বাটলার উইলি এসে খবর দিল: অনেক দূর থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

সন্ধে হয়ে আসছে, জোরে পা চালালাম।

দেখে পছন্দ হলো না আমার লোকটাকে। চমৎকার সুট পরেছে, সুন্দর স্বাস্থ্য, চোখ দুটো ধূসর, লালচে চুলের ফাঁক দিয়ে টাকের আভাস পাওয়া যায়, বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। ওপরের ঠোঁট লম্বা করে নীচে দাবিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসে। দেখলেই মনের

মধ্যে বেজে ওঠে বিপদসঙ্কেত।

মধুর হেসে জানতে চাইলাম কেন এসেছে। 'কোনও সুখবর?'

'খবর,' বলে ওপরের ঠোঁট টিপে হাসার ভঙ্গি করল লোকটা—সু নয়, শুধু খবর। 'একটু একান্তে দিতে চাই খবরটা, মিস্টার রানা। আমার নাম ট্রটম্যান। সবাই ট্রট বলে ডাকে।' খুবই নরম গলায় কথাগুলো বলল লোকটা, সুরে কিছুটা আইরিশ ও বেশিরভাগ আমেরিকান টান।

'ব্যক্তিগত? গোপনীয়? তা হলে চলুন, ভেতরে গিয়ে বসি।'

বাড়িতে জোয়ালিন নেই, বাজারে গেছে, জানি; তাই কথাটা বলে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম। জানি, লোকটা জরুরি কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়েই এসেছে; জীবন বীমা কিংবা নতুন ধরনের ইঁদুর-মারা কল বেচতে আসেনি। ঠিকই ধরেছি, ও ভেতরে ঢুকতেই ড্রইংরুমের দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে পিছন ফিরেই দেখলাম লোকটার হাতে পিস্তল, একটা নাইন এমএম লুগার, সোজা আমার বুকের দিকে তাক করে ধরা।

জমে গেলাম জায়গায়, বললাম, 'ওসব জিনিস সঙ্গে থাকলে যে-কোনও সময় আহত বা নিহত হতে পারেন, মিস্টার।'

সহজ ভঙ্গিতে বলল লোকটা, 'আসুন, বসে কথা বলি। এটা বের করেছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই যাতে আপনার মাথা গরম করে কিছু করে বসার ইচ্ছে না হয়, তাই।'

জ্যাকেট খুলে একটা হাতলহীন চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে দিলাম, তারপর বসলাম। কারণ, গায়ে জ্যাকেট আর চেয়ারে হাতল থাকলে দ্রুত নড়াচড়া করতে অসুবিধা। ট্রটম্যান কোট খুলল না, কিন্তু বসল আরেকটা হাতল-ছাড়া চেয়ারে। লোকটা আত্মবিশ্বাসী, তবে অতি মাত্রায় নয়। হাতে পিস্তল থাকলে অনেকের মধ্যে যে ডোণ্টকেয়ার একটা ভাব আসে, এর মধ্যে সেটা অনুপস্থিত। এ লোক পেশাদার, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে অস্ত্র ব্যবহার করবে না। মনে মনে এর

গ্রেড আরও ইঞ্চি দুয়েক ওপরে তুলে দিলাম।

এরকম লোক বিরল, কোটিতে গুটিক—তবে আগেও দেখেছি আমি এ জিনিস। পেরেকের মত শক্ত। অস্ত্র কেড়ে নিলেও হার মানবে না, হাত ভেঙে দিলেও থামবে না, কামড়ে জখম করতে চাইবে। এমন একরোখা, ত্যাঁদড় লোক সত্যিই কম পাওয়া যায়। কোনও সন্দেহ নেই, ট্রটম্যান তাদের মধ্যে একজন।

নরম গলায় বলল লোকটা, 'আমি গডরিজের হয়ে কাজ করছি। আপনাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে।'

মজার ব্যাপার, তাই হেসে উঠলাম। 'জন গডরিজ পাঠিয়েছে বুঝি আপনাকে? তা হলে তো বলতে হয়, এই প্রথম একজন দোজখ-ফেরত ভদ্রলোক দেখছি! হা-হা-হা!'

হাসল না ট্রট। বলল, 'সেদিন মারা যায়নি গডরিজ। আধমরা, মানে, শরীরের অর্ধেকটা মারা গেছিল। শুনেছি, অনেক ওপর থেকে পড়েছিল।'

তিন

দুশ্চিন্তার কথা। মিথ্যে বলে এই লোকের কোনও লাভ আছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে কি সত্যিকথাই বলছে ব্যাটা? গডরিজের বেঁচে থাকাটা আমার জন্যে মোটেই সুখবর নয়। জীবনে অনেক নীচ, নোংরা লোক দেখেছি আমি, কিন্তু এর মত আর একটাও দেখিনি। একসময় নারী ও শিশু আমদানি, পাচার ও বিক্রির ব্যবসাতে ছিল ওর একচেটিয়া মনোপলি। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ওদেরকে বিদেশে চাকরির লোভ দেখিয়ে সংগ্রহ করে প্রথমে তুরস্কে

পাঠানো হতো ওর ট্রেইনিং ক্যাম্পে। সেখানে অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমে ব্রেক করা, অর্থাৎ বাগে আনার পর সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপের বেশ কটি দেশ এবং দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশের পতিতালয়ে বিক্রি করা হত।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে এই রকম একটা চালানে টোপ হিসেবে পাঠানো হয়েছিল সোহানা চৌধুরীকে; চালানটা কোথা থেকে কীভাবে কোথায় যায় দেখার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। কিন্তু শেষ দেখা আর হলো না, ইস্তাম্বুলের এক গুদামে হামলা চালাতে বাধ্য হলাম সোহানার জরুরি ডাক পেয়ে।

সাত তলা বাড়িটা, মাঝখানে কনক্রিটের চারকোনা ফাঁকা জায়গা ছেড়ে চারপাশ ঘিরে ওয়্যারহাউস। গার্ডটাকে ঘায়েল করে প্রথমেই ছয়তলায় উঠে মুক্ত করলাম সোহানাকে, তারপর দুজন মিলে চার গুণ্ডার অস্ত্র কেড়ে নিয়ে হাত-পা ভাঙলাম। এক খবিশ এমনই চিৎকার শুরু করল যে, দূরের একটা কামরা থেকে মেশিন-পিস্তল হাতে গুলি করতে করতে বেরিয়ে এল স্বয়ং গডরিজ। আমরা তখন করিডোরে। ওকে আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করতে দেখে নিরুপায় হয়ে থ্রোইং নাইফটা ছুড়তেই হলো। দৌড়ের ওপর ছিল লোকটা, তখনও বিশ কদম দূরে। পষ্ট দেখলাম ওর পাঁজরের ফাঁক দিয়ে ঢুকে গেল ছুরির ছয় ইঞ্চি ফলা। বিকট এক আর্তনাদ ছেড়ে দুই হাত শূন্যে তুলল গডরিজ, তারপর রেলিঙে পিঠ দিয়ে উল্টে চলে গেল ওপাশে। নিজ চোখে দেখলাম, পঞ্চাশ ফুট নীচে কনক্রিটের মেঝেতে আছড়ে পড়ল ওর বিশাল দেহটা। এরপর আর দেখার কিছু বাকি থাকে? তিরিশজন তরুণী আর ছোট-বড় উনিশটা শিশু-কিশোরকে যার-যার দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে আমি চলে গেলাম রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির রোম শাখার কাজ দেখতে, সোহানা ফিরে গেল ঢাকায়।

যতদূর জানি, গডরিজের দল ভেঙে গিয়েছিল এর পর; অন্তত এই রুটে নারী ও শিশু পাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজ হঠাৎ

ট্রটম্যানের মুখে লোকটার বেঁচে থাকার কথা শুনে থমকে গেলাম —আছড়ে পড়ার কথাও বলছে। সোজা আমার দিকে চেয়ে আমার বক্তব্য শোনার অপেক্ষা করছে লোকটা, হাতের পিস্তল স্থির।

'হ্যাঁ,' বললাম। 'অনেক ওপর থেকে পড়েছিল। আধমরা হয়ে থাকলেও ওকে ভাগ্যবান বলতে হবে।'

'সেদিন থেকেই ওর নীচের অর্ধেক অসাড় হয়ে গেছে,' বলল ট্রটম্যান। হাসল ওপরের ঠোঁট নিচু করে। 'সেইজন্যে ও আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। গত দু-তিনটে বছর ওর মাথায় প্রতিহিংসা ছাড়া আর কোনও চিন্তা ছিল বলে মনে হয় না।'

'তার চেয়ে বছরের পর বছর হাজার হাজার শিশু-কিশোর ও নারীর কী সর্বনাশ করেছে, সেটা ভাবলে হয়তো সময় একটু ভাল কাটত,' বললাম। 'কোথায় ও?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল লোকটা। 'পরে, মিস্টার রানা। এখন বলে দিলে আমার কাজটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাবে।'

পিস্তলটার দিকে চাইলাম। 'তুমি মনে করেছ ওটা তাক করে ধরে আছ বলে লক্ষ্মী ছেলের মত সুড়সুড় করে তোমার সঙ্গে যাব আমি?'

'না,' আবার মাথা নাড়ল ট্রটম্যান, ওপরের ঠোঁট ঝুলে পড়ল আরও খানিকটা। 'যাবেন এই জন্যে যে, আপনার বান্ধবী সোহানা চৌধুরী এখন গডরিজের হাতে।'

মনে হলো তলপেট বরাবর প্রচণ্ড এক লাথি খেলাম। হাসির ভঙ্গি করে বললাম, 'এতই সহজ?'

'সহজ, যদি সতর্কতায় ঢিল থাকে, কোন্‌দিক থেকে ছোবল আসবে ধারণাই যদি না থাকে। এই একই ভাবে যে-কোনও মানুষকে কাবু করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু গডরিজ আপনাকে আস্ত চায়, চায় চোখ-কান খোলা অবস্থাতে স্বেচ্ছায় আপনি যেন ওর গুহায় ঢুকতে বাধ্য হন।'

মিলছে। গডরিজ এমনই চিজ। কাউকে ছুরি মারতে হলেও

ফলাটা একটু বাঁকিয়ে নেবে, যাতে ব্যথা বেশি লাগে। আর কথা না বাড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটা নিজের দিকে টেনে নিল ট্রটম্যান। চট্ করে ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে ডায়াল করল। লক্ষ করলাম, সাতটা নয়, নয়টা ডিজিট ঘোরাল ও—অর্থাৎ, দূরে কোথাও ডায়াল করেছে। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে বলল, 'হ্যাঁ, বলছি। ...আমার সামনেই বসে আছে। ...দিন ওকে।'

রিসিভারটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ঠেলে দিল ও আমার দিকে। তুলে নিলাম। 'রানা!' আমার সাড়া পেয়ে ককিয়ে উঠল সোহানা।

সোহানাই। কারও পক্ষে ওর কণ্ঠ নকল করে আমাকে অন্তত বোকা বানানো সম্ভব নয়।

'কোথায়?' জানতে চাইলাম। এটা জানা খুব দরকার।

'তা জানি না,' জবাব দিল সোহানা। 'কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ওদের কথা মত তুমি...' ঠাস করে একটা থাবড়া মারার শব্দ হলো, থেমে গেল কথা। বুঝলাম, মুখ চেপে ধরা হয়েছে ওর। দুই সেকেণ্ড পরেই ভেসে এল একটা পুরুষ কণ্ঠ। যদিও ঠিক চিনতে পারলাম না, তবে গলাটা যে গডরিজেরই, তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকল না। ঘৃণা যেন উথলে উঠছে ওর ভেতর থেকে।

চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল ও, 'নিশ্চয়ই তোমাকে আসতে বারণ করেছে? ওর পরামর্শ শুনো না, মাসুদ রানা! ট্রটের কাছ থেকে জেনে নাও, কী ঘটবে তুমি না এলে!'

কেটে গেল কানেকশন।

ফোনটা বাড়িয়ে দিলাম ট্রটম্যানের দিকে। নিল না ও। আঙুলের ইশারায় ওটা ক্রেড্‌লের ওপর রাখতে বলল। 'বুঝতেই পারছেন, সোহানা চৌধুরী এখন গডরিজের হাতে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ও, তার মধ্যে আমরা না পৌঁছুলে কী হবে, মুখ ফুটে বলতে চাই না; কল্পনা করে নিন। গডরিজ কখনও মিথ্যে হুমকি দেয় না—শুরু হবে কল্পনাতীত নির্যাতন।' কথাগুলোর মর্ম উপলব্ধির জন্য আমাকে কয়েকটা সেকেণ্ড সময় দিয়ে উঠে দাঁড়াল ট্রটম্যান। অস্ত্রটা

শোল্ডার-হোলস্টারে ভরে রেখে হাসল ওর চোখা হাসি। 'মনে হয় না এরপর আর অস্ত্র তাক করে রাখার দরকার আছে, কী বলেন?'

চার

সব যেন হিসেব করা। ওরা ঠিকই জানে, শুধু ওরা কেন, যারা আমাকে চেনে তারা সবাই জানে, যাব আমি—বেঁধে নেয়ার প্রয়োজন নেই, যাবই।

'বেশ,' উঠে দাঁড়ালাম। চেহারায় পরাজিত ভাব। চেয়ারের পিঠ থেকে ঝুলন্ত জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে গায়ে দেয়ার ছল করে ছুড়ে দিলাম ওর চোখ-মুখ সই করে, সেইসঙ্গে ঝাঁপ দিলাম সামনে। সরে যেতে চাইল, কিন্তু তার আগেই প্রায় উড়ে চলে এসেছি ওর কাছে। ডানহাতের আঙুলগুলো সামান্য ভাঁজ করে গিঁঠ দিয়ে প্রথমে ভয়ানক এক ঘুসি মারলাম ওর সোলার প্লেক্সাস বরাবর, হুঁক শব্দ করে বাঁকা হয়ে গেল লোকটা। তারপর জ্যাকেটটা বুকের কাছে নেমে যেতেই কানের নীচে ঝেড়ে দিলাম একটা বাঁ-হাতি কারাতে চপ্। টলে উঠল ট্রটম্যান।

মাটিতে পড়ার আগেই ধরে ফেললাম লোকটাকে, কাঁধে তুলে নিয়ে পিছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে রওনা দিলাম জিমনেশিয়ামের দিকে। গ্রামের সন্ধ্যারাত নিঝুম, চুপচাপ; মনে হচ্ছে বেজে গেছে রাত বারোটার বেশি। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে জিম। সব রকম যন্ত্রপাতি আছে ওখানে—নিয়মিত ব্যায়াম করে জোয়ালিন, সোহানা এলে সে-ও।

জিমে ঢুকে দরজা লক করে আলো জ্বেলে দিলাম। ধপাস করে

ফেললাম ওকে পুরু ম্যাটের ওপর। পিছমোড়া করে বাঁধলাম হাত দুটো, তারপর বের করে নিলাম পিস্তলটা। যেমন করে হোক জানতে হবে আমার কোথায় আটকে রাখা হয়েছে সোহানাকে। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এই হারামজাদাকে দিয়ে কথা বলানো সহজ হবে না। কথা আদায়ের ব্যাপারে আমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই, কারও সাহায্যও পাওয়া যাবে না এখন। হাতে সময় থাকলে না হয় স্কোপোলামিন ট্রুথ সিরাম দিয়ে আদায় করা যেত ঠিকানাটা, কিন্তু সময় একদম নেই। সোহানার ওপর না জানি কী অত্যাচার করছে ওরা, ভাবতেই মাথা খারাপ হয়ে যেতে চাইছে আমার। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, এ-লোক ভাঙবে, কিন্তু মচকাবে না। অত্যাচার করে লাভ নেই, মিথ্যে বলে সময় নষ্ট করবে। সম্ভব হলে ভয় দেখাতে হবে ওকে—তখন যদি মুখ খোলে।

শক্ত দেখে দড়ি খুঁজে নিয়ে জিমের ঝুলন্ত একটা রশি বেয়ে উঠে গেলাম ওপরে, বিমের সঙ্গে লাগানো পুলির মধ্য দিয়ে ওটার এক মাথা গলিয়ে দিয়ে নামিয়ে আনলাম নীচে। এবার অপর মাথায় ফাঁস বানিয়ে পরালাম লোকটার গলায়, তারপর পুলির ঠিক নীচে এনে রাখলাম একটা চেয়ার।

জ্ঞান ফিরে আসছে ট্রটম্যানের। ওই অবস্থায় দড়ি ধরে টেনে ওকে দাঁড় করালাম। যখন টলোমলো পায়ে দাঁড়াতে পারল, তখন অপরপ্রান্ত ধরে টানতে শুরু করলাম। ওর পাশেই চেয়ার। ওটায় উঠে দাঁড়ানো ছাড়া আর কোনও উপায় থাকল না ওর। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো, নড়তে পারছে না ভারসাম্য হারিয়ে চেয়ার থেকে পড়ে যাবার ভয়ে। দেয়ালের একটা আংটার সঙ্গে টান টান করে দড়িটা বেঁধে চেহারায় রাগ-রাগ একটা ভাব এনে ওর সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়ালাম, যেন ছায়াছবির ভিলেন।

'গর্দভের বাচ্চা, গর্দভ!' দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'কী মনে করিস তুই আমাকে? ভেবেছিস সোহানার বিপদের কথা শুনলেই সুড়সুড় করে গিয়ে ঢুকব তোদের গর্তে? সোহানার তাতে ওর কী

উপকার হবে রে, উল্লুক? গোটা ইংল্যাণ্ডে লোক রয়েছে আমার। বড় জোর বিশ মিনিট লাগবে আমার ওই বেজন্মাটার ঠিকানা বের করতে। একটু দেরি হবে, সোহানাকে হয়তো বাঁচানো যাবে না; কিন্তু জেনে রাখ্, তোর ওই বেজন্মা মনিব গডরিজও বাঁচবে না। তুইও না। আমি চললাম। যতক্ষণ খুশি দোল খেতে থাক্ এখানে।' কথাটা বলে চেয়ারটা কাত করলাম একটু, ওর পা দুটো ফসকে যেতে আবার ওটা সোজা করে বসিয়ে রওনা দিলাম দরজার দিকে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে আংটায় বাঁধা দড়িটা ইঞ্চি দুয়েক টেনে আবার বাঁধলাম। তারপর দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে চোখ রাখলাম একটা ফাটলে।

ফাঁসটায় স্লিপ নট দিইনি আমি ইচ্ছে করেই, দিয়েছি বউলিন নট। কাজেই ফাঁসিতে মরার ভয় নেই। কিন্তু ও তো সেটা জানে না, কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে দুই চোখ, দৃষ্টিতে মৃত্যুভীতি। দুই পা ছুড়ে হাঁসফাঁস করে আবার চেয়ারে ওঠার চেষ্টা করছে লোকটা। ওকে ওইভাবে রেখে মিনিট পাঁচেক পায়চারি করলাম বাইরে। ঠাণ্ডা হাওয়া খেয়ে কিছুটা শান্ত হলো মন, তারপর ব্যস্ত ভঙ্গিতে আবার ঢুকলাম জিমনেশিয়ামে। ট্রটম্যানের দিকে না তাকিয়ে দ্রুতপায়ে চললাম যন্ত্রপাতি রাখার কামরাটা লক্ষ্য করে। পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে এমন দৃষ্টিতে চাইলাম ওর দিকে, যেন এতক্ষণ বেঁচে আছে দেখে যার-পর-নাই অবাক হয়েছি। চেয়ারের সিটে কোনও মতে জুতোর আগাটা ঠেকিয়ে ধুঁকছে ব্যাটা, শ্বাস নিচ্ছে কেরোসিন কাঠে করাত চালানোর আওয়াজ তুলে। মুখ ফুলে উঠেছে, লালচে-নীল ছায়া পড়েছে চেহারায়। দুই চোখে এখন ভয় নয়, নিখাদ আতঙ্ক।

'বাহ্! ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হয়ে গেছ মনে হচ্ছে!' বলে এবার ঠাস করে চেয়ারটা ফেলেই দিলাম। এবং রওনা হলাম নিজের কাজে।

'শোনেন...!' ককিয়ে উঠল ট্রট। কিন্তু গলায় দড়ির চাপ লাগায় বন্ধ হয়ে গেল জবান। ঝুলছে, আর কথা বলার ভঙ্গিতে নড়ছে ওর

মুখ।

দু-চার কদম এগিয়ে থেমে গেলাম। যেন একটু দ্বিধান্বিত। তারপর ফিরলাম ওর দিকে। চোখ-মুখে তীব্র ঘৃণা ফুটিয়ে তুলে বললাম, 'ঠিক আছে... যদি সময় নিয়ে ধুঁকে ধুঁকেই মরতে চাস্, কোনও আপত্তি নেই আমার।' চেয়ারটা মেঝে থেকে তুলে ওর পায়ের কাছে আগের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে চলে গেলাম স্টোরে। মিনিট কয়েক লাগিয়ে স্টোর থেকে কিছু গ্যাজেট আর একটা মেডিকেল কিট নিয়ে ভরলাম মাঝারি সাইজের একটা ক্যানভাস ব্যাগে। বেরিয়ে এসে দেখলাম আবার চেয়ারে উঠে পড়েছে ট্রট, থরথর করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ, অনেক কষ্টে পায়ের ক'টা আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে টলছে। ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টায় দুলছে শরীরটা। ওর সামনে দিয়ে যাবার সময় হাত নেড়ে টা-টা করলাম, বানোয়াট মৃদু হেসে বললাম, 'দেখা হবে আবার।' আঙুল তুলে ওপরটা দেখালাম, 'ওই পারে।'

ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস রোগীর মত ঘড়ঘড়ে গলায় ডাকল ও আমাকে, 'দাঁড়ান! রানা! ওকে ওরা আটকে রেখেছে ক্লস্টারবার্গ...' মুখটা নড়ছে, কিন্তু আওয়াজ নেই—দম ফুরিয়ে গেছে।

ধীর পায়ে ফিরে গেলাম ওর কাছে, আবার চেয়ারে হাত রেখে বললাম, 'মিথ্যুক কোথাকার!'

ফুঁপিয়ে উঠে শ্বাস টানল ও, তারপর ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'যীশুর কিরে! ক্লস্টারবার্গ কাসল ইনভারনেস!'

বুঝলাম সত্যিকথাই বলছে। আমার সঙ্গে দর কষাকষিতে যায়নি লোকটা, কারণ ওর ধারণা সময় দেব না ওকে। কথাটা বলে ফেলে পাগলাটে চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, দৃষ্টিতে ভিখারির আকুতি। যেন ওর কথাটা বিশ্বাস করতে পারছি না, এমনি সুরে বললাম, 'তুমি আমাকে সে-ই ইনভারনেসে নিয়ে যাচ্ছিলে?'

মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে কণ্ঠনালীতে ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠল ট্রট, অনেক কষ্টে টাল সামলাল, তারপর বলল, 'সারারাত গাড়ি চালিয়ে

কাল দুপু... দুপুরে ওখানে...'

বুঝলাম, ঠিকই বলছে। ওর এই অবস্থায় গল্প বানানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া সময়টাও মিলছে—ইনভারনেসে পৌঁছতে এতটা সময়ই লাগার কথা। আর একটি কথা না বলে দেয়ালের আংটা থেকে খুলে দিলাম দড়িটা। চেয়ার থেকে হুড়মুড় করে পড়ল ও নীচে, খকখক করে কাশছে আর ফোঁপাচ্ছে। পিছমোড়া করে হাত দুটো বাঁধাই ছিল, এবার বাঁধলাম দুই পা। মেডিকেল কিট থেকে সিরিঞ্জ বের করে ফেনোবারবিটোন পুশ করলাম ওর বাহুতে। বেঘোরে কয়েক ঘণ্টা ঘুমাবে এখন। ভাল মত সার্চ করেও আর কোনও অস্ত্র পাওয়া গেল না ওর কাছে। নিশ্চিন্তে বেরিয়ে এলাম।

জোয়ালিন ফেরেনি এখনও, তাই বাটলার উইলিকে জানালাম ঘটনাটা সংক্ষেপে। মুহূর্তে ছানাবড়া হয়ে গেল ওর চোখ। আমি এখনই বেরিয়ে পড়তে চাই শুনে সচকিত হলো ও, বলল, 'দুটো মিনিট অপেক্ষা করুন, সার। আমিও আসছি।'

ওকে সঙ্গে নিলে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই হবে বেশি। বললাম, 'তুমি বরং জিমনেশিয়ামের হাত-পা বাঁধা লোকটাকে পাহারা দাও। বেশি কাছে যেয়ো না আবার। লেডি ফিরলে বোলো আমি ইনভারনেসে যাচ্ছি, আগামীকাল বিকেলের দিকে ফোন করব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে জিমের দিকে ছুটল বাটলার। জানি কোনও ভুল করবে না ও, কোনও প্রলোভনেই কাবু করতে পারবে না ওকে ট্রট। জামাকাপড় পাল্টে কালো পোশাক পরলাম, পিস্তল তো নিলামই, ডেনিম জ্যাকেটের ভিতর দিকে বুকের কাছে সেলাই করা একজোড়া খাপে ভরে নিলাম দুটো তীক্ষ্ণধার থ্রোইং নাইফ। ক্যানভাস ব্যাগে আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস ভরে নিয়ে নেমে এলাম নীচে।

পাঁচ

বেরোতে যাব, এমন সময় ফিরে এল জোয়ালিন। আমার চেহারা দেখে আঁৎকে উঠল ও।

'কী ব্যাপার! কী হয়েছে তোমার, রানা? কোথায় চললে?'

বললাম, সোহানার বিপদ। ওকে একটা দুর্গে আটকে রেখেছে একজন হিংস্র, প্রতিশোধপরায়ণ পুরনো শত্রু। শুনে আমার হাত ধরে টেনে বসাল জোয়ালিন। 'একটু স্থির হয়ে বসো, রানা। তাড়াহুড়ো করলে ভুল হয়ে যাবে কোথাও।' আমি আপত্তি করতে যাচ্ছি বুঝে চট্ করে জিজ্ঞেস করল, 'দুর্গটা কোথায়, জানা আছে তোমার?'

'ইনভারনেস-এ,' বললাম।

'ওখানে কোথায়?' শেল্ফ্ থেকে স্কটল্যাণ্ডের একটা ট্যুরিস্ট গাইড-বুক বের করল জোয়ালিন। নামটা শুনে নিয়ে পাতা উল্টে বের করে ফেলল ক্লস্টারবার্গ কাসল-এর বিবরণ। শহর থেকে কোন্ রাস্তা ধরে কোন্ দিকে কত দূর যেতে হবে তা-ও দেখানো আছে ছোট একটা ম্যাপে। বিবরণের স্বল্পতা দেখে বুঝলাম, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও দুর্গ নয় ওটা, সম্ভবত দুর্গের মত করে তৈরি প্রাচীন কোনও স্থাপনা।

'এবার রওনা হতে হয়, জোয়ালিন,' বললাম। 'হাতে সময় বেশি নেই। কাল দুপুরের মধ্যে আমি না পৌঁছলে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবে ওরা সোহানাকে।'

'গাড়িতে করে যাবে ভাবছ?'

'তার আগে একটা বিগল সংগ্রহের চেষ্টা করে দেখব।'

'আমার সঙ্গে প্লেনে যেতে পারো।'

'কীভাবে? যতদূর জানি, জায়গাটা প্লেন সার্ভিস রুটের বাইরে। কোনও প্লেন...'

'বাবা এখন লণ্ডনে। হিথরো থেকে ওঁর বিচক্রাফট ব্যারনটা ধার নেয়া যায়। আমি নিজে ওটা চালিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি গ্লাসগো পর্যন্ত। ওখান থেকে দুর্গটা খুব বেশি দূরে নয়।'

তাই তো! আর্ল ওটা ধার দেবেন কি না জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করলাম না। আমার ধারণা, অনুমতির ধার দিয়েও যাবে না জোয়ালিন। হিথরোতে ওকে আটকাবার সাহস পাবে না কেউ। যে-ই আপত্তি জানাবে, ঠাণ্ডা করে দেবে ও তাকে শীতল একটা চাহনি উপহার দিয়ে; সে-দৃষ্টির পেছনে থাকবে দশ-পুরুষের সমস্ত আর্লের কারিশমা। তারপর সেলফোনটা বের করবে বাবার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। মনে মনে খুশি হয়ে উঠলাম। ওই প্লেনে গেলে হাতে অনেক সময় পাওয়া যাবে, বিগলের চেয়ে বিচক্রাফটের স্পিড প্রায় দ্বিগুণ—২২৫ মাইল ঘণ্টায়।

আমি রাজি হতেই শার্লিকে খাবার দিতে বলল জোয়ালিন। রুচি নষ্ট হয়ে গেছে, তবু কিছু মুখে দিলাম। তারপর ফোনে যোগাযোগ করলাম গ্লাসগোর অ্যালবার্ট মুলার-এর সঙ্গে। আমার সঙ্গে পড়ত অক্সফোর্ডে, বেশ ঘনিষ্ঠতাও ছিল, কিন্তু মানসিক রোগের কারণে পড়া ছেড়ে দিয়ে ফিরে যায় স্কটল্যাণ্ডে। এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি, তবে বড়সড় একটা গ্যারেজ চালানোর মত যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে অল্পদিনেই। নিজের দেশে ফিরে গিয়েও পুরানো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছি আমি, খোঁজখবর নিয়েছি, প্রয়োজনে সাহায্য নিয়েছি, দিয়েছি। কাজের ফাঁকে যখনই সুযোগ হয়েছে, দেখা করে বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিয়েছি।

আমার গলা শুনে নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল ও, 'আঁঈ, মাসুদ?'

ওকে বললাম ভাল একটা গাড়ি হাজির চাই আমি আজ রাত ঠিক দুটোর সময় গ্লাসগো এয়ারপোর্টে। ও শুধু বলল, 'আঁঈ,

মাসুদ।' ব্যস, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সংযোগ।

বরাবরই কথা কম বলে অ্যালবার্ট, তবে যখন 'আস্থ' বলে তখন নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

'ছোটবেলায় আমরা দুই বোন বাবার সঙ্গে একবার ওই দুর্গে গিয়েছিলাম,' বলল জোয়ালিন। 'নামেই দুর্গ, আসলে ওটা বড়সড় একটা দালান। লক শিয়েলের উত্তরে, বিরান একটা এলাকায়।' ভুরু কুঁচকে স্মরণ করবার চেষ্টা করছে ও। 'এতই পুরনো যে, তখনই দেখেছি, বাড়ির একটা অংশ বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। কেন যে কেউ ওখানে ওটা বানিয়েছিল বোঝা কঠিন। ওখানে যারা থাকত, শুনেছি, দুর্গটা বিক্রি করতে না পেরে বছর কয়েক আগে সরে গেছে অন্যত্র। মনে হয়, এখন যারা আছে, তারা ভাড়া নিয়েছে ওটা।'

আমার বেন্টলিটা গ্যারেজ থেকে বের করে আনল পোর্টার গিলাম। ততক্ষণে কাপড় পাল্টে তৈরি হয়ে নিয়েছে জোয়ালিন। হিথরো এয়ারপোর্টে যাবার পথে তাড়াহুড়ো করলাম না, কারণ জানি, সময় আছে হাতে; আমাকে নিয়ে ট্রটম্যানের পৌঁছবার কথা আগামী কাল দুপুর নাগাদ। আমি না গেলে নির্যাতন শুরু হবে বলেছে ট্রট, আশা করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবে গডরিজ সোহানাকে। সব যদি এখন ঠিকঠাক চলে, রাত আড়াইটার মধ্যে পৌঁছে যাব আমি গ্লাসগোতে, ভোর সাড়ে চারটের দিকে পৌঁছব ক্লস্টারবার্গ দুর্গে; আঁধার পাব ঘণ্টা তিনেক, তারপর সকালটাও থাকছে হাতে।

লণ্ডনে আমাদের এজেন্সি, মানে, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির সামনে পাঁচ মিনিটের জন্যে থেমে স্টোর থেকে গোটা চারেক গ্রেনেড এবং আরও কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে ভরলাম ব্যাগে—জানি না, কোন্‌টা কাজে লাগবে।

কপাল ভাল, হিথরোতে খুব তাড়াতাড়িই ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেল। কোনও বিঘ্ন ছাড়াই উঠে পড়লাম আকাশে। কোর্স সেট করে অটো পাইলটে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো জোয়ালিন। দুর্গটার তেমন কোনও বর্ণনা দিতে পারল না ও; শুধু বলল: ওটা উঁচু পাঁচিল

দিয়ে ঘেরা, বাড়িটার আকৃতি অনেকটা ইংরেজি 'E' অক্ষরের মত, তবে মাঝের দাগটা নেই—একটা পাশে কেবল বসবাস করা হতো তখন, পশ্চিমের উইংটা ব্যবহারের একেবারেই অযোগ্য ছিল।

রাত ঠিক আড়াইটায় ল্যাণ্ড করল প্লেন। দুটো গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছে মুলার কারপার্কে। জাগুয়ার এক্সকেই-টা পছন্দ হলো আমার। এত রাতে ওকে কষ্ট দেয়ার কারণটাও বলতে হলো। সোহানাকে আটক করার কথা শুনে চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল ওর, বুক ফুলিয়ে ওর পাঁচ ফুট শূন্য ইঞ্চি দেহটা টান টান করে দাঁড়াল। প্রমাদ গনলাম, এক্ষুনি ও সঙ্গে যাওয়ার বায়না ধরবে। ঠিক তা-ই। বলল: ওর বাড়ির সামনে শুধু একটা মিনিট থামলেই টয়লেট থেকে ক্ষুরটা নিয়ে নেবে ও।

ওর মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাতে জোয়ালিনকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। একজন স্কটিশ আর্লের মেয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দেখে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো ওর। ওকে বোঝালাম, খুব গোপনে ঢুকতে হবে আমার ওই দুর্গে, তা ছাড়া লেডি জোয়ালিন হেইফোর্ডকে ভাল একটা হোটেলে ওঠার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, তাঁর দেখ-ভালেরও দরকার আছে, কাজেই...

ও শুধু বলল, 'আঈ, মাসুদ।'

উঠে পড়লাম জাগুয়ারে। বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে রিয়ার ভিউ মিররে দেখলাম, এদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা দুজন।

ছয়

নির্জন পথ। তুফান বেগে পেরিয়ে এলাম লক লোমণ্ড। উত্তর-পুবের গ্র্যামপিয়ানের মধ্য দিয়ে লক শিয়েলকে পাশ কাটিয়ে র‍্যানক মুর হয়ে দীর্ঘ বাঁক ঘুরে চলে এলাম ফোর্ট উইলিয়ামে; তারপর উত্তরের পথ ধরলাম। আরও এক ঘণ্টা পর গতি কমিয়ে সরু একটা গলি ধরে এগোলাম ক্লস্টারবার্গ কাসল-এর দিকে। বাতি নিভিয়ে আধ মাইল চলার পর গলি থেকে কিছুটা সরে গিয়ে ঝোপের আড়ালে রাখলাম গাড়ি। তারপর ব্যাগটা বের করে নিয়ে এগোলাম পায়ে হেঁটে।

চারটে বেজে পনেরো এখন। জানি এত উত্তরে আটটার আগে ভোর হবে না। জায়গামত পৌঁছতে পেরে মনটা হালকা হয়ে গেল। উদ্বেগ শেষ, এবার কাজ। বল আমার কোর্টে, হাতে সময়ও রয়েছে প্রচুর, গডরিজকে পাব অসতর্ক অবস্থায়। ও যতদূর জানে, আমি এখন ট্রটম্যানের সঙ্গে গাড়িতে করে মিডল্যাণ্ড পার হচ্ছি।

কাছে গিয়ে দেখলাম, ত্রিশ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে চারপাশ ঘেরা ছোট-খাট দুর্গটা—দেয়ালে প্রতিরক্ষার জন্য ব্যাটলমেণ্ট রয়েছে, কিছুদূর উঁচু, কিছুদূর সামান্য নিচু। দুর্গটা মাত্র তিনতলা, দেয়ালের বাহার দেখে মনে হয় বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি। কার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার আয়োজন কে জানে! এখানে দুর্গই বা কেন? কয়েকশ' বছর আগে মনে হয় যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত এদিকের গোষ্ঠিগুলোর নিজেদের মধ্যে।

চারদিক একপাক ঘুরে দেখলাম, বাইরে পাহারা নেই। ভেতরে

কেউ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। কারও কোনও সাড়াশব্দ নেই। খিলানের নীচে মাথায় চোখা শিঁক লাগানো সদর দরজাটা দুর্গের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নতুন—বয়স বড়জোর সোয়াশ' বছর হবে। পুরু শক্ত কাঠের তৈরি। ঠেলা দিয়ে দেখলাম ভেতর থেকে তালা বা হুড়কো দিয়ে আটকানো। গেটটা ডিঙিয়ে ভেতরে যাবার উপায় নেই, খিলান ও শিঁকের মধ্যে ফাঁক বড়জোর ছয় ইঞ্চি। পুব দিকে ছোট একটা পিছন-দরজা আছে, কিন্তু সেটাও একই ভাবে আটকানো। অর্থাৎ, প্রবেশ নিষেধ। ভেতরে কোনও রকম অ্যালার্মের ব্যবস্থা থাকতে পারে ভেবে দেয়াল টপকে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সদার দরজা থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে মাটিতে বসে ক্যানভাস-ব্যাগ খুললাম। পেন্সিল টর্চের আলোয় বাছাই করলাম কী কী সঙ্গে নেব, তারপর ওগুলো ছোট আরেকটা ব্যাগে পুরে ঝুলিয়ে নিলাম পিঠে। এবার একপ্রস্থ নাইলন দড়ির একদিকে বাঁধা নোঙরের মত একটা আংটা বের করে ছুড়ে দিলাম প্রাচীরের মাথা লক্ষ্য করে। নোঙরের দাঁড়াগুলো রাবার দিয়ে মোড়া বলে শব্দ হলো সামান্যই, আটকালো প্রথমবারেই।

সড়সড় করে উঠে যাচ্ছি, আর চার ফুট আছে দেয়ালের মাথায় উঠতে; আমাকে দেখে সোহানার কী প্রতিক্রিয়া হবে কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট; ওর হাসির প্রত্যুত্তরে হাসতে যাব—এমনি সময়ে অনুভব করলাম ঢিল হয়ে যাচ্ছে দড়িটা। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে একেবারে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে চুন-সুরকির গাঁথুনি, মন দেড়েক ওজনের একটা পাথর দেখলাম কাত হয়ে যাচ্ছে—এখুনি খসে পড়বে আমার ওপর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পড়তে শুরু করলাম।

বিশ-পঁচিশ ফুট ওপর থেকে মাটিতে পড়া শেখানো হয়েছে আমাকে। কিন্তু সেটা শুধুই পড়া—এখন সমস্যা রয়েছে আরও দুটো; চিত হয়ে পড়লে চলবে না, কারণ পিঠে রয়েছে শক্ত যন্ত্রপাতি ভরা পনেরো কেজি ওজনের ব্যাগ; আর তার চেয়েও বড় সমস্যা হচ্ছে পাথরটা, ওটার তলে পড়লে আমি শেষ। নীচে পড়তে পড়তে একই

সঙ্গে দুটো কাজ করছি—চেষ্টা করছি দেয়ালে লাথি মেরে পাথরটার নীচ থেকে সরে যাওয়ার এবং সেইসঙ্গে কাত হয়ে মাটিতে পড়ার।

যখন জ্ঞান ফিরল, চোখ মেলে তারা-জ্বলা আকাশ দেখতে পেলাম। মনে হলো, ডিপ ফ্রিজের ভেতর শুয়ে আছি, শুধু বাম কাঁধটা আগুনে পুড়ছে। আমাকে ছেঁচতে পারেনি, তিন ফুট দূরে চুপচাপ পড়ে আছে পাথরটা। পিঠ দিয়েও পড়িনি মাটিতে, ব্যথা নেই ওখানেও। আসলে যেটা হয়েছে: পড়েছি বাম কাঁধের ওপর, ডিযলোকেট হয়ে গেছে ওটার হাড়। উঠে বসে ছুঁয়ে দেখলাম, ফুলে উঠেছে জায়গাটা, সরে গেছে হাড় জয়েন্ট থেকে।

চমৎকার!

দুঃখের হাসি এলো। গাধা আমি একটা! নিজেকেই রক্ষা করতে পারি না, এসেছি আরেকজনকে উদ্ধার করতে! উঠে দাঁড়িয়ে ডান কাঁধ ঠেকিয়ে হেলান দিলাম দেয়ালের গায়ে। ব্যথাটা মখমল কাপড় দিয়ে মুড়ে মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছি, সেই সঙ্গে ভাবছি: এখন কী করব। ফিরে তো যাবই না, কিন্তু কী করে পার হব এই তিরিশ ফুট উঁচু দেয়াল!

ধীরে ধীরে কমে আসছে ব্যথার তীব্রতা। কৌশলটা তিব্বতের পঁচিশ বছর বয়সী এক জ্ঞানী ঋষির কাছে শিখেছিলাম। তিনমাসের ট্রেইনিং নিতে হয়েছিল আমাদের তাঁর কাছে। বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান ওখানে পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কয়েকজনকে। শুনেছিলাম, বয়স তাঁর একশ' পঁচিশ, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। কারণ, আমার কাছে চেহারা, চালচলন ও শারীরীক শক্তি দেখে তাঁকে তরতাজা এক যুবক বলে মনে হয়েছিল।

ব্যথাটাকে যখন যথেষ্ট দূরে পাঠিয়ে দিতে পারলাম, তখন কিছুটা সরে গিয়ে আবার ছুড়লাম আংটা। এবার বেয়ে ওঠার আগে মিনিট কয়েক রশি ধরে ঝুলে, টেনে বুঝে নিলাম। এক হাত, দু'পাটি দাঁত আর দুই পায়ের সাহায্যে তিরিশ ফুট বেয়ে ওঠা নিশ্চয়ই

অসম্ভব কিছু নয়। কারণ, মিনিট বিশেকের চেষ্টায় উঠে তো পড়লাম দেয়ালের মাথায়। তারপর পাঁচ মিনিট হাঁপিয়ে নিয়ে রশিটা ভেতরে ফেলে প্রায় একই সমান কষ্ট করে নামলাম নীচে।

নীচতলায় পুবের একটা ঘরে আলো দেখে এগোলাম সেদিকে। পর্দা নেই জানালায়, একটা ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন জ্বলছে, কাছেই টেবিল ঘিরে বসে তাস খেলছে চারজন লোক, টেবিলের ওপর রাখা অ্যাশট্রেটা উপচে পড়তে চাইছে, গ্লাসগুলো আধখালি। পঞ্চমজন বসে আছে চুলোর আরেক পাশে, হুইল চেয়ারে। একনজর দেখেই চিনলাম—জন গডরিজ। পা থেকে কোমর পর্যন্ত একটা কম্বল দিয়ে ঢাকা। চুমুক দিচ্ছে মদের গ্লাসে। আগুনের দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। কিন্তু চেহারার এ কী হাল! কোথায় সেই প্রাণবন্ত জওয়ান, বিশালদেহী দৈত্য? কাঠামোটা এখনও বড়, কিন্তু মনে হচ্ছে হাড় ক'খানাই আছে, প্রাণ নেই তার ভেতর। অসংখ্য বলীরেখা পড়েছে চুপসে যাওয়া গালে। বোঝা যায়, ভেতর থেকে দীর্ঘদিন ধরে কী যেন খেয়েছে তাকে কুরে কুরে।

বাকি চারজন কমবেশি ট্রটম্যানেরই সামান্য অদলবদল। এদের পুষতে খরচ হয় মেলা, তবে গডরিজ আবার সে খরচ সুদে আসলে তুলে নেয় এদেরই মাধ্যমে। এত রাত পর্যন্ত সব কটা জেগে আছে দেখে খুব একটা অবাক হলাম না—গডরিজ বরাবরই নিশাচর।

জানালাটা চার সুতি রডের গ্রিল দিয়ে সুরক্ষিত। স্বাভাবিক। ধারণা করলাম, চোর ঠেকানোর জন্য নীচতলার প্রতিটি জানালাতেই এরকম গ্রিল দেয়া থাকবে। আশপাশের কয়েকটা জানালা পরীক্ষা করে দেখলাম, ঠিকই ধরেছি। এদিক দিয়ে ঢোকা কঠিন। ভাবলাম, দোতলা বা তিনতলার জানালায় হয়তো এমন গ্রিল থাকবে না। দোতলায় ওঠার আগে কে কী করছে আর একবার দেখার জন্য ফিরে এলাম আলোকিত জানালার ধারে।

দেখলাম, ট্রে হাতে কামরায় ঢুকছে ওদের একজন, তাতে বড় একটা ডিশে অনেকগুলো পুরু স্যাণ্ডউইচ। সবাই হুম-হাম খাওয়া

শুরু করল, কিন্তু গডরিজ ফিরেও তাকাল না খাবারের দিকে, বসে থাকল যেমন ছিল তেমনি। আবার খুলল দরজাটা। কামরায় ঢুকল সোহানা। পেছনে পিস্তল হাতে আরেক লোক। সম্ভবত গার্ড।

আমার নাড়ি-ভুঁড়ি লাফ দিল কাতলা মাছের মত। সোহানার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। পরনে গোলাপি উলেন সালোয়ার-কামিজ। জামার এখানে ওখানে ছেঁড়া। একটা গাল লাল হয়ে আছে, চুল অবিন্যস্ত। ধীর, শান্ত পায়ে ঢুকল ও, তারপর ধাক্কা খেয়ে চলে এলো টেবিলের কাছে। পেছনের লোকটার নির্দেশে একটা চেয়ারে বসল সোহানা, পিছন ফিরতে দেখলাম তার দিয়ে বাঁধা ওর হাত দুটো। কাঁটা তার। হাতে রক্তের দাগও দেখলাম স্পষ্ট।

মাথায় রক্ত উঠে আসছে টের পেয়ে রাগটা সামলে নিলাম দাঁতে দাঁত চেপে। প্লেটের ঝামেলায় গেল না, সোহানার সামনে টেবিলের ওপর একটুকরো স্যাণ্ডউইচ রেখে কিছু বলল পেছনের পিস্তলধারী। এতক্ষণে ঘাড় ফেরাল গডরিজ। দেখবে, কুকুরের মত মাথা নামিয়ে কীভাবে খায় মেয়েটা। এতে কিছুটা হলেও আনন্দ হবে তার।

খাওয়া খাওয়াই, খাদ্য শক্তির উৎস; অপমানের ধার ধারল না সোহানা, মাথা নামিয়ে কামড় দিল স্যাণ্ডউইচে। আমিও আর দাঁড়ালাম না, দোতলার জানালা খুলে ঢোকা যায় কি না দেখতে হবে। একবার ঢুকতে পারলে নীচে নেমে আড়াল থেকে দেখা যাবে খাওয়া শেষ হলে ওকে কোথায় নিয়ে রাখা হয়। ওর কব্জিতে বাঁধা কাঁটাতার না খুলে কোনও গোলমাল পাকাতে চাই না। কিন্তু খুলব কী করে, ওয়ায়ার-কাটার তো রয়ে গেছে দেয়ালের বাইরে! ওটা আনার উপায় নেই এখন আর।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাইরের দেয়াল থেকে রশি আর আংটা খুলে নিয়ে এলাম। আলোকিত জানালা থেকে গজ পঁচিশেক দূরে দোতলার একটা জানালা সই করে ছুড়লাম নোঙরটা। দ্বিতীয় বারে আটকাল ওটা জানালার গোবরাটে। ভালমত টেনে-টুনে দেখে নিয়ে উঠতে শুরু করলাম। কাঁধের ব্যথাটা বার বার ফিরে ফিরে আসতে

চাইছে, চাকু বসাচ্ছে কলজে বরাবর; বাম হাতটা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে; তার পরেও অনেক কষ্টে উঠলাম ওপরে। হাঁ করে হাঁপাচ্ছি, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি কাঁচের ওপাশে চার সুতি রডের গ্রিল! নাহ্, আজ কপালটা বার বার ধোঁকা দিচ্ছে। দিশেহারা বোধ করছি।

জানালার গোবরাটে বসে বিশ্রাম নেব মনে করে ডান বাহুর চাপ দিয়ে উঠতে যাব, এমনি সময়ে বাতি জ্বলে উঠল ঘরে। এত দ্রুত নিচু হলাম যে, আর একটু হলে পড়েই যাচ্ছিলাম। একহাতের চার আঙুল বাধিয়ে ঝুলছি গোবরাট থেকে, দুই পায়ে চেপে ধরতে চেষ্টা করছি রশি। সেই অবস্থাতে টের পেলাম, কপালটা আজ খুব বেশি খারাপ নয়; এক চান্সেই ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি—সোহানাকে ঘরে ফিরিয়ে এনেছে গার্ড।

সাবধানে চোখ তুললাম। দেখলাম গার্ডটা ফিরে যাচ্ছে। দরজা বন্ধ হওয়ার আগে লক্ষ করলাম, বাইরের দিকে খোলে ওটা, ওদিক থেকে হুড়কো লাগানোর ব্যবস্থা আছে। সোহানা বসে আছে গদিহীন একটা লোহার খাটিয়ায়। ঘরে একটা চেয়ার ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। কী করে গোবরাটে উঠলাম বলতে পারব না, তবে মনে হলো পুরো একশ' বছর লেগেছে।

দেখলাম, খাটিয়ার পাশে মেঝেতে বসে শরীর দুলিয়ে কী যেন করছে সোহানা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারলাম লোহার খাটের একটা সরু ফাঁকে তারের মাথা ঢুকিয়ে উল্টো প্যাঁচ দিয়ে বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে ও। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে করছে কাজটা, সেজন্যই রক্ত দেখেছি ওর কব্জিতে।

জানালার কাঁচে আস্তে করে দুটো টোকা দিলাম। মাথা ঘুরিয়ে এদিকে চাইল সোহানা, তারপর উঠে এগিয়ে এল। কাঁচের এপাশে আমাকে দেখতে পেয়ে এমন একটা হাসি দিল, যেন পাঁচশ' ওয়াট বাতি জ্বলে উঠল ওর মুখে, ধাঁধিয়ে গেল আমার চোখ। আমাকে বড়শিতে গেঁথেছে তো ওই হাসি দিয়েই।

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা-গ্লাস কাটার বের করে জানালার নীচের দিকে গোল করে খানিকটা কাঁচ কাটলাম, তারপর টোকা দিতেই আলগা হয়ে গেল টুকরোটা। মাথা নিচু করল সোহানা, ফিসফিস করে জানতে চাইলাম, 'গ্রিল?'

চাপা গলায় জবাব দিল ও, 'একদিকে কব্জা, অন্যদিকে তালা। খোঁচানোর কিছু আছে তোমার কাছে?'

'আছে,' বললাম। পকেট থেকে প্ল্যাস্টিকের একটা ব্যাগ বের করে এগিয়ে দিলাম, 'কিন্তু এটা তোমার হাতে দেয়া কি ঠিক হচ্ছে? বাকি জীবন খুঁচিয়ে মারবে না তো আবার?'

মুচকি হেসে পিছন ফিরল সোহানা, ওর হাতে ধরিয়ে দিলাম একটা প্রোব। চেয়ারটা জানালার ধারে এনে রাখল ও, তারপর ওটায় উঠে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল তালার দিকে।

দুই মিনিট পর চেয়ার থেকে নেমে মাথা ঝাঁকাল ও। কাঁচের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ঠেলা দিলাম, সরে গেল গ্রিল। আবার চেয়ারে উঠে জানালার ক্যাচ খুলে দিল ও। দশ সেকেণ্ডের মধ্যে ঢুকলাম ঘরের ভেতর।

পরিষ্কার আলোয় আমাকে দেখে চমকে উঠল সোহানা, ছুটে এলো কাছে। 'কী হয়েছে তোমার, রানা? কী হয়েছে কাঁধে?'

ওর কণ্ঠের উদ্বেগ হয়তো আমার ভেতর বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। সত্যি বলছি, নিয়ন্ত্রণ আর বজায় রাখতে পারলাম না, হঠাৎ করে কাবু করে ফেলল আমাকে অসহ্য ব্যথা। চেহারাটা বিকৃত হয়ে গেল, মাথা ঘুরছে, চোখ উল্টে কোনও মতে দুই পা এগিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম খাটিয়ার ওপর। এবং আবার জ্ঞান হারালাম।

খুব সম্ভব মিনিট দুয়েক অজ্ঞান ছিলাম। যখন চোখ মেললাম, তখন আমি চিত হয়ে শুয়ে আছি খাটের ওপর। পিঠের বোঝাটা নেই। সোহানার হাতে এখনও কাঁটাতারের বাঁধন, কিন্তু হাতদুটো এখন সামনে। কোমর ও পা গলিয়ে সামনে নিয়ে এসেছে ও হাত দুটো অমানুষিক কষ্ট করে। দেখলাম, আরও কয়েক জায়গায়

ছিঁড়েছে ওর কাপড়, দুই উরুর বাইরের দিকে রক্ত, কব্জিতেও নতুন ক্ষত।

আমার জ্ঞান ফিরেছে দেখে কাছে এসে কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বলল ও, 'এখুনি আসবে আবার লোকটা। দশ মিনিট পর পর একবার করে দেখে যায় আমাকে,' বলে হালকা ভাবে গলা পেঁচিয়ে ধরল আমার। বুকে কাঁটাতারের খোঁচা খেলাম। দু'হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছে সোহানা আমার করোটেড আর্টারি। 'এবার আবার একটুখানি ঘুম দিয়ে ওঠো তো, লক্ষ্মী। নইলে লাগবে খুব। তোমার কাঁধটা এক্ষুনি সেট না করলেই...

নয় শব্দটা আর শুনতে পেলাম না। আধ মিনিটের জন্যে জ্ঞান হারালাম আবার। আমি জানি, এইটুকু সময়ের মধ্যে আমার পাশে শুয়ে পড়বে সোহানা পায়ের দিকে মাথা দিয়ে। তারপর আমার বাম বগলে পায়ের পাতা বাধিয়ে হাতের কব্জি ধরে মারবে এক হ্যাঁচকা টান। হাড় ফিরে আসবে জয়েন্টে নিজের জায়গায়।

আধ মিনিট পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে মনে হলো নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি। ভোঁতা একটা ব্যথা আছে, কিন্তু রগে টান পড়ায় যে তীক্ষ্ণ ছুরির খোঁচা অনুভব করছিলাম, সেটা গায়েব। উঠে বসলাম খাটের কিনারায়, নেড়ে দেখলাম, বেশ অনেকদূর পর্যন্ত নাড়াতে পারছি হাত সহজেই।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে মায়াহরিণীর কোমল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সোহানা, ঠোঁটে আধ-ফোটা হাসি। আমার মনে হলো, ছোট্ট শিশু আমি, মায়েদের মত চুমু দিয়ে আমার ছড়ে যাওয়া হাঁটুর ব্যথা সারিয়ে দিয়েছে ও। হাসলাম আমিও। ও কাছাকাছি থাকলে আমার মনে হয় সুন্দর একটা ফুলের বাগানে রয়েছি, কোকিল ডাকছে, বাতাসে মধুর সুবাস। কিংবা মনে হয়, গভীর সমুদ্রের অন্ধকার অতল তলে পড়ে ছিলাম নিঃসাড়, ওর ডাক পেয়ে উঠে এসেছি ওপরে; আলোয়, হাওয়ায় প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পারছি এখন।

সাত

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, তাই শুনতে পাইনি কিছুই।

হঠাৎ করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল গার্ড। জ্যাকেট নেই ওর গায়ে, তাই পিস্তলসহ শোলডার হোলস্টারটা দেখতে পাচ্ছি। মুহূর্তে ফিরে এলাম বাস্তবে।

এখন গুলি করা যাবে না। খাটের কিনার থেকেই এক লাফে শূন্যে উঠে পড়লাম, দুই পা সামনে বাড়িয়ে চিত হয়ে উড়ে যাচ্ছি লোকটার দিকে।

লোকটা এগোচ্ছে এখনও, বোঝার চেষ্টা করছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিটা, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে বন্ধ ঘরে একজনের বদলে দুই জন মানুষ দেখে। এমনি সময়ে ওর গলার দু'পাশটা চেপে ধরলাম দুই পায়ের নলি দিয়ে, পায়ের গোড়ালিদুটো আটকে নিলাম প্যাঁচ দিয়ে, সেই সঙ্গে শরীর মুচড়ে উপুড় হয়ে গেলাম শূন্যে। দুই হাতের তালু মাটিতে পড়তেই চিবুকটা বুকে ঠেকিয়ে জোরালো এক ডিগবাজি খেলাম সামনের দিকে। গলাটা পায়ের ফাঁকে চেপে ধরে রেখেছি বলে আমার গায়ের ওপর দিয়ে মিসাইলের মত ছুটে গেল লোকটা সামনে। ফুট চারেক এগিয়ে যেতেই ছেড়ে দিলাম পায়ের বাঁধন, আরও কয়েক ফুট উড়ে দড়াম করে ধাক্কা খেল ও পুরু দেয়ালের গায়ে, সেখান থেকে পড়ল গদিহীন খাটিয়ায়।

ছুরি হাতে উঠে দাঁড়ালাম। ক্ষয়-ক্ষতি বুঝতে বেশি সময় লাগল না। মাথার চাঁদিটা ডেবে গেছে ইঞ্চিখানেক—

ডিমের মাথায় খুন্তি দিয়ে বাড়ি দিলে যেমন হয় আরকী; দুই নাকের ফুটো দিয়ে কুল-কুল করে নামছে রক্ত। নাড়ি ধরে মাথা নাড়ল সোহানা। তারপর এগিয়ে দিল ক্ষতবিক্ষত দুই হাত।

গ্লাস-কাটারের পিছনের খাঁজে ভরে একটু একটু করে চাপ দিয়ে কাঁটাতারের প্যাঁচ খুলে ফেললাম। প্রথমেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমার চিবুকে চুমো দিল সোহানা। তারপর, আমি যখন ওর ক্ষতগুলো ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করছি, সংক্ষেপে জানাল কীভাবে বন্দি হয়েছে।

জরুরি কাজ সেরে গাড়ি নিয়ে বার্কশায়ারের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল ও গত পরশু, শহর ছাড়াতেই পেছনের লাগেজ কম্পার্টমেন্ট থেকে একটু পর পর কেমন বিদঘুটে আওয়াজ শুরু হলো। রাস্তার পাশে থেমে পিছনের ডালাটা তুলতেই দেখা গেল দুজন ষণ্ডামার্কা লোক হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে ওখানে। হাতে পিস্তল। ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে উত্তরে নিয়ে এসেছে ওরা ওকে ওরই গাড়ির বুটে ভরে। ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে বন্দি হয়ে আছে ও এখানে, মুক্তির কোনও উপায় বা সুযোগ বের করতে পারেনি।

জখমগুলোয় সার্জিকাল টেপ লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞেস করলাম, 'মতলবটা কী গডরিজের?'

'তোমাকে চায় আসলে। আমি টোপ। ইস্তাম্বুলে সেদিন ছুরিটা একটু ডাইনে লাগায় বেঁচে গিয়েছিল লোকটা, আধমরা হয়েছে নীচে পড়ে। সেই থেকে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছে, একের পর এক প্ল্যান করছে আর সুযোগ খুঁজছে কীভাবে প্রতিশোধ নেয়া যায়।'

নিচু গলায় আলাপ করতে করতে অস্ত্রগুলো দুজনের মধ্যে ভাগ করছি আমরা। ও নিল নাইন এমএম ল্যুগারটা, আমি রাখলাম ওয়ালথার পিপিকে। 'ফাইনাল কোনও সিদ্ধান্তে

পৌঁছেচে? কী করতে চায়, বলেছে কিছু?'

'দুর্গের নীচে নাকি বড়সড় তল-কুঠুরী আছে—ওর ইচ্ছা, ওখানে বেঁধে রাখবে তোমাকে শিকল দিয়ে। তারপর তোমার চোখের সামনে ওর লোক আমার ওপর... বুঝতেই পারছ। সবাই তৃপ্ত হলে শুরু হবে নখের নীচে পিন ফোটানো থেকে শুরু করে প্লায়ার্স দিয়ে এক এক করে দাঁত আর শরীরের নরম অংশগুলো ছিঁড়ে তোলা। তারপর শুরু হবে আমাকে কয়েক দফায় চাবুক মেরে ধীরে ধীরে খুন করার কাজ। তোমাকে মারবে না, জীবনের তরে পঙ্গু-অথর্ব করে জ্যান্ত ছেড়ে দেবে—চোখ, কান, জিভ থাকবে না, একটা হাত আর একটা পা কেটে নেয়া হবে; সেই সঙ্গে...'

হাত তুলে থামালাম ওকে। প্রতিপক্ষ হিসেবে পঙ্গু এক হুইল-চেয়ারবাসী আমার পছন্দ নয়। কিন্তু কী আর করা, খুন না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই থামবে না লোকটা। অস্ত্র যা-যা প্রয়োজন মনে করেছি, পোশাকের বিভিন্ন পকেটে নিয়েছি আমরা, বাকিগুলো থাকল ব্যাগেই, ওটার মুখ বন্ধ করে পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম। পোশাকের কোথায় কী রেখেছি শেষ একবার ভাল মত দেখে তৈরি হয়ে নিলাম দুজনেই।

'চলো, যওয়া যাক,' বলে উঠে দাঁড়ালাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে চওড়া প্যাসেজ ধরে সিঁড়ির মাথায় চলে এলাম। প্ল্যান করার কিছু নেই, ঘরে ঢুকেই দ্রুত গুলি করে লাশ ফেলা। জানি, আমার ভাগে ডানদিকের তিন জন, সোহানা সামলাবে বামের দুইজনকে—আমাদের খুব বেশি হলে এক সেকেণ্ডের কাজ।

সিঁড়ি আর নীচের হলওয়েতে আলো খুব ম্লান। একটা ঘরের দরজার নীচ থেকে জোরালো আলোর ফালি দেখে বুঝলাম, ওটাই আমাদের গন্তব্য। ওখানেই তাস খেলছে স্যাঙাতরা, গডরিজ তার হুইল চেয়ারে বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আগুনের

দিকে। নিঃশব্দে, দ্রুতপায়ে নামছি আমরা সিঁড়ি বেয়ে, কিন্তু অর্ধেক নেমেই থমকে দাঁড়াতে হলো। কোথাও কোনও গোলমাল হয়েছে!

কেউ হয়তো কোনও আওয়াজ শুনেছে, হয়তো ইনফ্রা রেড রশ্মির অ্যালার্ম সিস্টেম সেট করা ছিল সিঁড়ি বা প্যাসেজের কোথাও, কিংবা হয়তো কেউ বাইরে গিয়ে জানালা থেকে ঝুলন্ত রশি দেখতে পেয়েছে—দপ করে নিভে গেল বাতি। পরমুহূর্তে নিভে গেল দরজার নীচ থেকে আসা উজ্জ্বল আলোটাও। কেমন করে জানি, টের পেয়ে গেছে ওরা যে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে।

দড়াম করে আওয়াজ হলো দরজা খোলার, স্যাব-মেশিনগান দিয়ে গুলি করছে কেউ অন্ধকার লক্ষ্য করে। বাচ্চা খরগোশের মত কয়েক লাফে উঠে এলাম আমরা সিঁড়ির মাথায়। নীচে হেঁড়ে গলায় কেউ কিছু হুকুম দিল। একটু পরেই জ্বলে উঠল দুটো টর্চ, এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে জোরালো আলো। সিঁড়ির গোড়ায়, ও ধাপগুলোতে খুঁজছে আমাদেরকে। আমরা ততক্ষণে উঠে এসেছি ওপরে।

অন্ধকার বাড়ির ভেতর বন্দুকযুদ্ধে সাধারণত জয়-পরাজয় নির্ভর করে অস্ত্র ও লোকসংখ্যার ওপর। আমরা ওপর থেকে উঁকিঝুঁকি মারছি, আলো দেখছি কিন্তু আলোর উৎস দেখতে পাচ্ছি না। আবার এক পশলা গুলি হলো, একসঙ্গে লাফিয়ে সরে এলাম।

ব্যাটারা আমাদের লাইন অভ ফায়ার থেকে আড়ালে থাকছে, কিন্তু এগোচ্ছে একটু একটু করে। বাধ্য করছে আমাদের পিছিয়ে যেতে। ওদের এসএমজি-র গুলিতে আহত বা নিহত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে এগিয়ে কোণঠাসা করে ফেলবে আমাদেরকে এক সময়। অস্ত্রধারীদের কয়েক পশলা গুলিবর্ষণের পর টর্চধারীরা এগিয়ে এসে নতুন পজিশন নিচ্ছে। সামনে টার্গেট না থাকায়

আমরা একটা গুলি করারও সুযোগ পাচ্ছি না।

গ্রেনেড দুটোকে অ্যাকটিভেট করিনি বলে দুঃখ হচ্ছে এখন। পিঠে ঝোলানো ব্যাগের ভেতর ঘুমাচ্ছে ও দুটো। ওগুলোর দরকার পড়বে ভাবিনি আমরা দুজনের কেউই। এই মুহূর্তে ওগুলো বের করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। এসএমজি-ওয়ালারা এখন থেমে থেমে গুলি ছুড়ছে, একধাপ-দুইধাপ করে উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে।

সোহানা ধরল আমার হাত। ছুটলাম দু'জনে। ও বলল, 'এসো, দেখি, ওপাশ দিয়ে নীচে নেমে গিয়ে ওদের পেছনে উঠে আসা যায় কি না।'

কথাটা মনে ধরল। এভাবে পিছাতে থাকলে কোনও সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না। ওদের পিছনে পৌঁছতে পারলে কাবু করা সম্ভব হতেও পারে।

সামনে আরেকটা সিঁড়ি নিশ্চয়ই থাকবে। পেলামও। দ্রুতপায়ে নামছি। সরু, নোংরা একটা সিঁড়ি। পশ্চিম পাশের শেষদিকে। যে বদ্ধ উন্মাদ স্কট এই সিঁড়ি বানিয়েছিল, খোঁজ পেলে আমি তার কবরের ওপর চড়ে লাফাতাম। নামছি তো নামছিই। মনে হলো, একতলাকে এড়িয়ে এটা সোজা চলে গেছে মাটির নীচের সেলারে।

কোনও আলো নেই কোথাও, একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমার টর্চটা বের করলাম। গুলির আওয়াজ এগিয়ে আসছে ক্রমে। বহুক্ষণ ধরে নামার পর পাওয়া গেল সরু একটা প্যাসেজ।

হাঁটতে হাঁটতে একটা দরজার কাছে চলে এলাম। দরজা মানে, এক সময় ছিল, এখন কপাট, এমনকী চৌকাঠও নেই ওটার; শুধুই ফোকর। ওটা পেরিয়ে ঢুকলাম বড়সড় একটা তলকুঠুরীতে, ভেজা স্যাঁতসেঁতে দেয়াল। একটু পর পর এদিক-ওদিকে প্রাচীন আমলের ছোট ছোট ইঁট দিয়ে তৈরি খিলান। যত

এগোচ্ছি ততই বাড়ছে ধুলো-ময়লা, মাকড়সার জাল, আর নানান জিনিসের ফেলে দেয়া ভাঙা অংশ, আবর্জনা। এইসব মাল একদিন মানুষ পয়সা দিয়ে কিনেছে, ভাবাই যায় না; মনে হয়, পরিত্যক্ত সেলার ভরাবার উদ্দেশ্যে জেনেশুনেই এগুলো বানিয়ে বিনা মূল্যে বিতরণ করেছে প্রস্তুতকারকরা।

চলার গতি কিছুটা ধীর করলাম। টর্চের আলো ফেলে দরজা খুঁজছি। পাথরের মোটা থামগুলোকে এড়িয়ে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছি। পথ খুঁজছি আক্রমণকারীদের পেছনে পৌছবার।

নাহ্। দরজা নেই। দুর্গের পশ্চিমের উইংটা দেখে বাঁক নিয়ে চলে এসেছি আমরা দক্ষিণের লম্বা উইঙে। সিঁড়ি বা দরজা, কিছুই নেই। তারপর চলে এলাম পুবের উইঙে। সেই একই চিত্র: পলেস্তরা খসে যাওয়া স্যাঁতসেঁতে দেয়াল, আবর্জনা, ধুলো ও ঝুল। পুরনো দুর্গে অন্ততপক্ষে এক-আধটা ট্র্যাপডোর থাকা দরকার ছিল, কিন্তু নেই। ফিরে চললাম হতাশ হয়ে।

'কোন্ শালা বানিয়েছে এ দুর্গ!' বলে উঠল সোহানা হঠাৎ।

হেসে উঠলাম। সত্যি, পাঁচশ' বছর পর আমদের যে এই নরক থেকে বেরোবার প্রয়োজন হতে পারে, আর্কিটেক্ট ব্যাটা সেকথা একদম মাথায় রাখেনি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ সিঁড়ির গোড়া থেকে ব্রাশফায়ার হলো। পশ্চিমে বাঁক নিতে যাচ্ছিলাম, থমকে গেলাম। সত্যিই, ফাঁদে পড়ে গেছি। ওরা এখন সেলারে ঢোকার দরজার কাছে। ওটাই যদি বেরোবার একমাত্র দরজা হয়ে থাকে...

ওসব কথা এখন আর ভাবতে চাই না। ওরা এখনও বেশ কিছুটা দূরে। দ্রুতপায়ে বিশ কদম পিছিয়ে এসে একটা পাথুরে পিলারের আড়ালে দাঁড়ালাম, কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে পায়ের ওপর বসলাম। পেন্সিলটর্চ মাটিতে রেখে দ্রুত হাতে গ্রেনেড

দুটোর প্রাইমার সেট করে ফেললাম। তাকিয়ে দেখলাম, পাশেই পিলারের আরেক ধারে এক হাঁটু মেঝেতে ঠেকিয়ে পজিশন নিয়েছে সোহানা, হাতে পিস্তল, চেয়ে রয়েছে পশ্চিমের বাঁকের দিকে। বামহাতে কয়েকটা চুল সরালো কপাল থেকে। শান্ত।

দুজনেই জানি, অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হতে পারে আমার বা সোহানার বা আমাদের দুজনেরই। কিন্তু ভয় পাচ্ছি না। গর্ব হলো ওকে নিয়ে। আর একবার উপলব্ধি করলাম, সময় বিশেষে কোহিনূর হীরার মতই শক্ত হয়ে যায় ওর মনটা, তেমনি বড়ও। আমরা দুজনেই প্রস্তুত, যুদ্ধ করব—হয় জিতব, নয় মরব; আত্মসমর্পণের কথা এলোই না মনে।

কিন্তু সব চুপচাপ কেন? বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেছে গোলাগুলি বন্ধ। সোহানার বাহুতে একটা চাপ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে এক চোখ রাখলাম দেয়ালের কোণে। অন্ধকার। টর্চটা নিভিয়ে আমার পিঠের কাছে এসে দাঁড়াল সোহানা। পাঁচ মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম, তারপর দেখতে পেলাম আলোর আভাস। ওরা খুব সাবধানে থামগুলোর আড়ালে আড়ালে এগিয়ে আসছে। কয়েক মিনিটেই পৌঁছে যাবে পশ্চিমের বাঁকে। আবার পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা আগের জায়গায়। সোহানাকে অপেক্ষা করবার ইশারা করে টর্চটা নিয়ে এগিয়ে গেলাম কিছুদূর সামনে। একটা পিলারের গা হাতড়ে মানুষ-সমান উঁচুতে খাঁজ পেয়ে গেলাম। ওখানে টর্চটা বসালাম পশ্চিম থেকে দক্ষিণের উইঙে আসবার বাঁকের দিকে মুখ করে। আরও কিছুক্ষণ পর, ওরা যখন বাঁক নিতে যাচ্ছে, তখন সুইচটা টিপেই হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এলাম সোহানার পাশে।

সেলারের মাঝখানে কিছুটা জায়গা আলোকিত হয়ে গেছে। আলো দেখে থমকে দাঁড়াল ওরা এক সেকেণ্ড, তারপর কয়েক লাফে সরে গিয়ে আড়াল নিল মোটা দুটো থামের ওপাশে। ওখান থেকে কয়েক পশলা গুলি বর্ষণ করল এসএমজিধারীরা

আলো লক্ষ্য করে। একটা গুলিও লাগাতে পারল না। আমরা পাল্টা গুলি করলাম না, তবে দুজনই পরিষ্কার দেখে নিয়েছি ওদের অবস্থান—ঠিক পনেরো গজ দূরে আছে ওরা। এগোচ্ছে পিলারের আড়ালে আড়ালে।

এখনই সময়। এবার আমাদের আক্রমণের পালা।

একটা গ্রেনেডের পিন খসিয়ে তিন পর্যন্ত গুনলাম, তারপর ছুড়ে দিলাম ওটা ওদের একটু পেছনে। দৌড়ে ফিরে এসে আড়াল নিলাম পিলারের পেছনে। বদ্ধ ঘরে ভয়াবহ শব্দ হলো। চারদিকে ছুটল শ্র্যাপনেল, এখানে-ওখানে লেগে ধাতব খণ্ডগুলো তীক্ষ্ণ আওয়াজে বাতাস কেটে ছুটে যাচ্ছে যেদিক খুশি। প্রায় দশ সেকেণ্ড ধরে চলল এই তাণ্ডব। তারপর যা ঘটল তা বর্ণনাতীত।

ভেঙে পড়ল দুর্গটা। না, পুরো দুর্গ নয়, চারপাশের দেয়ালও না: পশ্চিম পাশে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের বেশিরভাগটা এবং সম্ভবত দোতলারও কিছু অংশ স্রেফ ধসে পড়ল হুড়মুড় করে। প্রথমে মড়-মড় শব্দে ফাটল সেলারের ছাদ, তারপর ধীরেসুস্থে খসে পড়ল ওপর থেকে। তারপর কোটি কোটি উইপোকাকে বাস্তুহারা করে একের পর এক পড়তে থাকল ছাদের বিশাল সব কাঠের বিম। এরই মধ্যে কখন দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এসেছি জ্বলন্ত টর্চটা, জানি না। গ্রেনেডের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল, কিন্তু ভাঙচুরের শব্দ বধির করে রাখল আমাদের অনেকক্ষণ।

চটকা ভাঙতেই দেখি আমরা পরস্পরকে পিষে মারার চেষ্টা করছি। আমি টর্চ নিয়ে ফিরে আসতেই সোহানা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার বুকে, সেই থেকে জড়িয়ে ধরে আছি দুজন দুজনকে।

খেয়াল হলো, দুর্গের পরিত্যক্ত অংশের নীচে রয়েছি আমরা এখন। নিরাপদ নয় বলে এদিকটায় বহুদিন ধরে বাস করে না কেউ। ধুলোয় ছেয়ে গেছে গোটা সেলার, যেন মরুভূমিতে তুমুল

বেগে বয়ে গেছে তুফান, সাইমুম।

ধুলো একটু কমতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বোঝার জন্য সাবধানে এগোলাম। দেখলাম, দক্ষিণ উইঙের' ক্ষতি হয়েছে সামান্যই, কিন্তু পশ্চিমের উইং প্রায় সবটাই ভরাট হয়ে গেছে ইঁট-পাথর-বালিতে; তার ভেতর থেকে ভাঙা বিম ও জয়েস্ট-এর মাথা বেরিয়ে আছে উৎকট ভঙ্গিতে।

সুখবর এটুকুই: গডরিজের খুনে স্যাঙাতদের ওপর পড়েছে গোটা ছাদ, ওরা এখন পনেরো ফুট চুন-সুরকি আর পাথরের নীচে। আর খারাপ খবর: আটকে গেছি আমরাও। এই টন-কে-টন জঞ্জাল ডিঙিয়ে বেরোবার উপায় নেই; জ্যান্ত কবর হয়ে গেছে আমাদের।

আট

পায়ে পায়ে এগোলাম আমরা। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সোহানা, বলল, 'আলোটা নেভাও তো, রানা।'

'ঘুম পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু এখানে খাট কোথায়?'

'যা বলছি ক...

ওর কথা শেষ হবার আগেই নিভিয়ে দিলাম টর্চ। কী যেন খুঁজছে ও ওপর দিকে চোখ তুলে। দু'মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আমিও খুঁজলাম। ওর চোখেই পড়ল আগে। আমার গা ছুঁয়ে বলল ও, 'ওই দেখো, ওইদিকে।'

ওইদিকটা কোন্‌দিক তা বোঝার জন্যে ওর হাতে হাত

বুলিয়ে আঙুলের কাছে চলে এলাম, তারপর চোখ তুলে দেখলাম আঁধার ঘরের এক কোণে সামান্য একটু আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে। খুবই ছোট কোনও ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে চাঁদ বা তারার আলো, কিন্তু ধুলোর মেঘ ভেদ করে পৌঁছুতে পারছে না।

আমাদের বেরোতে হবে ওখান দিয়েই।

একটু একটু করে ফাঁকটা মানুষ গলবার উপযোগী বানাতে পুরো একটি ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হলো। পাশ থেকে হুড়মুড় করে আরও পাথর চলে আসার ভয়ে সাবধানে একইঞ্চি-দুইইঞ্চি করে পৌঁছতে হয়েছে এখানে। এখন কেবল আরেকটা জয়েস্ট সরাতে পারলেই বেরিয়ে যেতে পারব আমরা সেলারের মরণফাঁদ থেকে। ওটা একটু নড়াতেই একগাদা ধুলোবালি আর ছোট পাথরের টুকরো খসে পড়ল নীচে। ধুলো সরে গেলে গর্তের ওপাশে নীচতলার একটা ঘর দেখতে পেলাম। ওটারই জানালার কাঁচ ভেদ করে বাইরের আলো ঢুকতে চেষ্টা করছিল নীচের সেলারে।

ফোকর গলে বেরিয়ে যাব, এমনি সময়ে নীচ থেকে কেউ বলে উঠল, 'প্লি-ই-য!'

চমকে উঠলাম। কথাটা আস্তে করে বলেছে কেউ, কিন্তু সেলারের এখানে-ওখানে ধাক্কা খেয়ে এমনই ভৌতিক প্রতিধ্বনি তুলল যে, আমার মাথার সব চুল দাঁড়িয়ে যাবার জোগাড়। দুজনেই জমে গেছি বরফ হয়ে। এবারও সোহানাই বের করল শব্দের উৎস। আঙুল তাক করল নীচের একটা ধ্বংসস্তূপের দিকে। ফোকরের কাছে থাকায় কোন্ দিকে তাক করেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। টর্চের আলোটা ফেললাম সেই দিকে, তারপর দুজনেই আবার নেমে গেলাম নীচে।

জন গডরিজ! চাপা পড়েছে একটা বিমের নীচে। ব্যথায় কুঁচকে আছে ওর মুখ। কিন্তু এ-লোক এখানে এলো কী করে!

ভাঙা মেঝের ফাঁক দিয়ে পড়ে গেল? নাহ্, তা হলে বিমের নীচে যায় কীভাবে?

বুঝতে দেরি হলো না। যেই টের পেয়েছে সোহানা মুক্ত, বুঝে নিয়েছে আমি পৌঁছে গেছি—সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে ফেলেছে প্ল্যান। আজ যদি হাত ফসকে বেরিয়ে যেতে পারি, আর কখনও নাগাল পাবে না—এখানেই যেমন করে হোক খতম করতে হবে আমাদের। তাড়া খেয়ে আমরা যেই সেলারের সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছি, অমনি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে সে: আর পালাতে হচ্ছে না। সেলারের ভেতরই গুলি খেয়ে মরতে হবে আমাদের। কিন্তু সে-মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতে না পারলে শান্তি হবে না যে ওর, তাই সে-ও এসেছে ওদের সঙ্গে। দেরিটা হয়েছে ওকে হুইলচেয়ার সহ সরু সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনতে। পশ্চিমের উইঙের মাঝামাঝি জায়গায় একটা পিলারের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ও অনুচরদের পেছনে। গ্রেনেডটা ফেটেছে ওর অল্প কিছুদূর সামনে।

হুইলচেয়ারটাই প্রাণ বাঁচিয়েছে ওর। কাত হয়ে পড়ে আছে ওটা, এখনও ওর ভিতরেই বসে আছে বলে একগাদা পাথরের চাপ গেছে চেয়ারের ওপর দিয়ে। তার ওপর যখন বিমটা পড়েছে, সেটার চাপ পড়েছে পাথর-খণ্ড ও চেয়ারের ওপর। চেয়ারের একাংশ চুরমার হয়ে দুমড়ে গেছে; কিন্তু বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হওয়া থেকে। ধুলো মাখা রক্তাক্ত চেহারা নিয়ে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে লোকটা।

ব্যাপারটা কেমন হলো? এক ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছিলাম যাকে খুন করতে, এখন দুজনই আমরা চেয়ে রয়েছি বিমটার দিকে, ভাবছি তাকেই ওর নীচ থেকে বের করা যায় কীভাবে! আলোর দিকে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে গডরিজের ঘোলাটে চোখ, কপাল আর চোয়াল উঁচু হয়ে আছে আঘাত লেগে, গায়ে এখানে-ওখানে চেরা দাগ; আস্তে করে আবার বলল, 'প্লি-ই-য!'

নিচু হয়ে বিমের তলায় কাঁধ গলিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে সোজা হওয়ার চেষ্টা করলাম, এক কি দুই ইঞ্চি তুলতে গিয়ে মনে হলো যেন গোটা হিমালয়টা তুলছি। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'জলদি!'

লোকটাকে টেনে-হিঁচড়ে চেয়ার থেকে বের করে সরিয়ে নিল সোহানা—কাঠির মত দুটো পা দেখলাম, মাটিতে ছেঁচড়ে গেল পিছু পিছু। দরদর করে ঘামছি। যেখানে ছিল সেইখানেই বিমটা নামিয়ে পিছিয়ে সরে এলাম। আলগা ভাবে আটকে ছিল কোথাও, বিমটা নাড়া খাওয়ায় হড় হড় শব্দে নেমে এলো টন তিনেক বালি-মাটি আর খোয়া। কবর হয়ে গেল হুইলচেয়ারটার। এক লাফে দূরে সরে গিয়ে হাঁপালাম ঝাড়া তিন মিনিট। দেখলাম, এক হাতে টর্চ, অপর হাতে পিস্তল ধরে আছে সোহানা গডরিজের দিকে।

দম ফিরে পেয়ে সার্চ করলাম ওকে। শোলডার হোলস্টারটা খালি, পকেটেও কোনও অস্ত্র নেই। এইবার তাকালাম অনেক কষ্টে ওপরে ওঠার জন্যে যে সুড়ঙ্গটা তৈরি করেছি সেটার দিকে। ওখান দিয়ে একে নিয়ে ওপরে উঠব কী করে? সঙ্গের ব্যাগে একগাছি দড়ি আছে অবশ্য, কিন্তু ওকে তো দড়ি বেঁধে টেনে তোলা যাবে না; প্রতি তিন-চার ফুট উঠে একবার করে বেধে যাবে পাথরে বা কোনও বিম বা জয়েস্টে। আর টানা হেঁচড়া করতে গিয়ে যদি আবার ধস নামে তা হলে সাড়ে-সর্বনাশ। সোহানাকে বললাম সে কথা।

'তুমি আগে উঠে যাও, রানা,' বলল ও। 'তুমি ওপর থেকে টেনে তোলো, আমি থাকছি এর সঙ্গে, যেখানে আটকাবে সেখান থেকে ছাড়িয়ে দেব।'

প্রস্তাবটা ভাল লাগল না, আমার। কিন্তু আর কোনও উপায়ও পেলাম না খুঁজে। ওকে নিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে বসালাম সুড়ঙ্গের গোড়ায়, দুই বগলের তলা দিয়ে রশি নিয়ে গিঁঠ দিলাম ঘাড়ের

কাছে, তারপর রশির অপর প্রান্ত হাতে নিয়ে সাবধানে ঢাল বেয়ে উঠে গেলাম ওপরে। যেতে যেতে টের পেলাম কী পরিমাণ ঝুঁকিপূর্ণ এই পথ—বুড়ো মানুষের দাঁতের মত নড়বড় করছে দুপাশে পাথরের বড় বড় চাঁই। শক্ত ফ্লোরে দাঁড়িয়ে রশির ঢিলটা গুছিয়ে নিলাম।

'টানো।' সোহানার গলা শুনতে পেলাম। একটু একটু করে টানছি। মিনিট খানেক পরেই আবার ভেসে এল ওর কণ্ঠ, 'থামো!'

কুড়কুড়ে শব্দ তুলে কিছু খোয়া নেমে গেল নীচে। দম আটকে শুনছি আওয়াজ, জিভ শুকিয়ে আসছে। তারপর আবার শোনা গেল, 'হ্যাঁ, টানো।' আবার টানতে শুরু করলাম। থামলাম, অপেক্ষা, আবার টান। মনে হলো আমার জীবন থেকে খসে গেল কয়েক বছরের আয়ু। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ঘামছি দর দর করে।

অবশেষে উঠে এলো গডরিজ; তার পেছনে সোহানা।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম দুর্গ থেকে। গডরিজকে বয়ে এনে সদর দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসালাম। দুই মিনিটেই গেটের তালাটা খুলে হুড়কো নামালাম। ঠেলা দিতেই সদর দরজাটা হাঁ করে ফোঁকলা হাসি দিল। সোহানাকে আমার দিকে তাকাতে দেখে বুঝলাম, আমার বুকে মুখ লুকিয়ে মিনিট দুয়েক কাঁদতে পারলে বাঁচত। কিন্তু লোকের সামনে এ-কাজ কিছুতেই হবে না ওকে দিয়ে। গত তিনটে দিন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে কেটেছে বেচারির। মুক্তির আনন্দে জল আসতে চাইছে চোখে।

বিশাল গেটটা ফাঁক করে রেখে পিছন ফিরে চাইলাম ক্লস্টারবার্গ দুর্গের দিকে। একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু অভ্যাসটা ছেড়ে দিয়েছি বেশ অনেকদিন, সঙ্গে একটা শলাও নেই। ঠিক যেমন ছিল তেমনি দেখাচ্ছে দুর্গটাকে।

ভেতরটা ধসে গেলেও বাইরেটা ফিটফাটই আছে। চাঁদের আলো বিছিয়ে পড়েছে গোটা আঙিনায়। পূর্ণচন্দ্রটি এখন পশ্চিম আকাশে, জঙ্গলের ওপাশে তলিয়ে যাবে খানিক বাদেই—কিন্তু যথেষ্ট আলো ছড়াচ্ছে এখনও। ঘড়িতে বাজে সাড়ে ছটা, সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরি।

গডরিজের জন্য গাড়িটা নিয়ে আসতে হবে এখানে। সোহানাকে পাঠাব নাকি আমি যাব ভাবছি। কেন যেন ওকে গডরিজের সঙ্গে রেখে যেতে ইচ্ছে করছে না। গাড়ির চাবির জন্যে পকেটে হাত দিলাম। ঠিক তখনই শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো ঘাড়ের পিছনে। বিপদ সঙ্কেত!

ঝট্ করে ঘুরেই তাকালাম গডরিজের দিকে। তেমনি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে লোকটা, তবে হাতে এখন শোভা পাচ্ছে একটা অটোমেটিক পিস্তল। বাম হাতের বাহুর ওপর রেখেছে ডান হাতের কব্জি; সরাসরি তাক করেছে পিস্তলটা সাত কদম দূরে পাশ ফিরে দাঁড়ানো সোহানার দিকে।

চমকে গেলাম। সার্চ করার পরও কীভাবে ওর কাছে রয়ে গেল পিস্তলটা? নাকি আমারই পিস্তল ওটা—ওকে কোলে করে বয়ে আনার সময় আলগোছে তুলে নিয়েছে আমার হোলস্টার থেকে? আমারই গাফিলতিতে খুন হয়ে যাচ্ছে সোহানা? বিদ্যুচ্চমকের মত খেলে গেল কথাগুলো আমার মাথায়।

জ্যাকেটের ভেতর থেকে কখন বের করেছি ছুরি দুটো নিজেও জানি না। বামহাত উঁচু করে রাখায় ওর বুক দেখতে পাচ্ছি না, তাই চোখ সই করে ছুড়লাম। পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ *টাশ্‌শ্‌* শব্দে গর্জে উঠল ওর হাতের পিস্তল। রিকয়েলের ঝাঁকুনি দেখতে পেলাম পরিষ্কার। আমার দ্বিতীয় ছুরিটা ঢুকল ওর কলার-বোনের নীচ দিয়ে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে।

হাত থেকে পড়ে গেল পিস্তল। দুই সেকেণ্ড পর নিঃশব্দে কাত হয়ে পড়ল গডরিজও।

কয়েক লাফে পৌঁছে গেলাম সোহানার পাশে।

'লেগেছে?'

'না,' জবাব দিল সোহানা। 'কিন্তু লোকটা পিস্তল পেল কোথায়?'

বুক চাপড়ে দেখালাম, নেই আমারটা। ভাল লোকেরই উপকার করতে গেছিলাম!

নয়

ছুরি দুটো খুলে নিয়ে ওরই কাপড়ে রক্ত মুছে রেখে দিলাম জ্যাকেটের খাপে। পিস্তল তুলে নিয়ে ভরলাম হোলস্টারে। তারপর আবার লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ফিরে গেলাম আমরা দুর্গে। যেখান দিয়ে সেলার থেকে বেরিয়েছি, সেখান দিয়েই ছেড়ে দিলাম গডরিজকে। মাথা নিচু, পা উঁচু অবস্থায় সড় সড় করে চলে গেল লাশটা পাঁচ-ছয় ফুট নীচে। টর্চের আলোয় দেখলাম, আটকে আছে একটা পাথরে। ফ্লোরে লাফঝাঁপ দিলাম, কিন্তু যখন চাইছি তখন ধসাতে পারলাম না ওটাকে। অগত্যা বের করলাম দ্বিতীয় গ্রেনেড। পিন খুলে ভেতরে ছুড়ে দিয়েই দৌড় দিলাম জান-প্রাণ নিয়ে।

পাঁচ সেকেণ্ড পর ঘটল বিস্ফোরণ। তারপর আরও দুই মিনিট ধরে চলল ভাঙচুরের গুড়-গুড়-ধড়াস-ধুড়ুম আওয়াজ। দুর্গটা এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারলাম না। জানালা দিয়ে দেখলাম, একতলার গোটা মেঝে ধসে পড়ে গেছে; অনুচরদের সঙ্গে একই সেলারে কবর হয়ে গেছে জন

গডরিজের—সম্ভবত চিরতরে। আর কখনও কেউ এখানে দুর্গ বানাতে চাইবে বলে মনে হয় না।

সব বিপদ কেটে গেছে। কিশোর-কিশোরীর মত হাতে হাত রেখে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলাম আমরা ক্লস্টারবার্গ দুর্গের খোলা গেট দিয়ে—ধুলো-বালি-কালি মাখা নোংরা দুই ভূত।

খুনের দায়

এক

ভারী জুতোর গটমট শব্দ তুলে কামরায় ঢুকল লোকটা। ফাইল থেকে চোখ তুলে একনজর দেখেই চিনতে পারল রানা। বেশ লম্বা-চওড়া, বয়স কম-বেশি পঞ্চাশ, খেলোয়াড়ি একটা ভাব আছে চেহারায়, মাথাজোড়া বিশাল টাক, নীল চোখ, পরনে ভাল দরজি দিয়ে বানানো দামি পোশাক।

'মিস্টার মাসুদ রানা, ছোট্ট একটা কাজ নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। আমাকে মনে আছে তো? লইয়ার অ্যাডাম ক্লিপটন। ও-ও-ই যে, বছর খানেক আগে সেই পাগলি অলিভা-র কেসে মাফিয়া ডন মারিয়ো মারকাস আর সলিসিটার হাওয়ার্ড ব্লেচারের পক্ষে লড়েছিলাম...'

'কিন্তু জিততে পারেননি, জেল খাটতে হয়েছে ওদেরকে,' হাসিমুখে বলল রানা। 'আপনার তো কোনও কাজ নিয়ে আমার কাছে আসার কথা নয়, মিস্টার ক্লিপটন।'

'আপনার যোগ্যতাই টেনে এনেছে আমাকে, মিস্টার রানা। অতীতের কোনও কথা মনে রাখি না আমি,' বলে রানার চেয়ারের পাশে দাঁড়ানো বড়জোর সাড়ে চার ফুট লম্বা, কালো, পাটকাঠির মত শুকনো লোকটার দিকে ভ্রূ কুঁচকে চাইল লইয়ার। 'এই পিওনটাকে এখান থেকে ভাগানো যায়? একটা গুরুত্বপূর্ণ...' রানাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল সে।

'না,' বলল রানা দৃঢ়কণ্ঠে। 'ইনিই রানা এজেন্সি, নিউ ইয়র্ক শাখার বর্তমান চিফ। ইনি থাকবেন। যা বলতে এসেছেন, এঁর সামনেই বলুন।' আবছা ইঙ্গিতে দু'জনকেই বসতে বলল রানা।

'ডেঁড়িয়ে থাকতেই ভাল্লাগচে, সার!' বলল বত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেঁটে লোকটা। ক্যালক্যাটা থেকে বাংলাদেশে মাইগ্রেট করা দাগী চোর ছিল সে একসময়। জেল খেটেছে জীবনের বেশিরভাগ সময়। সব ছেড়ে রানার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মানুষটা একসময় ভালবাসার বন্ধনে। রানাকে এতই শ্রদ্ধা করে যে ওর সামনে কিছুতেই চেয়ারে বসবে না গিলটি মিয়া। 'কিচু মনে করবেন না, সার। সেই সক্কাল থেকে তো বসেই আচি...'

আর একবার গিলটি মিয়ার উপর অসন্তুষ্ট দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে রানার সামনের চেয়ারে বসল লইয়ার ক্লিপটন। বড় একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'একজন লোককে খুঁজছি আমি। এটাই কাজ।'

'এই কাজ নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন কেন? পুলিশকে জানান। কিংবা কোনও প্রাইভেট আই-কে দিন কাজটা।'

'এটা পুলিশের কোনও ব্যাপার নয়, মিস্টার রানা,' যেন রানার নিরাসক্তি হতাশ করেছে ওকে। 'কী ব্যাপার, কাজ দরকার নেই নাকি আপনাদের?'

'কাজের অভাব নেই, আবার তেমন একটা চাপও নেই। আসল কথা, এটা আমাদের লাইনের কাজ নয়।'

'যা চাইবেন সেই ফি পেলে কি...'

'আমাদের ফি সম্পর্কে ধারণা আছে আপনার?'

মাথা নাড়ল লইয়ার। 'বলুন, কত দিতে হবে আপনাকে?'

গিলটি মিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'শোনাও দেখি, গিলটি মিয়া, কত পেলে করবে তুমি কাজটা?'

লোকটার উপর চোখ বুলাল গিলটি মিয়া। মনে মনে বলল, 'নাহ্! এ-লোককে এট্টুও পচোন্দ হচ্চে না আমার!' মুখে বলল, 'সব কতা না শুনে, কদ্দিনের কাজ না জেনে লিদ্দিষ্ট কিচু তো বলা

যায় না, সার। একটা আন্তাজ দিতে পারি বড়জোর। আমাদেরকে লিলে পেত্যেক দিনের লেগে দু' থেকে পাঁচ হাজার টাক... থুড়ি, ডলার মজুরি গুনতে হবে। আগাম দিতে হবে দু'দিনের ফিশ।'

কথাগুলো অবশ্য বাংলায় বলেনি ও, নিউ ইয়র্কের সাদা লোকগুনো বাংলা বোজে না। তাই ইংরেজি-বাংলা-হিন্দি-জার্মান-ফ্রেঞ্চ-ইটালিয়ান, মোটকথা পৃথিবীর তাবৎ ভাষা মিলিয়ে কাজ চালানোর মত নিজের একটা বুলি তৈরি করে নিয়েছে ও। আর আশ্চর্য হলেও সত্য, ওর কথা বুঝতে কারও অসুবিধে হয় না, সবাই কী করে জানি বুঝে নেয় কী বলছে। এই লোকও বুঝেছে।

'অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে না?' ফি-র বহর শুনে ভিরমি খেল লইয়ার। 'শুনে তো মনে হচ্ছে, আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এ-রকম একটা অফিস নিয়ে বসলেই ভাল করতাম।'

'আপনাকে আঁটকাচ্চে কে? সেইটেই করুন না, মিশটার,' একগাল হেসে নিষ্পাপ চোখ মেলে বলল গিলটি মিয়া। 'আপনার এই কেস লিয়েই আরাম্ব কত্তে পারেন ব্যবসা।'

গিলটি মিয়ার দিক থেকে চোখ সরিয়ে রানার মুখের দিকে চাইল ক্লিপটন। 'ঠিক আছে, উপযুক্ত ফি দিতে রাজি আছি আমি। ব্যাপারটা হয়েছে কী...'

'প্লিজ, ওর সঙ্গে যান। ওর অফিসে বসে কাজটা বুঝিয়ে দিন। খাতায় নোট নিতে হবে ওর, অগ্রিম টাকা নিয়ে রসিদও দেবে ও-ই। আমার ধারণা, দু'দিনের বেশি লাগবে না ওর এই কাজে।'

'কিন্তু আপনি শুনবেন না...'

'শুনব। এই ঘর থেকে আপনাদের সব কথাই শোনা যাবে।' দেয়ালে বসানো স্পিকার দেখাল রানা ইঙ্গিতে। 'কাজটা ও-ই করবে, তবে কাজ শুরু হওয়ার পর প্রয়োজনে আমার পরামর্শ নেবে। যান।'

মাস দুয়েকের জন্য গিলটি মিয়াকে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে ঢাকা

থেকে। যদিও এই দেশটা ওর *পচোন্দো* নয়, রানার নির্দেশে আসতেই হয়েছে *লিতান্ত বাদ্য* হয়ে। ক্লিপটনকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কামরায় ফিরে বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসল সে রিভলভিং চেয়ারে। আইনজীবী বসল সামনের গদিমোড়া চেয়ারে। বার দুই দোল খেয়ে নিয়ে বেল টিপল গিলটি মিয়া। জিজ্ঞেস করল, 'কী খাবেন, মিশটার আদম? চা না কপি?'

সামনের লোকটা মাথা নাড়ছে দেখে বেয়ারাকে বলল, 'কেবিন সায়েবকে পেঠিয়ে দাও দিকিন, বাছা।'

ক্যাভিন এসে বাউ করতেই তার দিকে কলম আর প্যাড এগিয়ে দিল গিলটি মিয়া। 'এ ভদ্দরনোক যা বলেন, লিকে ল্যাও তো, ভাই। জানই তো, আমি এক্কেবারে বকলম; আবার এ-ও জান, বুজতে পারি সব। কাজেই সাবদানে লিকবে, স্যাঙাৎ, কিচু যেন ছুটে না যায়। ঠিক আচে?'

'ইয়েস, বস্,' বলে একটা চেয়ারে বসে পড়ল স্যাঙাৎ। গত দেড়টি মাস গিলটি মিয়াকে পরম গুরু মেনে নিয়ে মন দিয়ে শিখছে ক্যাভিন হাওয়ার্ড গোয়েন্দাগিরির নিত্যনতুন, অভূতপূর্ব সব কলা-কৌশল।

শুরু করল অ্যাডাম ক্লিপটন।

'আমি খুঁজছি রবার্ট স্ট্যানলি নামের এক লোককে। বছর দেড়েক আগে স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে মোট বিশ লাখ ডলারের সম্পত্তি রেখে মারা গেছেন এই লোকের চাচা, আর্থার হেনরি। উইলে এই রবার্ট স্ট্যানলিকে দিয়ে গেছেন তিরিশ হাজার ডলার। তখন থেকেই উইলের এগজিকিউটার হিসেবে খুঁজছি আমি ওই লোককে। ওকে না পেলে উইলটা কার্যকর করা যাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাসকয়েক আগে লোকটাকে লোকেট করা গেল ফ্রান্সের নিস-এ। জানা গেল, স্ট্যানলি ওখানে হিপ্পি আদর্শের গাঁজা খাওয়া বিদ্রোহী এক অখ্যাত তরুণ পেইন্টার। সঙ্গে সঙ্গে আমি এয়ারমেইলে চিঠি দিয়ে তাকে জানালাম তার প্রাপ্য টাকার

কথা, ওটা নেয়ার জন্যে ওকে এখানে আসতে হবে, তা নইলে অন্যান্য ভাগীদারদের কাউকেই সম্পত্তির ভাগ দেয়া যাচ্ছে না। সাধারণ ডাকে উত্তর এল সে-চিঠির। ও জানতে চায়: টাকাটা পাঠিয়ে দিলে কী হয়, কেন ওকে কষ্ট করে নিউ ইয়র্কে যেতে হবে। বার কয়েক চিঠি চালাচালির পর শেষ পর্যন্ত সপ্তাহ দুয়েক আগে প্লেনে উঠেছিল ও এখানে আসবে বলে। তুমি... আপনি হয়তো খবরটা পড়েছেন, প্লেনটা কেনেডি এয়ারপোর্টে ক্র্যাশ করে আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।'

'লে হালুয়া! তাহালে ওকে আর এই দুনিয়ায় খুঁজে লাব কী? ওপারের কোনও ডিটেকটিবকে...'

'খবরের কাগজে লিখেছে: ওই দুর্ঘটনায় যে তিনজন প্রাণে বেঁচেছিল, স্ট্যানলি তাদের একজন।'

'ও, তা-ই বলুন, বেড়ালের জান। তারপর?'

'পিছনের দিকে সিট পেয়েছিল ও। অ্যাকসিডেন্টের ধাক্কায় প্লেনের লেজটা খসে যাওয়ায় ছিটকে বাইরে পড়ে আগুন আর মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে।'

'হাঁ। কপালের জোর আচে বলতে হবে। পঁচালব্বই জনের মদ্যে বেরালব্বই জনই যকোন খতম, তকোন এটাকে কপাল ছাড়া আর কী বলা যায়, বলুন।'

লইয়ার বুঝে নিল, সব খবরই রাখে এই পিচ্চি জোকার—একে ছোটনজরে দেখা ঠিক হবে না।

'কাছেই ব্রুক হাসপাতাল, সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। দেখা গেল, নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে যাওয়ায় কিছুটা উদভ্রান্ত, কিন্তু সারা শরীরে কোথাও কোনও জখম নেই ওর। এটা জেনে পরদিন সকালে হাসপাতালে ফোন করে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম। ওরা বলল: হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বাইরে কোথাও ফোন করেছিল ও, কয়েক মিনিটের মধ্যে এক সুন্দরী মহিলা এসে নিয়ে গেছে ওকে। এরপর থেকে আর

কোনও খবর নেই—হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে রবার্ট স্ট্যানলি। কয়েকটা কাগজে বিজ্ঞাপন ছেপে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি।'

'খবর লিয়ে দেকেচেন, এই ইস্ট্যানলি ওর পরিবারের লোকেদের সাতে যোগাযোগ করেচে কি না?'

'করেনি। এ হচ্ছে সম্পত্তির মালিক পরলোকগত আর্থার হেনরির ছোট ভাইয়ের পোষ্যপুত্র। পরিবারের কেউ ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না। ছোটবেলা থেকেই নাকি বেয়াড়া কিসিমের ছিল রবার্ট, কারও সাথেই পড়তা পড়ত না। ওর পালক বাপ-মা সাত বছর আগে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর আরও বেপরোয়া হয়ে যায় ও, কিছুদিনের মধ্যে চলে যায় দেশ ছেড়ে, তারপর থেকেই লাপাত্তা। আর্থার হেনরির মৃত্যুর পর সঙ্গত কারণেই তাঁর উত্তরাধিকারীরা অস্থির হয়ে উঠেছে তাদের প্রাপ্য বুঝে নেওয়ার জন্য; অনেক টাকার ব্যাপার তো, সারাক্ষণ খোঁচাচ্ছে আমাকে।'

চুপচাপ খানিকক্ষণ চিন্তা করল গিলটি মিয়া। তারপর বলল, 'কত বললেন? তিরিশ হাজার? বেকার এক আটিশের লেগে এ তো অনেক টাকা। বে থা করেচে?'

'না, আমি যদ্দূর জানি, করেনি। আমি আসলে চিনি না ওকে, একটা ফটো পর্যন্ত দেখিনি। পরিবারের সবাই শেষ দেখেছে ওকে বহু বছর আগে, ওর যখন চার বছর বয়স। ওর পালক বাপও কিছুটা উদ্ভট কিসিমের লোক ছিল, বিয়ে করেছিল এক রেড ইণ্ডিয়ান মেয়েকে। ওর চাচা যে মনে করে ওকে উইলে কিছু দিয়ে গেছে, তা দেখে পরিবারের সদস্যরাই শুধু নয়, আমিও তাজ্জব হয়ে গেছি। কারও সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনি বলেই ওকে খুঁজে বের করতে এত সময় লেগেছে আমার।'

'ওর খোঁজ পেলেন কী করে, মিশটার আদম ব্যাপা... থুড়ি, কিলিপটন?'

'আমি না, ওরই এক কাজিন কাগজে ওর নামটা দেখে আমাকে ফোন করেছিল। নিসের আমেরিকান কনসুলেটের সামনে

পিকেটিং করছিল কয়েকজন আর্টিস্টকে সঙ্গে নিয়ে। পুলিশ বেঁধে নিয়ে যায় ওদের। আন্দাজে ভর করে একটা চিঠি ছেড়ে দিলাম। জানা গেল, এ-ই সেই লোক। এত লেখালিখির পর একটি মাত্র তথ্য জানা গেছে ওর সম্পর্কে—ওর বয়স ছাব্বিশ বৎসর, ব্যস, আর কিচ্ছু না।'

'আপনার এ তথ্য মোটেই কাজের কিচু লয়, আদম সায়েব। ঠিক আচে, আমরা চেষ্টার তুটি করব না, তবে পেত্যেকদিনের লেগে খরচ পড়বে আপনার আড়াই হাজার করে। একোন বুজে দেকুন, রাজি কি না।'

'বেশ। ওর খোঁজ পেলেই আমাকে জানাবেন।' উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে মোটাসোটা একটা ওয়ালেট বের করে নিজের ভিজিটিং কার্ড আর দু'দিনের ফি গুনে দিল লোকটা ক্যাভিনের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে একটা রসিদ লিখে দিল ক্যাভিন। রসিদ নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবার আগে নীল চোখের দৃষ্টি রাখল লোকটা গিলটি মিয়ার উপর। 'কাজটায় গোপনীয়তা বজায় রাখলে খুশি হব।'

'কী বললেন?' জিজ্ঞেস করেই নিজেকে সামলে নিল গিলটি মিয়া। 'ঠিক আচে, তাই হবে।'

অ্যাডাম ক্লিপটন বেরিয়ে যেতেই রানার কামরায় এসে ঢুকল গিলটি মিয়া। দেড়মাস পর রানাকে দু'দিনের জন্য একা পেয়েছিল, মোটকু লোকটা এসে বাজে একটা কাজ চাপিয়ে দিয়ে সব ভজকট করে দিয়ে গেল বলে বিরক্ত।

'কী বুজলেন, সার? বাজে সোমায় লষ্ট না?'

'কীভাবে এগোবে ভাবছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'সেই তো একই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়! হাঁসপাতাল থেকে শুরু কত্তে হবে একোন। জানা দরকার ছোকরা ওখেন থেকে পালাই-পালাই করল কেন, গেলই বা কার সাতে, কোতায়। সাঁজ তো হয়ে এল, ভাবচি, এখুনি একবার গিয়ে খোঁজ লিয়ে আসি।'

'চলো, আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' সামনের ফাইলটা বন্ধ করে আউট ট্রে-তে নামিয়ে রেখে বলল রানা। 'তার আগে, দাঁড়াও দু'টো টেলিফোন সেরে নিই।'

একটা ক্রেডিট রেটিং হাউসে ফোন করে এক বন্ধুকে দুটো নাম দিয়ে তাদের রেটিং জানাবার অনুরোধ করল রানা। প্রথম নামটা নিউ ইয়র্কের লইয়ার অ্যাডাম ক্লিপটন, দ্বিতীয়টা নিস-এর রবার্ট স্ট্যানলি। এরপর নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক পরিচিত সাংবাদিকের কাছ থেকে জেনে নিল প্লেন ক্র্যাশের সঠিক সময়টা।

ব্রুক হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ডিউটি অফিসারকে রানা এজেন্সির লাইসেন্স দেখিয়ে ওদের আগমনের উদ্দেশ্য জানাল রানা। বলল: রবার্ট স্ট্যানলিকে দরকার তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য ত্রিশ হাজার ডলার বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে লোকটা কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেল, খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্ঘটনার দিন যেসব ডাক্তার-নার্স ডিউটিতে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলা গেলে হয়তো কিছু সূত্র পাওয়া যেত। সব শুনে ভদ্রলোক ইণ্টারকমের মাধ্যমে ব্যবস্থা করে ওদের সঙ্গে একজন ওয়ার্ড-বয়কে দিলেন ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয়ার জন্য।

নার্স দুজনের কাছ থেকে রবার্ট স্ট্যানলির চেহারার একই বর্ণনা পাওয়া গেল: লম্বা, স্পোর্টসম্যানের মত একহারা গড়ন, ওজন পঁচাত্তর কেজির মত, কালো চুল, সাদামাটা চেহারা। আন্দাজ, ত্রিশের মত হবে বয়স। কোটের বেশ কিছু অংশ পুড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বললেন, 'রবার্ট স্ট্যানলির শরীরে কোথাও কোনও আঘাত বা জখমের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কেবল কিছুটা নার্ভাস দেখাচ্ছিল। বলল: ব্যথা অনুভব করছে না, সেডেটিভের কোনও প্রয়োজন নেই। ঘণ্টাখানেক পর একটু সুস্থির হয়ে বাইরে কোথায় যেন ফোন করল। বিশ মিনিটের মধ্যেই বছর পঁচিশেকের

সুন্দরী এক মহিলা এসে দেখা করল ওর সাথে। তারপর ডাক্তারদের কারও বারণ না মেনে চলে গেল ও মেয়েটির সঙ্গে—কোথায়, কে জানে!'

'বেডে শুয়েই ফোন করেছিল?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ।'

'গুড। তা হলে তো নিশ্চয়ই কোথায় ফোন করেছিল তার রেকর্ড রয়েছে সুইচবোর্ডে। নম্বরটা আমাকে দেওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই।'

নম্বরটা নিয়ে ফিরে এল ওরা এজেন্সির অফিসে। গিলটি মিয়া বলল, 'কেবিনের এক বন্দু আচে, সার, টেলিফোন কোম্পানিতে।'

'বেশ, ডাকো ওকে।'

ইনভেস্টিগেশনে ওর সাহায্য দরকার শুনে বত্রিশ পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ল ক্যাভিন হাওয়ার্ডের। তিন মিনিটের মধ্যে জানা গেল নম্বরটা ফিলিপ শেফার্স নামে এক লোকের, ঠিকানা: ১৪৪২/ডি, পিজিয়ন লেন, কুইন্সভিল রেসিডেনশিয়াল এরিয়া, নিউ ইয়র্ক।

রানা জানে, ওখানে নিম্ন-মধ্যবিত্তদের বাস। রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট অনেকগুলো একতলা বাড়ি আছে ওখানে লাইন দিয়ে।

'চলো, বাড়িটা চিনে আসা যাক,' বলল রানা। ক্যাভিনের দিকে চেয়ে হাসল, 'তুমিও চলো।'

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ছোকরা। চোখদুটো জ্বলছে সন্ধ্যাতারার মত। সোজা কথা? রানা এজেন্সির চিফের সঙ্গে চলেছে সে একটা কেসের সমাধানে তাঁকে সাহায্য করতে! বাপরে, বাপ!

নম্বর মিলিয়ে চিনতে অসুবিধে হলো না। বাড়িটার সামনে ছোট্ট লন। দরজা বন্ধ। ধীর গতিতে গাড়ি চালিয়ে পুরো এলাকাটা একবার ঘুরে দেখে চলে এল ওরা অফিসের কাছাকাছি এক রেস্টুরেন্টে। এখানে ভাল বাংলাদেশি খাবার পাওয়া যায়। খাওয়ার পর গিলটি মিয়া ও তার সাকরেদকে বিদায় দিয়ে সেঁটে

একটা ঘুম দেবে বলে চলে গেল রানা নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। ঠিক হলো, আগামীকাল সকাল থেকে শুরু হবে ওদের কাজ। দায়িত্বে থাকবে গিলটি মিয়া, সহকারী ক্যাভিন হাওয়ার্ড। দুই দিনের মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে স্ট্যানলিকে। কাজটার শেষ দেখেই রানা চলে যাবে লস অ্যাঞ্জেলেস শাখা পরিদর্শনে।

পরদিন সকাল দশটায় ফোন করল রানা ক্রেডিট অফিসে। এরা এফবিআই-এর চেয়েও ভাল রেকর্ড রাখে। বন্ধু জানালো, 'রবার্ট স্ট্যানলির উপর কোনও রেকর্ড নেই; তার মানে লোকটা বাউণ্ডুলে, বাঁধা কোনও চাকরি বা কাজ নেই—অর্থাৎ, ক্রেডিট রিস্ক। তবে ওই অ্যাডাম ক্লিপটনকে ধার দিলেও ঠকবি। একটা অ্যাপ্লায়ান্স স্টকে বড় দান মারতে গিয়ে আচ্ছা ধোলাই খেয়েছে লোকটা বছরখানেক আগে। আইন ব্যবসায় ওর রোজগার বছরে বড়জোর বিশ হাজার ডলার, কিন্তু খরচ করে তার দ্বিগুণেরও বেশি—বাড়ি রয়েছে শহরতলির ধনী এলাকায়, দুটো গাড়ি এবং একটা খরুচে বউ পোষে, গোটা দুই অভিজাত ক্লাবের মেম্বার। দেনায় গলা পর্যন্ত ডুবে আছে লোকটা। মাস দুয়েক আগে কিছু শেয়ার বিক্রি করে কয়েকজনের ঋণ শোধ করেছে। কিন্তু এখনও প্রচুর দেনা। ধনী পরিবারে জন্ম। নিঃসন্তান এক কাকা মারা গেলে উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক টাকার মালিক হবে। কিন্তু কাকাটা কিছুতেই মরছে না, ঊনআশি বছর বয়সেও পাল্লা দিয়ে নিয়মিত টেনিস খেলে চলেছে ছেলে-ছোকরাদের সাথে। ভাতিজার চেয়ে অনেক ফিট। বুঝলি এখন?'

'হুঁ,' বলল রানা। 'শোন্, আরেকজনের ক্রেডিট রেটিং জানা দরকার। নামটা হচ্ছেঃ ফিলিপ শেফার্স। নিউ ইয়র্কেই, কুইন্সভিল রেসিডেনশিয়াল এরিয়ায় থাকে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বলতে পারবি না?'

'দশ মিনিটেই পারব। যখন খুশি রিং দিস্, অফিসেই আছি।'

বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। সকাল সাতটায় ক্যাভিনকে নিয়ে বেরিয়েছে গিলটি মিয়া। রানাকে কাজ দেখিয়ে সন্তুষ্ট, এবং স্যাঙাৎকে মুগ্ধ করবার সুযোগ পেয়ে টগবগ করে ফুটছে সে উৎসাহ, উত্তেজনায়। একটা ফাইল টেনে নিয়ে মন দিল রানা সেটায়। জটিল কেস। মুচকি হাসল ও ক্যাভিনের লেখা গিলটি মিয়ার মন্তব্য পড়েঃ ওর ধারণা, ওই কেসের দজ্জাল বুড়িটাকে যদি পা বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে দোয়া যেত, তাহালে সত্যি কতাটা বেরিয়ে আসত নিগ্‌ঘাত!

দুই

ঠিক সাড়ে আটটায় ফিলিপ শেফার্সের বাড়ি থেকে ত্রিশ গজ দূরে রাস্তায় পার্ক করা তোবড়ানো টয়োটা স্প্রিণ্টারে এসে ঢুকল গিলটি মিয়া। নাস্তা করতে গিয়েছিল। ফিরে এসেছে দুই হাতে দুটো প্যাকেট নিয়ে। ছোট প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল ক্যাভিনের দিকে, 'ল্যাও, ভাই, চারটে খেয়ে ল্যাও। তারপর নাববো আমরা কাজে। খেতে খেতে শোনাও দিকি গত একটা ঘণ্টায় কী দেকলে।'

কৃতজ্ঞচিত্তে ওস্তাদের আনা প্যাকেটটা খুলল ক্যাভিন। সুন্দর করে সাজানো রয়েছে সকালের নাস্তাঃ ম্যাকডোনাল্ডসের দুটো ক্লাব স্যাণ্ডউইচ, দুটো বার্গার, দুই পিস গ্রিল করা পুরু স্টেইক ও আলুভাজা। পাশে আলাদা একটা খোপে শোয়ানো আছে কোকের বোতল। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে শোনাল ক্যাভিন, 'তেমন কিছুই ঘটেনি, ওস্তাদ। হুম-হাম হুম-হাম, কোঁৎ। সাড়ে সাতটায় দরজার সামনে দুধের বোতল রেখে গেছে মিল্ক-ভ্যান। সাতটা পঞ্চাশে সোনালি চুলের এক সুন্দরী ওটা তুলে নিয়ে গেছে ভেতরে।'

'শেফার মিয়া কাজে যায়নি?'

'ঢক-ঢক-ঢক, কেউ বেরোয়নি, কেউ ঢোকেনি, ওস্তাদ। ঘ্যাঁ-ও!'

মাথা ঝাঁকিয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে বাড়িটার উপর চোখ বুলাল গিলটি মিয়া কিছুক্ষণ। 'লে হালুয়া!' ভাবছে সে, 'হাতে বেশি সোমায় নেইকো। ও-বাড়িতে ঢুঁকতে হবে না? সায়েব-বিবি না বেরুলে পরে টেলিফোনে ছারপোকাটা রাকা তো কটিন হয়ে যাবে!'

ক্যাভিনের নাস্তা ও কোক শেষ হতেই ওর দিকে বাড়িয়ে দিল গিলটি মিয়া বড় প্যাকেটটা।

'কী আছে এর ভেতর?' জানতে চাইল সাগরেদ।

'খুলেই দ্যাকো না,' বলল গিলটি মিয়া। 'তোমার বেশভুষো। ল্যাও, পরে ল্যাও এগুনো।'

প্যাকেটের ভিতর থেকে বের হলো টুলবেল্ট, ব্যাগ ও তোবড়ানো ক্যাপ সহ টেলিফোন মিস্ত্রির একটা আধময়লা ওভারল। ওগুলো পরা হয়ে যেতেই পকেট থেকে টুথব্রাশের মত একফালি গোঁফ বের করে সাঁটিয়ে দিল গিলটি মিয়া ক্যাভিনের নাকের নীচে। একটা লোমওয়ালা জড়ুল বসিয়ে দিল গালে, চোখের ঠিক নীচে।

'দারুণ মানিয়েচে, মাইরি!' বলল সে খুশি হয়ে। 'এবার ধরো এই ছারপোকাটা। টেলিফোনের মদ্যে ঢুঁকিয়ে দিয়ে এসো, আমি বাকি কাজ সেরে রাকচি।'

ক্যাভিনকে বিদায় দিয়ে একটা ওয়ায়্যারলেস রিসিভার ফিট করল সে ভয়েস কণ্ট্রোল্ড্ রেকর্ডারের সঙ্গে। কথা শুরু হলেই চালু হয়ে যাবে টেপরেকর্ডার, কথা থেমে গেলে থামবে। সব রেডি হয়ে গেলে গাড়িটা শেফার্সদের বাড়ি থেকে একশো গজ দূরে নিয়ে গিয়ে রাখল রাস্তার অপর পাশে।

ওদিকে সোজা গিয়ে শেফার্সদের বাড়ির দরজায় কলিংবেল টিপল ক্যাভিন। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে ছিটকিনি সরাল কেউ।

দরজার ফাঁক দিয়ে গোলাপি হাউসকোট পরা সেই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখা গেল। আর কাউকে আশা করেছিল হয়তো, ওকে দেখে হতাশা ফুটল চোখেমুখে। একনজরে বোঝা গেল, খুবই উৎকণ্ঠায় রয়েছে মেয়েটি, চোখের নীচের কালচে দাগ বলে দিচ্ছে, রাতে ঘুমাচ্ছেও কম। হাতের নোটবইয়ের দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল ক্যাভিন, 'মিসেস ফিলিপ শেফার্স?'

'হ্যাঁ, আমি মিসেস শেফার্স।'

'কোড এরিয়া ফোন লাইনে একটা হামিং সাউণ্ড আসছে, ম্যাম। কোথায় শর্ট হয়ে আছে লাইন দেখতে এসেছি।' নিজেকে টেলিফোন কোম্পানির লোক বলে মিথ্যে পরিচয় না দিয়ে জানতে চাইল, 'টেলিফোনটা কোথায়, ম্যাম?'

'আমার ফোন ঠিক আছে।'

'ইয়েস, ম্যাম,' হাসিমুখে নরম গলায় বলল ও, 'তবে আপনার লাইনে যদি কোনও শর্ট থাকে তা হলে আর সব সার্কিটে গোলমালের সৃষ্টি করবে। চেক করতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগবে আমার।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আসুন।'

লিভিংরুমটা অত্যন্ত সাদামাটা আসবাবে সাজানো। প্রথমেই রিসিভার তুলে অপারেটরের সঙ্গে কথা বলার ভান করল ক্যাভিন। তারপর রিসিভারের স্ক্রু খুলে মহিলার চোখের সামনেই ছোট্ট মাইক্রোসার্কিট ট্র্যান্সমিটারটা ফিট করল জায়গা মত। এগুলো ছোট হলে কী হবে, টেলিফোনে বলা প্রতিটা শব্দ পৌঁছে দেবে দুশ' গজ দূরের রিসিভারে। কাজ হয়ে যেতেই রিসিভারটা জোড়া লাগিয়ে ক্রেড্‌ল্‌ টিপে ছেড়ে দিয়ে ডায়াল টোন চেক করল, তারপর বলল, 'আপনার ফোন ঠিকই আছে, মিসেস শেফার্স। তবু বাড়তি সতর্কতা হিসেবে দুর্বল এক-আধটা পার্টস বদলে দিলাম। অনেক ধন্যবাদ, ম্যাম।'

গাড়িতে ফিরে এসে ছদ্মবেশ খুলে ফেলল ক্যাভিন হাওয়ার্ড।

মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল ওস্তাদকে, কাজ হয়ে গেছে। গিলটি মিয়া জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িতে আর কাউকে দেকলে?'

'নাহ্, কাউকে দেখিনি। মনে হলো মেয়েটা কারও অপেক্ষায় আছে, খুব্ব দুশ্চিন্তায়। এবার, ওস্তাদ?'

'এবার একটু ঘুরে-ফিরে এসো বাইরে থেকে। আদঘণ্টা পর পাবলিক ফোনবুত থেকে কতা বলবে তুমি মেয়েটার সাতে।' কী কথা বলতে হবে ক্যাভিনকে শিখিয়ে দিল গিলটি মিয়া।

আধঘণ্টা পর শেফার্সদের নম্বরে রিং দিল ক্যাভিন। মেয়েটি রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই গলাটা ভারী করে বলল, 'মিসেস শেফার্স, আমি রবার্ট স্ট্যানলির একজন শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু। আপনি কি...'

'রং নাম্বারে কল করেছেন!' বলেই খটাং করে নামিয়ে রাখল মেয়েটি রিসিভার।

আবার ডায়াল করল ক্যাভিন। পাঁচ-ছয়বার বাজার পর রিসিভার তুলল মেয়েটি, 'ইয়েস?'

'মিসেস শেফার্স, আমি কী বলি না শুনেই রিসিভার নামিয়ে রাখবেন না। আমি জানি, প্লেনক্র্যাশের পর আপনি রবার্ট স্ট্যানলিকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসেছেন। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বড় অঙ্কের টাকা ওঁর হাতে তুলে দিতে চাই। আপনি যদি...'

'আমি একবার আপনাকে বলেছি: ভুল নাম্বারে ডায়াল করেছেন আপনি! রবার্ট কী যেন বললেন, ওই নামের কাউকে চিনি না আমি। দয়া করে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না!' বলেই আবার আছড়ে রাখল মহিলা রিসিভার।

ক্যাভিনের মনে হলো, হিস্টিরিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে মেয়েটির আচরণে। ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করবার প্রয়োজন হলো না, ওয়ায়্যারলেস রিসিভারের কল্যাণে সবই শুনেছে গিলটি মিয়া। বরং সে-ই শোনাল নতুন খবর।

'তোমার দুইলম্বর কল পাওয়ার আদ মিলিটের মদ্যেই পোটল্যান হোটেলের ২৩২ লম্বর কামরায় মিশটার ব্রেনান বলে একজনের সাতে কতা বলেচে মেয়েটা। বোধায় ওই নামেই ওখেনে উটেছে ইস্ট্যানলি। থত্থর করে কাঁপচে গলা, তোমার সাতে কী কতা হলো সব জানাল মেয়েটা ওকে। নিজ কানে শুনে দ্যাকো।'

রেকর্ডার রিওয়াইণ্ড করে চালিয়ে দিল গিলটি মিয়া।

'শান্ত হও, রিটা। একটুও ঘাবড়িয়ো না তুমি। সব ঠিক হয়ে যাবে। লোকটা আবার যদি ফোন করে, তুমি সাফ বলে দেবে ওর একটা কথাও বুঝতে পারছ না। আচ্ছা, রিটা, কয়েকটা দিন তোমার মায়ের কাছে গিয়ে থাকো না। ঝামেলা সামলে নিয়েই আমি ডেকে পাঠাব তোমাকে।'

'ওখানে গিয়ে মিথ্যে অভিনয় করতে পারব না আমি। অসম্ভব। এমনিতেই ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছে আমার। বিশ্বাস করো, দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছি... স্রেফ পাগল হবার দশা!'

'শান্ত থাকার চেষ্টা করো, হানি। এক কাজ করো, টেলিফোন এলে ধোরো না। কিংবা... তার চেয়ে ভাল হয়, চলে এসো আমার এখানে।'

'কিন্তু মা যদি ফোন করে দেখে কেউ ধরছে না, তা হলে কী তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে কে জানে! হয়তো... উফ্! মনে হচ্ছে ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছি আমি!'

'রিটা, মাথা ঠাণ্ডা রাখো, লক্ষ্মীটি। এখন পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক মত চলছে। আমার কথা শোনো: তোমার ঘনিষ্ঠজনদের ফোন করে জানিয়ে দাও, দিন কয়েকের জন্যে অন্য কোথাও যাচ্ছ তুমি, বলবে: এ-বাড়িতে একা থাকতে গা ছমছম করছে তোমার, চমকে চমকে উঠছ, এইসব আরকী। তারপর চলে এসো আমার কাছে। দুপুর দুটোর মধ্যে পৌঁছে যাবার চেষ্টা কোরো। কোনও ভয় নেই, কোনও বিপদ হবে না—নিজেকে শান্ত রাখতে পারলে দেখবে

কয়েকদিনেই স্বাভাবিক হয়ে গেছে সব। তা হলে রাখি এখন... দেখা হচ্ছে দুটোয়, ছাড়লাম।'

'বাহ্! একেবারে পরিষ্কার রেকর্ডিং!' হাসল ক্যাভিন। 'এখন আমরা কী করব, ওস্তাদ?'

'সেইটে জানতেই একবার আপিসে যেতে হবে আমাদের,' বলল গিলটি মিয়া। 'রেকর্ডারটা অটোতে সেট করাই আচে। এই ক্যাসেট খুলে আরাকটা ফিট করে দিচ্চি, তুমি গাড়িটা লিয়ে গিয়ে ও-বাড়ির কাচাকাচি পার্ক করে ইঞ্জিলের বনেট খুলে এটা-ওটা ঘাঁটো, তারপর দরজা-জানলা লক করে চলে এসো আমার কাচে। আমরা প্রথমে উ-ই ওষুদের দোকানে যাব, তারপর আপিসে।'

ওষুধের দোকানে ফোনবুক ঘেঁটে জানা গেল, পোর্টল্যাণ্ড হোটেলটা ব্রুকলিনে।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এল ওরা অফিসে। দেখল, দুই পা টেবিলের উপর তুলে দিয়ে এক হাতে কফির কাপ, অপর হাতে একটা ফাইল ধরে রেখে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রয়েছে মাসুদ রানা। ওদের দেখে সোজা হয়ে বসল।

চুপচাপ শুনল রানা আদ্যোপান্ত সব। দু'বার বাজিয়ে শুনল টেলিফোনের আলাপ।

'এবার?' জিজ্ঞেস করল ও, 'এবার কী করবে ভাবছ?'

'অ্যাকোন ওই আদম ব্যাপারী... থুড়ি, আদম কিলিপটন সায়েবকে ঠিকানাটা জানিয়ে দিলেই আমাদের কাজ শেষ।'

মাথা নাড়ল রানা।

'তার আগে জানতে হবে এই লোক সত্যিই রবার্ট স্ট্যানলি কি না। আর যদি স্ট্যানলিই হয়, পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন, কীসের ভয়ে। রিটা শেফার্সের সঙ্গেই বা তার কী সম্পর্ক। তা-ই না?'

'ঠিক বলেচেন, সার!' একযোগে মাথা ঝাঁকাল ক্যাভিন ও গিলটি মিয়া।

রানা বলল, 'চলো, আমিও যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে।'

তিন

মাঝারি মানের হোটেল, তবে নতুন। ছোকরা ঘাবড়ে যেতে পারে ভেবে গিলটি মিয়া আর ক্যাভিন হাওয়ার্ডকে নীচের ফয়ে-তে অপেক্ষা করতে বলে উঠে এসেছে রানা তেতলায়। টোকা দিতেই খুলে গেল ২৩২ নম্বর কামরার দরজা। জিন্সের প্যান্ট আর হালকা নীল, বুক-খোলা শার্ট পরা লম্বা এক লোককে দেখা গেল দরজার ওপাশে। চেহারা হুবহু মিলে যায় নার্সদের বর্ণনার সঙ্গে। অপরিচিত লোক দেখে কুঁচকে গেল ভুরু। বলল, 'সিধে রাস্তা মাপো, মিস্টার। কিছু কেনার মুডে নেই আমি এখন।'

কথাগুলোর সঙ্গে ভেসে এল সস্তা উইস্কির গন্ধ। দরজাটা বন্ধ করে দেবার আগেই জুতো পরা পা ঢুকিয়ে দিল রানা কপাটের ফাঁকে, তারপর বের করে দেখাল রানা এজেন্সির ইনভেস্টিগেশন লাইসেন্স।

'আপনার সঙ্গে কথা আছে, মিস্টার স্ট্যানলি।'

নামটা শুনে একটু বড় হলো চোখ, কার্ডটা খুঁটিয়ে দেখে নাক কোঁচকাল স্ট্যানলি। 'ও, প্রাইভেট টিকটিকি! ভাল চান তো কেটে পড়ুন, নইলে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।'

'ডাকুন না,' অমায়িক হাসি হাসল রানা। 'আপনি কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু না জেনেই বিরূপ আচরণ করছেন। আমি এসেছি আপনাকে ত্রিশ হাজার ডলার পাইয়ে দিতে। এ ব্যাপারে কিছু শুনতে কি আপনি বিরক্তি বোধ করবেন? নিশ্চয়ই না?'

'ঠিক আছে, বলুন কী বলার আছে আপনার।' রানার জুতোটা

লক্ষ করছে সে বাঁকা চোখে।

'করিডোরে দাঁড়িয়ে?'

'হ্যাঁ। যা বলবার এখানে দাঁড়িয়েই বলুন। বেশি সময় দিতে পারব না। আপনাকে উকিল ক্লিপটন আমার পেছনে লাগিয়েছে, তাই না?'

'ঠিক ধরেছেন। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন না কেন? উইল মোতাবেক বণ্টন-নিষ্পত্তির জন্যে খুঁজছেন তিনি আপনাকে, ধরে খেয়ে নেবার জন্যে নয়।'

'যখন ইচ্ছে হবে, আমি নিজেই দেখা করব। আপনি গিয়ে ওকে বলুন, পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে আমাকে উত্ত্যক্ত করার কোনও দরকার নেই। ওর আচরণ মোটেই পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

এক হাত উঁচু করে চুল ঠিক করল স্ট্যানলি। আঙুলের ফোলা গিঁঠগুলো দেখে ওটাকে শিল্পীর হাত মনে হলো না রানার, বরং মনে হলো কোনও বক্সারের হাত। নরম গলায় বলল, 'টাকাগুলো নিতেই আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এসেছেন আপনি আমেরিকায়। তা হলে কি ধরে নেব, আপনার প্রাপ্য ত্রিশ হাজার ডলারে আপনার আর আগ্রহ নেই?'

'ঠিক জানি না,' যেন খুব চিন্তায় পড়ে গেছে এমনি ভঙ্গিতে বলল স্ট্যানলি। 'এ-টাকা পাওয়া মাত্র একলাফে আমার ইনকাম চলে যাবে উঁচু ট্যাক্স-ব্র্যাকেটে। ট্যাক্স বেড়ে যাবে অনেক। কে জানে, আখেরে হয়তো ক্ষতিই হবে। ভাবছি, নিসে ফেরত যাওয়াই হয়তো আমার জন্যে ভাল হবে।'

'ক্লিপটনকে ফোন করে একথা জানিয়ে দেননি কেন?'

'ইচ্ছে হয়নি, তাই।' বলেই সিধে হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল স্ট্যানলি। 'এবার পা-টা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে কেটে পড়ুন, মিস্টার। আর একটা কথা বললে এক ঘুসিতে নাকটা ফাটিয়ে দেব।'

হাসল রানা। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভাই। অত রাগ করার মত কিছু হয়নি।' হাত বাড়িয়ে দিল সামনে। 'আমরা হাসিমুখেই বিদায় নিতে পারি।'

সুযোগটা হাতছাড়া করল না বদমেজাজি যুবক। খপ্ করে ধরল রানার হাত। ধরেই গায়ের জোরে চাপ দিল, মুখে শায়েস্তা করার হাসি। হাসল রানাও। তারপর ও যখন পাল্টা চাপ দিতে শুরু করল, প্রথমে বিস্ময় ফুটল শিল্পীর চোখে, তারপর মলিন হয়ে গেল হাসি। রানা আর একটু চাপ বাড়াতেই ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখটা, ঘাম দেখা দিল কপালে। ফরসা মুখটা যখন ব্যথায় নীল হয়ে যাচ্ছে, তখন ওর হাত একটু ঝাঁকিয়ে দিয়ে পা সরিয়ে নিল রানা দরজার ফাঁক থেকে। নিজের হাতটা চিত করে দেখল স্ট্যানলি, হয়তো গুনে দেখল আঙুল পাঁচটাই আছে কি না, তারপর দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা।

নীচে নেমে ফয়ে থেকে অ্যাডাম ক্লিপটনকে টেলিফোন করল রানা। স্ট্যানলির ছদ্মনাম ও ঠিকানাটা জানাল তাকে, তারপর বলল, 'মনে হচ্ছে, টাকাটার ব্যাপারে তেমন কোনও আগ্রহ নেই ওর মধ্যে। নিসে ফিরে যাওয়ার কথাও একবার উচ্চারণ করল।'

'তা হলে এখানে এসেছে কী করতে?'

'সেটা আপনিই জিজ্ঞেস করুন ওকে। আমাদেরকে ওর পেছনে লাগানোয় রেগে গেছে লোকটা। আমার মনে হচ্ছে, কী এক কারণে যেন পালাই পালাই করছে, ওকে ধরতে হলে উড়ে চলে আসতে হবে আপনার এখানে।'

'আচ্ছা,' বলল ক্লিপটন। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। চমৎকার কাজ দেখিয়েছেন। আপনাদের কাজ শেষ, আর কোনও সাহায্য দরকার হবে না আমার। ...রাখলাম।'

'দাঁড়ান, এক সেকেণ্ড,' বলল রানা। 'আমাদের ধারণা, স্ট্যানলি এখন হোটেল বদলাবে। এক্ষুনি না এলে ওর দেখা পাবেন না।'

'ঠিক আছে। আপনাদের পছন্দ করছে না যখন, এখন থেকে যা করার আমি নিজে করব, আপনাদের দায়িত্ব শেষ। ধন্যবাদ।' কানেকশন কেটে দিল অ্যাডাম ক্লিপটন।

চিন্তিত ভঙ্গিতে জুলফির নীচটা চুলকাল রানা। তারপর গিলটি মিয়া ও ক্যাভিনকে নিয়ে গাড়িতে উঠে তেতলায় যা-যা ঘটেছে সব বলল।

'আমার সন্দো হচ্চে, সার, সব একোনও শেষ হোইনিকো।'

'ঠিক বলেছ,' বলল রানা। 'তোমাদের এখন ওই ট্র্যান্সমিটারটা উদ্ধার করতে হবে শেফার্সদের টেলিফোনের রিসিভার থেকে। তা নইলে ওটা পুলিশ বা টেলিফোন কোম্পানির কারও চোখে পড়লে আজ হোক বা কাল, কারা ওটা লাগিয়েছে তা ট্রেস করা যাবে। মস্ত ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে রানা এজেন্সি।'

'মেয়েটা বেরিয়ে গেলেই ওটা খুলে লিয়ে আসব, সার।'

মাথা নাড়ল রানা। 'দিনে-দুপুরে ও-বাড়িতে ঢোকা খুবই রিস্কি হবে। চারপাশে অনেক লোক, অনেক বাড়িঘর। আবার একবার টেলিফোন মিস্ত্রীও সাজা যাবে না। কাজটা সারতে হবে তোমাদের সন্ধের পর।'

তবে অফিসে ফেরার পথে পিজিয়ন লেন হয়ে এলো ওরা। ক্যাভিনের তোবড়ানো টয়োটা স্প্রিণ্টার সামান্য কাত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার ধারে। মোড় ঘুরেই দাঁড় করালো রানা গাড়ি, একটা কাগজে লিখল: গাড়িটা বিকল, মেকানিকের অপেক্ষায় দাঁড়ানো, তারপর ক্যাভিনকে বলল, 'এটা সাঁটিয়ে দিয়ে এসো ওটার উইণ্ডশিল্ডে।'

অফিসে ফিরে গিলটি মিয়া তার লোকজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কাজে। রানা ঢুকল গিয়ে নিজের অফিস কামরায়। পিওন ছুটল সবার জন্য লাঞ্চ আনতে।

প্রথমেই ফোন করল রানা ক্রেডিট রেটিং অফিসে ওর বন্ধুর কাছে। বন্ধু জানাল: শেফার্সরা দুজন মিলে বছরে আয় করে

এগারো হাজার দুইশ' ডলার। বিশ হাজার দিয়ে কিনেছে ওরা বাড়িটা চার বছর আগে, পনেরো হাজার ডলার শোধ হবে ইন্সটলমেণ্টে আগামী এগারো বছরে। বাড়ির আসবাবও কেনা হয়েছে ইন্সটলমেণ্টে। টাকা পরিশোধে কোনও গড়িমসি বা অনিয়ম নেই। মেয়েটা টাইপিস্টের কাজ করে একটা রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে, ফিলিপ শেফার্স ট্রান্স-আটলাণ্টিক এয়ারলাইন্সের রিজার্ভেশন ক্লার্ক।'

'এদেরই একটা প্লেন কদিন আগে ক্র্যাশ করেছে না?'

'হ্যাঁ। ফিলিপ শেফার্স মারা গেছে ওই প্লেনক্র্যাশে। আর কিছু জানতে চাস, দোস্ত?'

'না রে, তোকে ধন্যবাদ,' খুব ধীরে উচ্চারণ করল রানা শব্দ ক'টা।

চার

লাঞ্চের পর একটানা সন্ধে পর্যন্ত ফাইল দেখে আজকের মত কাজ শেষ করল রানা। মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করছে সেই দুপুর থেকে। সন্ধ্যা নামতে গিলটি মিয়া ও ক্যাভিন হাওয়ার্ডকে নিয়ে বের হলো ও। প্রথমে নিউ ইয়র্ক টাইমসের অফিসে গিয়ে বন্ধুর সাহায্যে পুরনো কাগজ বের করে প্লেনক্র্যাশের নিউজটা মন দিয়ে পড়ল ও আগাগোড়া। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়াদের মধ্যে ফিলিপ শেফার্সের নাম রয়েছে। যাত্রীদের প্রায় সবারই একটা করে পাসপোর্ট সাইজ ছবি ছাপা হয়েছে, তার নীচে বিস্তারিত রিপোর্ট। শেফার্সের ছবির নীচে লিখেছে: এয়ারলাইন্সের কর্মচারী হিসাবে নিখরচায় ফ্লাই

করছিলেন ফিলিপ শেফার্স। প্যারিসে ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসবার সময় জে.এফ.কে ইণ্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে মারা যান তিনি। চেহারা সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তাঁর—শনাক্ত করা গেছে সঙ্গের নাম খোদাই করা লাইটারটা দেখে। ওটা বিমান কোম্পানির তরফ থেকে বড়দিনের উপহার দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

মূল খবরের সঙ্গে আর একটা মর্মস্পর্শী সাইডস্টোরিও তুলে ধরা হয়েছে: তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীরও প্যারিস যাওয়ার কথা ছিল। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন, 'ট্রান্স-আটলাণ্টিক এয়ারলাইন্সে আমার স্বামীর চাকরির পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে তার সঙ্গে প্যারিস থেকে ঘুরে আসার জন্যে আমাকেও ফ্রি টিকেট দেয়া হয়েছিল। আমার কোম্পানী ছুটি মঞ্জুরও করেছিল। কিন্তু আমার ইমিডিয়েট বস্ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সে-ছুটি বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে আমি প্রাণে বেঁচে গেছি বটে, কিন্তু এ-বাঁচা প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন।'

পত্রিকা অফিস থেকেই টেলিফোনে নিউ ইয়র্ক পুলিশের ক্যাপটেন জোসেফ ক্রাউলিকে চাইল রানা। কর্তব্যরত অফিসার জানালেন, ক্রাউলির ডিউটি রাত দশটা থেকে। যদি তাঁর পক্ষে কোনও সাহায্য...

'বেশ, দশটার পরেই ফোন করব,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

পত্রিকা অফিস থেকে বেরিয়েই চলল ওরা কুইন্সভিল রেসিডেনশিয়াল এরিয়ার দিকে। যাওয়ার পথে ক্যাভিনকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কীভাবে ওটা খুলে আনবে বলে ভাবছ?'

'বাইরে থেকে আগে একটা ফোন করব, সার,' বলল তরুণ শিক্ষানবীশ। 'যদি কেউ না ধরে, তা হলে বুঝতে হবে বাড়ি খালি। যন্ত্রটা খুলে আনতে আমার একমিনিটের বেশি লাগবে না, সার।'

'হাঁ, ততক্‌খনে জায়গাটা লিরিবিলি হয়ে যাওয়ার কতা,' বলল গিলটি মিয়া। 'তবে ঢোঁকার আগে তোমার পিও ছ্যাঁকরা গাড়িটা ও-বাড়ির কাচ থেকে সরিয়ে লিলে ভাল হয়,' পরামর্শ দিল সে, 'তারপর নিচ্চিন্ত হবার লেগে হালকা দুটো টোকা দেবে দরজায়, সাড়া না পেলে তবেই গে ঢোঁকা।'

বাঁক ঘুরে পিজিয়ন লেনে ঢুকতে গিয়ে চমকাল রানা। সম্পূর্ণ বদলে গেছে এলাকার পরিবেশ। শেফার্সদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা লরিসহ তিনটে ওয়্যারলেস ফিট করা জিপগাড়ি—রাস্তায় গিজগিজ করছে পুলিশ, এলাকার বেশ কিছু কৌতূহলী লোকও আছে তাদের সঙ্গে। ব্রেক করতে গিয়েও মত পরিবর্তন করল রানা। জটলার পাশ দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে গেল সামনে।

'এইবার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ক্যাভিনকে পরামর্শ দিল গিলটি মিয়া। 'আর কী! আজ আর হোলোনিকো। যাও, কেবিন ভায়া, লিয়ে এসো তোমার গাড়ি। আগে হুডটা তুলে যন্তোপাতি লাড়াচাড়া করবে, তারপর ইস্টাট দেবে। ওই জটলার কাচে গিয়ে জেনে আসবে কী হয়েচে, এত ভিড়-ভাড়াক্কা কীসের। বুজলে?'

আধঘণ্টা পর ফিরে এল ক্যাভিন, একবার হর্ন বাজিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল আরও সামনে। রানার গাড়ি চলল ওর পিছু পিছু। কয়েকটা ব্লক পেরিয়ে তারপর থামল ওরা। নেমে এল ক্যাভিন।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে, সার!' বলল ও। 'রিটা শেফার্স আজ দুপুরে নাকি কোন্ এক হোটেলে গিয়ে খুন করেছে আমাদের স্ট্যানলিকে। একেবারে হাতে-নাতে ধরেছে পুলিশ পিস্তলসহ।'

'আয়-হায়!' বলল গিলটি মিয়া। 'এত দৌড়ঝাঁপ করেও টাকাগুনো দোয়া গেল না ছোঁড়াটার হাতে!'

'স্বীকারোক্তি দিয়েছে মেয়েটা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, সার। শুনলাম, খুনের পর থেকে একটা টুঁ শব্দও করেনি রিটা শেফার্স। গ্রেফতারের পর কোনও উকিলের সাহায্যও চায়নি। একেবারে বোবা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'চলো, অফিসে ফিরি।'

অফিসে পৌঁছে টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে সবাই মিলে ঢুকল রানার কামরায়। টেবিলের উপর ওটা রেখে টেপটা রিওয়াইণ্ড করে নিয়ে চালিয়ে দিল গিলটি মিয়া শুরু থেকে। রিটা শেফার্সের মায়ের কল শোনা গেল প্রথমে। মেয়েকে ধৈর্য ও সাহস না হারিয়ে বর্তমান বিপর্যয় মোকাবিলা করার ব্যাপারে অনেকক্ষণ ধরে নানানভাবে উপদেশ দিলেন মহিলা। তারপর শোনা গেল রবার্ট স্ট্যানলির অধৈর্য কণ্ঠ, 'কী ব্যাপার! দশ মিনিট ধরে চেষ্টা করছি, লাইন পাচ্ছি না। কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

'মা। ওহ্-হো! মাকে তো বলতে ভুলেই গেছি, আগামী কয়েকটা দিন থাকছি না এখানে।'

'পরে ফোন করে জানিয়ে দিলেই হবে। একটা ব্যাগে তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, তবে এখুনি বেরিয়ে পোড়ো না, আমি ফোন করলে তারপর। ক্লিপটনের লেলিয়ে দেয়া ত্যাড়া এক প্রাইভেট আই একটু আগে এসেছিল এখানে, ব্যাটা কী করে জানি খুঁজে বের করে ফেলেছে আমাকে। তাই এই হোটেল ছেড়ে এখনই সরে যেতে হচ্ছে।'

'তোমার খোঁজ বের করল কেমন করে ওরা? ইশ্‌শ্! এসবের মধ্যে না জড়ালেই আমরা ভাল করতাম। ভীষণ ভয় লাগছে আমার, ফিল! এত টেনশন হচ্ছে যে...'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, ডারলিং। কিচ্ছু ভেবো না তো! ভয় পাওয়ার মত কিছুই ঘটেনি এখন পর্যন্ত, ভবিষ্যতেও ঘটবে না। উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই জানিয়ে দিয়ে আমি ভাগিয়ে দিয়েছি ব্যাটাকে। আরেকখানে সরে গিয়েই

তোমাকে ফোন দেব। সাহস হারিয়ো না, নিজেকে শান্ত রাখো, লক্ষ্মী। বড়লোক হয়ে যাচ্ছি আমরা শীঘ্রি।'

এরপরের কলটা কতক্ষণ পর এল তা বোঝা গেল না, কারণ টেলিফোনের কথা শেষ হয়ে যেতেই টেপ রেকর্ডার বন্ধ ছিল। আবার সেই একই লোকের গলা শোনা গেল। বলছে, 'সরে এসেছি, রিটা। ম্যানহাটনের ছোট, অখ্যাত, পুরোনো—তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটা হোটেলে; নাম ডলফিন। দূর থেকেই একটা মাছের ছবি দেখতে পাবে। ডেস্কে বলে রাখব আমি, তুমি সোজা দোতলার একশ' তিন নম্বর কামরায় চলে আসবে। এখানে কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের। ব্যাগ গুছিয়ে তুমি তৈরি তো?'

'হ্যাঁ।'

'গুড! গাড়িটা গ্যারেজেই থাক, একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসো তুমি। এখন বাজে তিনটে। এখনই রওনা হলে পৌঁছে যাবে...'

গুলির শব্দে এক সঙ্গে চমকে উঠল ওরা তিনজন। চাপা আওয়াজ—কিন্তু শব্দটা যে গুলির তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পিস্তলের নলটা সম্ভবত লোকটার পিঠে ঠেকিয়ে টানা হয়েছে ট্রিগার।

'উ-উ-হ্!'

'কী হলো! ফিল! ফিল! কীসের...'

খটাং শব্দে ক্রেডলে রাখল কেউ ফোনের রিসিভার। কেটে গেল কানেকশন। থেমে গেল টেপ।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টেপটা আবার একবার শুনল রানা। ডুবে গেল গভীর চিন্তায়। ওকে চিন্তামগ্ন দেখে আলগোছে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল গিলটি মিয়া তার সাগরেদকে নিয়ে।

ঠিক দশটায় ফোন করে নিউ ইয়র্ক পুলিশের ক্যাপটেন জোসেফ ক্রাউলিকে সিটেই পেল রানা। বহুদিনের পরিচয়, রানার গলা পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন ক্রাউলি; থমকে গেলেন ওর প্রশ্ন শুনে। জানতে চাইলেন, 'কোন্ খুনটা মিস্টার

রানা? ডলফিন হোটেলের সেই রবার্ট স্ট্যানলি?'

'হ্যাঁ। মৃত্যুর সঠিক সময়টা আমার জানা দরকার।'

'ঠিক আছে, জেনে নিয়ে জানাচ্ছি। আপনি অফিসে না বাসায়?'

'অফিসে।'

'ঠিক আছে, জানাচ্ছি... ভাল কথা, এই কেসে কার ব্যাপারে আপনি ইন্টারেস্টেড?'

'প্রথমত, রিটা শেফার্সের ব্যাপারে।'

'খুনি মেয়েটাকে ডিফেণ্ড করবেন নাকি?'

'চেষ্টা করব।'

'কী বললেন? আপনি একটা খুনির হয়ে...'

'খুনটা ও করেনি, ক্যাপটেন,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'অ্যাঁ?' মনে হলো খাবি খেলেন ক্যাপটেন ক্রাউলি। 'বলেন কী, মিস্টার রানা? হাতে-নাতে ধরা হয়েছে ওকে! আপনি প্রমাণ করতে পারবেন যে, কাজটা ওর নয়?'

'পারব। তবে প্রমাণটা নিশ্ছিদ্র করতে হলে আপনার সাহায্য লাগবে। আসলেই মেয়েটি নিরপরাধ।'

থমকে গেলেন অফিসার। চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। রানার মন্তব্য ঘাবড়ে দিয়েছে তাঁকে। তা হলে কি ভুল মানুষকে ধরে এনেছেন?

'সত্যিই যদি নিরপরাধ হয়,' বললেন ক্যাপটেন, 'একশোবার সাহায্য করব আমি। আর আসল খুনি যদি ধরা পড়ে, তা হলে তো সোনায় সোহাগা! আমি কি চলে আসব আপনার অফিসে?'

'আমিই আসছি আপনার কাছে। ইতিমধ্যে মৃত্যুর সঠিক সময়, আর আজ বিকেলে ওই হোটেলে ঠিক কী কী ঘটেছে জেনে নিয়ে তৈরি হয়ে থাকুন। বলা যায় না, আসল খুনি ধরা পড়তেও পারে! ইন দ্যাট কেস, দ্য হোল ক্রেডিট গোজ টু ইউ। ঠিক আছে?'

'হানড্রেড পার্সেন্ট!' বললেন উল্লসিত ক্যাপটেন। 'তা হলে চলে আসুন। রাখলাম।'

পাঁচ

রাত দুটো দশে ফোন করল রানা লইয়ার অ্যাডাম ক্লিপটনের বাড়ির নম্বরে। রানার গলা শুনেই মহা খাপ্পা হয়ে উঠল আইনজীবী, 'কী ব্যাপার, মিস্টার মাসুদ রানা, রাত কয়টা বাজে এখন—আপনার কি সময়জ্ঞান বলতে...'

'দুটো বেজে এগারো,' বলল রানা। 'আপনার সঙ্গে এখনই একবার দেখা হওয়া দরকার আমার। আশাকরি রবার্ট স্ট্যানারের মৃত্যুর খবরটা জানা আছে আপনার?'

'পুলিশ জানিয়েছে আমাকে। ওর লাশের পকেটে আমার লেখা চিঠি পাওয়া গেছিল। কিন্তু, রানা, এই রাতে আপনি...'

'ক্লিপটন, আধঘণ্টা পর আপনাকে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নেব আমি। তৈরি থাকবেন!' বলেই লাইন কেটে দিল রানা।

ঠিক আধঘণ্টা পর গেটের সামনে এসে দাঁড়াল রানার গাড়ি। বড়সড় একটা লনের ওপাশে আঁধার হয়ে আছে উকিলের বাড়িটা। গেটের পাশে একটা পিলারের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছিল ক্লিপটন, রানা থামতেই লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল। মাথায় বড়সড় একটা টুপি পরেছে, গায়ে গাঢ় রঙের দামি সুট, হাতে নরম পিগস্কিনের পাতলা গ্লাভস। টুপি আর গ্লাভস দেখে কিছুটা স্বস্তি বোধ করল রানা। পাশের সিটে উঠে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল লইয়ার, 'আমার সঙ্গে কী ব্যাপারে...'

'বলছি, মিস্টার ক্লিপটন। চলতে চলতে।'

'কেউ ঠেকালো না আপনাকে, রানা?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল লইয়ার। 'এই যে রাত-বিরেতে মানুষকে ডিসটার্ব করে বেড়াচ্ছেন, একথা আর কেউ জানে না?'

'এত রাতে কোথায় পাব জানাবার লোক? তা ছাড়া জানাতে যাবই বা কেন?' বলে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। ভাবছে, কখন জানি রেগে গিয়ে মেরে বসে লোকটা!

শহরতলির শেষ প্রান্তে পৌঁছে বাঁক নিয়ে একটা খোয়া বিছানো, সরু, নির্জন রাস্তায় ঢুকল রানার গাড়ি। কিছুদূর গিয়ে থেমে দাঁড়াল ঝোপঝাড়ের পাশে।

'থামছেন যে?' জানতে চাইল ক্লিপটন। 'রাস্তার মাঝখানে থেমে দাঁড়াচ্ছেন কেন?'

আড়চোখে রানা দেখল, গ্লাভ পরা হাত দুটো কোলের উপর রাখা। একটু যেন বেশি শান্ত লাগছে লইয়ারকে। রানা ভাবল, ওর যদি কোথাও কোনও ভুল হয়ে থাকে, তা হলে বেইজ্জতির সীমা-পরিসীমা থাকবে না। 'কথাটা এখানেই বলতে চাই,' বলল ও। 'আপনি আমাদেরকে আপনার একজন মক্কেলকে খুঁজে দেবার কাজ দিয়েছিলেন। লোকটাকে হারিয়ে ফেলেছিলেন আপনি। আমরা আপনার সে-কাজটা করে দিয়েছি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ব্যাপারটা গড়িয়েছে গিয়ে খুনে। খুন হয়ে গেছে লোকটা!'

'এই কথা বলতে এত রাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন, রানা? স্ট্যানলির সঙ্গে কোথাকার কোন্ মিসেস শেফার্সের গোপন প্রেম ছিল কি ছিল না, কেন সে স্ট্যানলিকে খুন করল; এসবের সঙ্গে আমার বা আপনার কী সম্পর্ক?'

'আপনার কথা বলতে পারব না, ক্লিপটন, কিন্তু আমার সম্পর্ক আছে। আপনিই জড়িয়েছেন আমাকে। আমি আপনাকে বলেছি, কাজটা আমাদের লাইনে পড়ে না, আর কাউকে দিন—আপনি জোর করে চাপিয়েছেন ওটা রানা এজেন্সির ঘাড়ে; কেন তা

আপনিই বলতে পারবেন। তখন জানতাম না, এভাবে খুন হয়ে যাবে আমাদের টার্গেট।'

'আপনার বক্তব্য আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না, রানা। মনে হচ্ছে, মেয়েলোকটার হাতে স্ট্যানলির খুন হয়ে যাওয়াটা, আপনার ধারণা, আমি ঠেকাতে পারতাম!'

'ক্লিপটন, ও এই খুনটা করেনি। ওর টেলিফোনে আমরা আড়ি পাতা যন্ত্র ফিট করেছিলাম। গতকাল সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রিটা শেফার্স-এর ফোনে যে যা বলেছে, সব রেকর্ড করা আছে আমাদের টেপে। পেছনের সিটেই রাখা আছে রেকর্ডারটা, আপনি চাইলে আমি বাজিয়ে শোনাতে পারি। পুলিশের মেডিকেল এগজামিনার স্ট্যানলির মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করেছেন: দুপুর তিনটে থেকে তিনটে দশ। আমার টেপ বলছে তিনটের সময় পিজিয়ন লেনের বাড়ি থেকে টেলিফোনে কথা বলছিল মিসেস শেফার্স স্ট্যানলির সঙ্গে, ঠিক সেই সময়েই গুলির শব্দ হয়। বুঝতে পারছেন? দশ মিনিটের মধ্যে ম্যানহাটনে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে। রিটা শেফার্সের অকাট্য অ্যালেবাই রয়েছে আমার টেপে।' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল রানা। লক্ষ করল উকিলের হাত দুটো এখনও কোলের উপর রাখা। 'আমার ধারণা, গুলিটা করে আপনি ডলফিন হোটেলের ওই কামরাতেই ওঁৎ পেতে অপেক্ষায় ছিলেন মেয়েটির জন্যে—জানতেন ও আসছে। মেয়েটি যখন পাগলের মত কামরায় ঢুকল, আপনি মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে পিস্তলটা ধরিয়ে দিলেন ওর হাতে। তারপর নিশ্চিন্তে বেরিয়ে গিয়ে পুলিশকে খবর দিলেন, একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেছে ডলফিন হোটেলের দোতলা থেকে। পুলিশও গিয়ে হাতে-নাতে ধরল ওকে। আপনার খুনের দায় চাপল রিটার কাঁধে।' হাসল রানা, 'এবার কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে, জনাব?'

শান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে লইয়ার। তার মনের ভিতর কী চলছে, সে-ই বলতে পারবে। পাশ ফিরে চেয়ে রয়েছে রানার

মুখের দিকে। হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে রানার আসল উদ্দেশ্যটা কী। আড়চোখে আর একবার ওর হাতের দিকে তাকাল রানা—অলস ভঙ্গিতে ও দুটো কোলের উপর রাখা।

'উদ্ভট এক গল্প ফেঁদেছেন, মাসুদ রানা,' বলল সে কিছুক্ষণ পর। 'আপনার ইচ্ছেটা কী? কোনও ধরনের ব্ল্যাকমেইল?'

'আমি কি আপনার কাছে টাকা-পয়সা কিছু চেয়েছি, ক্লিপটন?' মাথা নাড়ল রানা। 'আপনি জানেন, আমরা সবসময় ন্যায়ের পক্ষে কাজ করতে চেষ্টা করি। কোনও বদমাইশ অনর্থক কাউকে খুন করে সে-খুনের দায় অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেবে নিরীহ একটা মেয়ের ওপর, আর আমরা চুপচাপ সেটা চেয়ে চেয়ে দেখব—বাংলাদেশের মানুষ আমরা অতটা হৃদয়হীন, পাষণ্ড নই, ক্লিপটন। আমরা আপনাকে সাবধান করিনি একথা বলতে পারবেন না। তারপরেও কাজটা আপনি আমাদের ঘাড়ে চাপালেন। আপনার জানা উচিত ছিল, মক্কেল সম্পর্কে খোঁজ নেয়াও আমাদের কাজের মধ্যে পড়ে। যখন জানলাম, আপনি দেউলিয়া হওয়ার পথে, শেয়ার ব্যবসায় মার খেয়ে আর্থার হেনরির ফাণ্ড থেকে কয়েক দফায় মোটা অঙ্কের টাকা তুলে ফেঁসে গেছেন, তখন ভাল করে নজর দিতেই হলো। উত্তরাধিকারীরা টাকার জন্যে চাপ দিচ্ছে, দেবেই, টাকাটা ওদের। স্ট্যানলিকে পাওয়া যাচ্ছে না, একথা বলে বহুদিন ওদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন এই ভেবে যে, আপনার কাকা মারা গেলে তার টাকা দিয়ে ফাণ্ড পূরণ করে দেবেন। কিন্তু কাকা আর মরে না। তারপর ওরা যখন নিজেরাই স্ট্যানলির খোঁজ বের করে দিল, তখন তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বাধ্য হলেন আপনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও। কিন্তু প্লেনটা ক্র্যাশ করল। ভাবলেন, বাঁচা গেল বুঝি; কিন্তু না, জানা গেল জীবিত তিনজনের মধ্যে রবার্ট স্ট্যানলিও একজন। ওকে গায়েব করে দিয়ে বা খুন করে বাঁটোয়ারা পিছিয়ে দেওয়ার প্ল্যান ছিল আপনার আগে থেকেই। কিংবা হয়তো ভেবেছিলেন, ওর

সঙ্গে একটা সমঝোতায় এসে ওকে দিয়ে কেস করাবেন আরও বেশি টাকার জন্যে—ফলে বাঁটোয়ারা পিছিয়ে যাবে আরও। মোট কথা, আপনার কাকার মৃত্যু পর্যন্ত যেমন করে হোক ঠেকিয়ে রাখতে হবে ভাগাভাগিটা। কিন্তু স্ট্যানলি হাসপাতাল থেকে গায়েব হয়ে যাওয়ায় চিন্তায় পড়ে গেলেন আপনি, ভাবলেন কবে না জানি হাজির হয়ে যায় ছোকরা টাকার জন্যে। আরও ভয়, কবে না জানি ও যোগাযোগ করে বসে অন্যান্য ভাগীদারদের সঙ্গে! কাজে কাজেই আমাদের সাহায্য আপনার দরকার হয়ে পড়ল।'

'রানা, মিথ্যে ভ্যাজর-ভ্যাজর করছ!' সম্বোধনটা তুমিতে নেমে আসায় মনে মনে খুশি হলো রানা। ক্লিপটনের কঠোর মুখ ঘামে চকচক করছে। 'তোমাকে আমি নিখোঁজ এক লোককে খুঁজে বের করবার কাজ দিয়েছিলাম, তুমি সে কাজ করেছ—এর মধ্যে কোনও অন্যায় বা ঘোরপ্যাঁচ নেই। লোকটা যদি পরবর্তী সময়ে খুন হয়ে যায়, সে-দায় কিছুতেই আমার ওপর বর্তায় না!'

রানা ভাবছে, এখনও পিস্তল বের করছে না কেন লোকটা! বলল, 'এই মৃত্যু বণ্টনের কাজটা দেরি করিয়ে দেবে না বলতে চান? যেটুকু সময় পাওয়া যাবে তার মধ্যে যদি আপনার কাকা মারা না যায়, তাকে মারাও তো আপনার জন্যে কঠিন কোনও কাজ হবে না। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছেন, যেন আপনার কাকা মারা যায়, কিন্তু আসল কথাটাই তো আপনার জানা নেই—ওই লোকটা রবার্ট স্ট্যানলি ছিল না।'

বজ্রপাতের পরমুহূর্তের স্তব্ধতা। আত্মা চমকে গেছে অ্যাডাম ক্লিপটনের।

'তোমার এই গাঁজাখুরি গপ্পো শোনার ধৈর্য আর আমার নেই, রানা। আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে...'

'প্লেন ক্র্যাশেই মারা গিয়েছিল আসলে রবার্ট স্ট্যানলি।' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল রানা। 'ফিলিপ শেফার্সও ছিল একই প্লেনে—বেঁচে যাওয়াদের একজন। স্ট্যানলি মনে করে

আপনি এই ফিলিপ শেফার্সকে খুন করেছেন, ক্লিপটন। দুর্ঘটনায় একটুও জখম হয়নি শেফার্স, বরং ঝাঁকি খেয়ে বুদ্ধি খুলে গিয়েছিল ওর। ইনশিওরেন্সের মোটা টাকার জন্যে মাথায় খেলে গিয়েছিল পরিচয় বদলের আইডিয়াটা। স্ট্যানলির জ্বলন্ত মৃতদেহের পাশে পড়ে থাকা ওয়ালেটটা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের লাইটার ছুঁড়ে দিয়েছিল ওর লাশের গায়ে। স্ট্যানলি হিসেবে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার একঘণ্টার মধ্যে ফোন পেয়ে ওর স্ত্রী রিটা শেফার্স এসে ওকে নিয়ে যায়। ফিলিপ শেফার্সের মতলবটা বোঝা কঠিন কিছু নয়: ইনশিওরেন্সের টাকা ছাড়াও ওর বউ ট্রান্স-আটলান্টিক এয়ারলাইন্স থেকে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ তুলবে, তারপর দুজন মিলে দেশান্তরি হবে। আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাওয়ায় কোন্‌টা কার লাশ চেনার কোনও উপায় ছিল না। সেই অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়েই...'

'এটা তোমার আরেক ধাপ্পাবাজি!' বলে উঠল ক্লিপটন। ওর চোখ দুটোকে নীল মার্বেলের মত লাগছে এখন দেখতে। সাপের মত ঠাণ্ডা দৃষ্টি সে-চোখে।

'আপনার ওই তিরিশ হাজার ডলারের লোভ যে ফিলিপকে বেশ কিছুটা দুলিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। স্ট্যানলির ওয়ালেটে আপনার চিঠি পেয়ে ওই টাকার ব্যাপারে জেনেছিল সে। কিন্তু সামনে আসতে ভয় পেয়েছে বেচারা, ভেবেছে, হয়তো আপনার বা স্ট্যানলির পরিবারের কারও কাছে ধরা পড়ে যাবে যে ও আসল লোক নয়। ও তো জানত না, আপনি বা স্ট্যানলির ভাগীদারদের কারও জানা নেই ও দেখতে কেমন। ডিয়ার অ্যাডাম ক্লিপটন, আর সব অ্যামেচারদের মতই নিরেট গাধামি করেছেন আপনি। মিসেস শেফার্স ছাড়া একমাত্র আপনিই জানতেন কোথায় লুকিয়ে আছে স্ট্যানলি, ওরফে ফিলিপ শেফার্স। গতকাল দুপুরে আপনাকে যখন আমি টেলিফোনে জানালাম, পোর্টল্যাণ্ড হোটেলের ২৩২ নম্বর কামরায় পল ব্রেনান নাম নিয়ে আছে রবার্ট

স্ট্যানলি, ছুটলেন আপনি সেখানে। কিন্তু পৌঁছেই জানতে পারলেন, হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছে স্ট্যানলি। ওর পিছু নিয়ে আপনিও চলে গেলেন ম্যানহাটনের ডলফিন হোটেলে। তারপর আড়াল থেকে যখন শুনলেন রিটা শেফার্স নামে একটা মেয়েকে ডাকছে স্ট্যানলি ওই হোটেলে, তখনই মাথায় ঝিলিক দিল শয়তানি বুদ্ধি। ওর পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করলেন আপনি, তারপর ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করলেন রিটার জন্যে।'

দরদর করে ঘামছে এখন অ্যাডাম ক্লিপটন। মাথা থেকে টুপিটা সরাল। বোঝা গেল, ওখানেই ছিল ওর দুই শটের ডেরিঞ্জার পিস্তলটা। রানার বুক বরাবর তাক করে ধরল সে ওটা। 'তোমার এই বেপরোয়া দুঃসাহসের প্রশংসা করতে পারছি না, মাসুদ রানা। গাধামি আমি নই, তুমিই করেছ এই নির্জন জায়গায় আমাকে নিয়ে এসে। কষ্ট করে সত্যটা আবিষ্কার করেছ বটে, কিন্তু তাতে লাভ হলো না কিছুই। বুঝতেই পারছ, এত কথা বলে নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে এনেছ তুমি। বাধ্য হয়েই তোমাকে এখন খুন করতে হচ্ছে আমার!'

'আরে, করেন কী, করেন কী!' আর্তনাদ করে উঠল রানা। 'দেখুন, স্টিয়ারিং ধরে আছি আমি দুই হাতে। ভয় পেয়ে তাড়াহুড়োয় কিছু না করে আমার কথাটা শেষ করতে দিন। তার আগে গ্লাভ কম্পার্টমেন্টটা খুলে ট্র্যান্সমিটারটা একনজর দেখে নিন। এতক্ষণ আমাদের যা কথা হয়েছে সব শুনেছেন ক্যাপটেন জোসেফ ক্রাউলি, সেইসাথে সবকিছু রেকর্ডও হয়ে গেছে পুলিশের টেপ রেকর্ডারে। আমাদের সব কথা ব্রডকাস্ট করেছি আমি, ক্লিপটন! খুলেই দেখুন সামনের গ্লাভ কম্পার্টমেন্টটা।'

ঠাণ্ডা, নীল দৃষ্টি রানার চোখের উপর স্থির রেখে কম্পার্টমেন্টটা খুলল ক্লিপটন, দস্তানা পরা বামহাত বাড়িয়ে বের করে আনল ট্র্যান্সমিটারটা। ধারা বিবরণীর মত বলে চলেছে রানা, 'খুবই

শক্তিশালী জিনিস, রেঞ্জ দু'হাজার গজেরও বেশি, পুলিশের...'

'এসব চালবাজি তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, রানা। এটা ট্র্যান্সমিটার না কচু! ট্র্যান্সমিটার আমি চিনি না মনে করেছ? এর অ্যান্টেনা কোথায়? টিউব কোথায়? মাইক্রোফোন কোথায়? ধোঁকা দেয়ার...'

'নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে আপনার...'

দপ্ করে চারপাশ থেকে একই সঙ্গে জ্বলে উঠল অনেকগুলো ফ্ল্যাশলাইট। বিশালদেহী ক্যাপটেনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে গিলটি মিয়া ও তার স্যাঙাৎ ক্যাভিন হাওয়ার্ড। প্রচণ্ড এক হাঁক ছাড়লেন ক্যাপটেন, 'ঘিরে ফেলেছি আমরা তোমাকে, ক্লিপটন! ড্রপ দ্য গান!'

চারপাশের ঝোপ-ঝাড় থেকে সাব-মেশিনগান হাতে বেরিয়ে এল আট-দশজন কমব্যাট পুলিশ। আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেছে অ্যাডাম ক্লিপটনের চেহারা। হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে উঠে ঠেসে ধরল ডেরিঞ্জারটা রানার পাঁজরে। 'বেরোও, রানা! বেরোও গাড়ি থেকে! তোমাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করব আমি!'

ক্লিপটনের কব্জি চেপে ধরল রানা। ধস্তাধস্তি চলছে, এমনি সময়ে গিলটি মিয়ার মার্বেল-পিস্তল থেকে ছুটে এল একটা অব্যর্থ গোলা। মার্বেলটা ঠকাস করে ক্লিপটনের টাকে লেগে পিছলে বেরিয়ে গেল জানালা দিয়ে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল খুনি লইয়ার। টান দিয়ে দু'পাশের দরজা খুলে ফেলল দু'জন আর্মড পুলিশ।

'আমি শেষ!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ক্লিপটন। 'কিন্তু তোমাকেও ছাড়ছি না, রানা!' বলেই টিপে দিল সে ট্রিগার। ছোট মরিচের ঝাল বেশি—প্রচণ্ড আওয়াজ হলো গুলির। এটাও রেকর্ড হয়ে গেল টেপ রেকর্ডারে।

এতক্ষণে হাসি ফুটল রানার মুখে। বলল, 'এবার সত্যিই মরলেন, মিস্টার ক্লিপটন। আপনাকে আর বাঁচাবার সাধ্য নেই

কারও।'

গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে গাড়ির পাশে চলে এল গিলটি মিয়া। হতচকিত, নিষ্পাপ দৃষ্টি রাখল রানার মুখে, 'আপনা-আপনাকে লেগেচে, সার?'

'হ্যাঁ, বেশ জোরে ধাক্কা লেগেছে।'

কোটের ল্যাপেল তুলে নীচে পরা বুলেটপ্রুফ ভেস্টটা দেখিয়ে দিল রানা।

রানা-সোহানা

এক

রানা হাত বাড়ানোর আগেই ছোঁ মেরে প্লেটের উপর থেকে বিলটা তুলে নিলেন আদনান মুস্তফি। 'খবরদার! কারও কোনও জোরাজুরি শুনতে চাই না। এ-বিল আমি দেব।'

'কিন্তু...'

'আবার কিন্তু!' কটমট করে সোহানার দিকে চাইলেন প্রফেসর। 'কী মনে করো তোমরা আমাদের? একেবারে খালি হাতে বেড়াতে বেরিয়েছি? জেসিকা, তোমার ব্যাগটা দাও তো এদিকে!'

হাসিমুখে হ্যাণ্ডব্যাগটা বাড়িয়ে দিল জেসিকা। 'হ্যাঁ, রোজ রোজ খাওয়ালে তো চলবে না, ভাই। আমাদেরও সুযোগ দিতে হবে। ওদের চেহারার বর্তমান অবস্থা কী, আদনান?'

'গুণ্ডাটার মুখ ছাইবর্ণ, শুকনো ঠোঁট চাটছে; আর সোহানা ছুঁড়ির চেহারা হয়েছে বাংলার ৫-এর মত। ওহ্-হো, ডার্লিং, তুমি তো ৫ কী রকম তা জানো না। আঙুলটা দাও, আমি এঁকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

জেসিকার তর্জনী দু'আঙুলে ধরে বোলেদর রেস্তোরাঁর ডাইনিং টেবিলের উপর ৫ এঁকে দেখালেন প্রফেসর মুস্তফি। হেসে উঠল জেসিকা মুস্তফি। স্প্যানিশ মেয়ে ও, শৈশব থেকে অন্ধ। 'যাহ্! বাজে কথা। সোহানার অত সুন্দর চেহারা এরকম হতেই পারে না।'

'আমার চেহারার বর্ণনা দিতে হবে না!' রাগ-রাগ ভাব করে চোখ রাঙালো সোহানা, 'এই এক ডিনারে তোমাদের অনেক টাকা

বেরিয়ে যাবে, আদনান ভাই, সে-খেয়াল আছে?'

'তোমাকে সে-সব ভাবতে হবে না, বাছা,' বললেন অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সের আত্মভোলা প্রফেসর। রানার থেকে বছর আষ্টেকের বড়, সোহানার দূর সম্পর্কে ভাই হন। 'আমার আরও অনেক রোজগার আছে, তা জানো?'

জানে ওরা, কিন্তু কেউ মুখ খুলল না।

'তা ছাড়া এবার তো আমি রাজা! আমার ওই চুট্টিন বউ কী করেছে শোননি? আমাকে কিচ্ছু না বলে কোথায় জানি লুকিয়ে বেশ কিছু ডলার পাচার করে এনেছে লণ্ডন থেকে। প্লেনে ওঠার পর আমাকে জিজ্ঞেস করে: কিছু হবে?'

'জবাবে ও কী বলেছিল, সেটাও শুনে রাখো,' বলল জেসিকা। 'যদি ধরা পড়ি, ও নাকি কসম খেয়ে বলবে, চেনা তো দূরের কথা, জীবনে কোনদিন দেখেইনি আমাকে। একেই তো বলে ভীতুর ডিম, তাই না?'

'বিচক্ষণ, বুঝলে,' সংশোধন করলেন পণ্ডিত, 'বিচক্ষণের ডিম।'

দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের অনতিব অন্তরীপে রানা-সোহানার সঙ্গে এক সপ্তাহের জন্য বেড়াতে এসেছেন আদন্যান মুস্তফি ও তাঁর স্ত্রী, রানার চাপাচাপিতে উঠেছেন ওর ভাড়া করা ভিলার একাংশে।

বিল চুকিয়ে দিয়ে চোখ তুলেই ভুরু কুঁচকে ফেললেন প্রফেসর।

'আরে! ওই দেখো, তোমাদের সেই উন্মাদ প্লেবয়টা এইদিকেই আসছে।'

উত্তেজনায় সারাক্ষণ যেন টগবগ করে ফুটছে রিচি হাওয়ার্ড; বারের দিকে যাচ্ছিল, ওদের দেখে সামান্য দিক পরিবর্তন করে প্রায় লাফাতে লাফাতে ছুটে এলো। বছর তিনেক হলো একে দেখা যাচ্ছে ভূমধ্যসাগরের তীর-ঘেঁষা বন্দরগুলোতে। হ্যাণ্ডসাম, সুবেশী, সুভাষী এবং ধনী—বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। সুন্দর একটা ইয়টের মালিক। এইসব বন্দর নগরীর স্থানীয় অভিজাতদের সঙ্গে তো বটেই, নিয়মিত বেড়াতে আসা প্রায় সবার সঙ্গেই সখ্যতার সম্পর্ক

গড়ে নিয়েছে জনপ্রিয়, রসিক যুবক; বিশেষ করে মহিলাদের হৃদয়ের অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে একের পর এক বিলাসবহুল পার্টি দিয়ে। পাঁচ-ছয়টি-ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, কোন্‌টা যে তার মাতৃভাষা বোঝা মুশকিল।

সব সময় রিচির সঙ্গে দেখা যায় লুকাস ম্যাকপিলকে। বেঁটে-খাটো, মোটা এই লোকের সঙ্গে চেহারা বা চালচলনে কোনও মিল নেই প্লেবয়ের। বয়স কম-বেশি চল্লিশ, কিন্তু এই বয়সেই গোটা মাথায় একটা চুলও নেই ওর—একেবারে ফর্সা। কথা কম বলে, ভাবলেশহীন চেহারায় হাসির কথাতেও হাসি ফোটে না। হাসিখুশি এক প্লেবয়ের সঙ্গে সারাক্ষণ এই লোক কেন, বোঝা যায় না। আচার-ব্যবহারে লোকটাকে রিচির কর্মচারী বা বডিগার্ড বলেও মনে হয় না। আবার বন্ধু বলাও যাবে না।

অবাক চোখে লোক দুজনকে দেখছেন প্রফেসর। দুদিন আগে এদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সোহানার সুবাদে, তবে হ্যালো-হাই পর্যন্তই, তার বেশি কিছু না। রানা-সোহানার মধ্যে উচ্ছ্বাসের অভাব দেখে বুঝে নিয়েছেন, ওরাও খুব ভাল করে চেনে না এদের। তা হলে? এত উল্লাস কীসের? নাকি লোকটাই এমন?

'সোহানা, ডার্লিং!' খপ্ করে সোহানার একটা হাত ধরে ঝুঁকে চুমো দিল রিচি। 'দারুণ একটা আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়! বুঝলে। চলো, আমরা বিয়ে করে ফেলি। আগামীকালই। রীতিমত সবাইকে ডেকে, জাঁক-জমকের সঙ্গে। ওফ্, দুর্দান্ত একটা ব্যাপার হবে! মারলিনের ক্যাপ্টেন হিসেবে ওখানেই সব ব্যবস্থা করব। রানা হবে আমার বেস্ট ম্যান, কনে সম্প্রদান করবেন প্রফেসর, ওঁর সুন্দরী স্ত্রী হবেন ব্রাইড্‌স্‌মেইড। কী মজা! শহরের সেরা প্রিস্টটাকে ধরে আনব। হানিমুন করব আমরা ইয়টে করে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়ে। তুমি কী বলো, সুইটহার্ট?'

'আমি বলি, আর বিশটা বছর অপেক্ষা করো, রিচি, মাই বয়। আগে বিয়ের বয়স হোক তোমার।'

হা-হা করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠল রিচি হাওয়ার্ড।

'এটা হয় না,' গম্ভীর মুখে বাগড়া দিল লুকাস, 'বিবাহিতা কেউ ব্রাইড্‌স্‌মেইড হতে পারেন না। মিসেস মুস্তফির পক্ষে কেবল মেট্রন অভ অনার হওয়া সম্ভব।'

'সত্যিই?' চোখ কপালে তুলল রিচি, 'তা হলে তো সব ভেস্তে গেল দেখছি! ঠিক আছে, কী আর করা! বিয়েটা না হয় না-ই হলো, কাল রাতে আমার পার্টিতে এসো, তোমাদের সবার দাওয়াত। বন্দরের হোমরা-চোমরা সবাইকে ডেকেছি! জমকালো পার্টি হবে কাল। একেবারে ফাটাফাটি! আসবে তো?'

মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'তোমার সেই কোস্টা স্মেরাল্ডার পার্টির মত না তো আবার?'

'আহ্-হা!' কপাল চাপড়াল রিচি। 'সেই ডাকাতি! কুত্তার বাচ্চারা কেড়ে নিল আমাদের সবার সবকিছু!' মাথা নাড়ল এপাশ ওপাশ, 'না। একই ঘরে দ্বিতীয়বার হানা দেয় না ছিনতাইকারীরা। এ রকম রেকর্ড নেই। কাজেই যত খুশি সোনা-দানা, জুয়েলারি, হিরে বসানো কাফলিঙ্ক, চুনি বসানো বোতাম, সোনার চেইন পরে আসতে পারো, কোনও ভয় নেই তোমাদের কারও। কাল ঠিক আটটায়। আসবে তো?'

'পরে জানাচ্ছি তোমাকে,' জবাব দিল সোহানা। 'আর, আমন্ত্রণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।'

এতক্ষণে সোহানার হাত ছেড়ে দিল রিচি। 'লুকাস আর আমি বারে গিয়ে একটা ড্রিঙ্ক নেব। তোমরা এই পর্ব শেষ করে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে খুবই খুশি হবো।' কথা শেষ করে বারের দিকে ফিরল সে।

রওনা হবার আগে রানা ও সোহানার দিকে ঝুঁকল লুকাস। বলল, 'পার্টির ভেন্যুটা জানেন? করোম্যাণ্ডেল, হুঁ। ফার ইস্টের কার্পেট, ড্রেপারি, ধূপ-ধুনো, তৈজস, ঢেউ খেলানো কুঁচি দেয়া পর্দা—ভাবতেই পারবেন না ফ্রান্সে আছেন, হুঁ। ছাদ-খোলা টেরেস

লাউঞ্জ থেকে সাগর দেখা যাবে।' মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করে চলে গেল সে রিচির পিছু নিয়ে।

'ভেন্যু...' নিচু গলায় আপন মনে উচ্চারণ করলেন প্রফেসর। 'কী অদ্ভুত দ্ব্যর্থবোধক, আঠালো একটা শব্দ! যাকগে, এই দুজনকে কিন্তু পাশাপাশি মানাচ্ছে না, হুঁ।'

হেসে উঠল সবাই।

'রিচি হয়তো ওর বাড়াবাড়ি সামাল দেয়ার জন্য এই লোকটাকে সঙ্গে রাখে,' বলল সোহানা।

'কোস্টা স্মেরাল্ডার পার্টিতে কী হয়েছিল?' জানতে চাইল জেসিকা। 'সত্যিই কোনও...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রিচির পার্টি থেকে ছিনতাই হয়ে গিয়েছিল সবার টাকাপয়সা, রত্ন, অলঙ্কার। এই একই দল আলাদা তিন জায়গায় একই ভাবে আরও তিনটে ডাকাতি করেছে এ-বছর। মুখোশ পরে আসে, ছয়-সাতজন, অস্ত্র উঁচিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায় যার যা আছে। আট-দশ লাখ ডলারের অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে স্পিড বোটে করে হারিয়ে যায় সাগরে।'

'বাধা দেয়ার চেষ্টা করেনি কেউ?' বিভ্রান্ত দেখাল জেসিকাকে।

'করেছে। ওর ক্রুদের মধ্য থেকে একজন পালোয়ান কিসিমের লোক পাহারায় ছিল অঘটন ঠেকাবার জন্য। ঢোকার পথেই ডাকাতদের বাধা দিয়েছিল লোকটা। পায়ে গুলি করে তাকে অচল করে দিয়েছিল ওরা। আর কেউ কিছু করার সাহস পায়নি।'

'আমারও সাহস হতো না,' বললেন প্রফেসর। 'সবার আগে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলতাম। যাকগে,' সোহানার দিকে ফিরলেন তিনি, 'যদি রিচি লোকটার পার্টিতে যাওয়া হয়, তা হলে কারা যাবে, কী পরে যাবে সেসব জেসিকাকে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব কিন্তু তোমার। আমি ওসব একদম বুঝি না।'

হাসল সোহানা। বলল, 'ঠিক আছে, আদনান ভাই। রানা?'

'আমি যাওয়ারই পক্ষে,' বলল রানা। 'পার্টি থ্রো করে কেউ যদি

তার আনন্দের ভাগিদার করতে চায়, নেহায়েত অপারগ না হলে যাওয়াটাই শিষ্টতা। প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হবে না।'

'বেশ, তা হলে যাচ্ছি আমরা।'

খালি চেয়ার-টেবিলের উপর একবার নজর বুলিয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করলেন আদনান মুস্তফি। 'সবাই বাড়ি চলে গেছে। টেবিলক্লথ গোটাচ্ছে, আর মস্ত বড় বড় হাই তুলছে বেয়ারাগুলো। ইঙ্গিতটা যথেষ্ট সাউণ্ড অ্যাণ্ড ক্লিয়ার মনে হচ্ছে না?'

'হ্যাঁ,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'এবার কেটে পড়া উচিত। আদনান ভাই, তোমরা দুজন বেরিয়ে কারপার্কের দিকে হাঁটতে থাকো, আমি আর সোহানা বারে গিয়ে ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট করে আসছি।'

'সবাই একসঙ্গে গেলে কী অসুবিধা?' জানতে চাইল জেসিকা।

'তা হলে আটকে দেবে,' বলল রানা। 'বার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বেরোতে পারব না আমরা কেউ। কী রকম নাছোড়বান্দা লোক দেখলে না? আর একটু হলেই সোহানাকে কেড়ে নিচ্ছিল! তোমরা গাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলে ছুতো দেখিয়ে বেরিয়ে আসতে পারব, আটকাতে পারবে না।'

'ও, আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি,' বলে উঠে দাঁড়াল জেসিকা। ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল স্বামীর হাত ধরে রেস্তোরাঁর ব্যাট উইং ঠেলে।

আবহাওয়াটা কেমন ভেজা ভেজা, গরম; তাই সুতির একটা হালকা জ্যাকেট পরেছেন আদনান। বোলেদর-এর একপাশ দিয়ে আবছা আঁধার রাস্তা ধরে স্ত্রীকে নিয়ে চলেছেন পিছনের কার পার্কের দিকে। ভরপেট খেয়ে মৃদুমন্দ বাতাসে ফুরফুরে মেজাজে হাঁটছেন প্রফেসর, জেসিকার মুখের দিকে চেয়ে ওর ভিতরের আনন্দ টের পেলেন পরিষ্কার। পরমুহূর্তে খচ্ করে কাঁটা বিঁধল বুকে। এইবারই শেষ। আর কোনও দিন হয়তো এইভাবে ওকে নিয়ে বেড়াতে বের হওয়া সম্ভব হবে না। জেসিকাও আন্দাজ করেছে, ওদের পুঁজি শেষ হয়ে এসেছে। এরপর অন্ধকারের দিকে চেয়ে কাটবে ওদের নিরানন্দ দিন। আর কখনও জেসিকার মুখটা ঝলমল করে উঠবে না

উচ্ছ্বাসে, আনন্দে। এখন একটু যেন অনুশোচনাই হচ্ছে।

নিজের উপরই রাগ হলো ওঁর এসব ভাবছেন বলে। আত্মগ্লানি, আক্ষেপ ওঁকে অন্তত সাজে না—বেহিসাবি খরচ করেছেন তিনি ঠিক, কিন্তু সেটা ভালবাসার জন্য, অন্তরের তাগিদে। জেসিকা যদি ওঁর মনের অবস্থা টের পেয়ে যায়, সব আনন্দ মাটি হয়ে যাবে বেচারির। ওকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কেমন লাগছে, ডার্লিং? ভালো?'

'খুব ভালো,' মাথা ঝাঁকাল জেসিকা। 'রানা-সোহানাকে আমার সব সময়েই ভাল লাগে। মনে হয়, মানুষকে আপন করে নিতে জানে ওরা—নিঃস্বার্থ ভাবে। ওদেরকে মনে হয় আত্মার আত্মীয়। তাই না?'

'সত্যি,' বললেন অ্যাবসেণ্ট মাইণ্ডেড প্রফেসর, 'এরকম মানুষ হয় না। দুজন মিলেছে যেন সোনায় সোহাগা।'

'হ্যাঁ, আমাদের দুঃসময়ে যেভাবে ওরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, অথচ একবিন্দু করুণা বিতরণ করেনি...' থেমে গেল জেসিকা, কারণ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছেন আদনান, সারা শরীর শক্ত হয়ে গেছে।

'খোদা!' নিচুকণ্ঠে বলে উঠলেন আদনান, 'কী হচ্ছে ওখানে! ওদের থামাতে হবে। জেসিকা, তুমি রানাকে খবর দাও, জলদি!' কথাটা বলতে বলতে ওকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তিনি, ওর পিঠে মৃদু ঠেলা দিয়ে বললেন, 'যাও... আমি দেখি...'

একটি কথাও না বলে দৌড় দিল জেসিকা, সামনে বাড়িয়ে রেখেছে হাত দুটো। শিস দেয়ার ভঙ্গিতে ঠোঁট গোল করে হালকা এক ধরনের শব্দ করছে, শোনা যায় কি যায় না। সামনে কেউ বা কিছু থাকলে শব্দটা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে, ধরা পড়বে ওর কানে। এছাড়াও যে-পথ ধরে এদিকে এসেছে, তার একটা সূক্ষ্ম ছাপ রয়ে গেছে ওর অনুভূতিতে, রেস্তোরাঁর দরজায় পৌঁছাতে পারবে অনায়াসে। ভিতরের ভয় চেপে রেখে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে জেসিকা, টের পেয়েছে খুব খারাপ কিছু ঘটছে পার্কিং লটে। না-জানি এখন কী

করছে আদনান!

দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে, রানার কনভার্টিবলের পাশেরটা খুব সম্ভব রিচি হাওয়ার্ডের। ওটার পাশেই একজন লোককে ধড়াস করে মাটিতে পড়তে দেখেছেন প্রফেসর। দেয়ালের গায়ে লাগানো একটা বাতির আলোয় টাকটা ঝিলিক দিয়ে ওঠায় তাঁর মনে হয়েছে লোকটা লুকাস ম্যাকপিল হতে পারে। কয়েক পা এগিয়েই টের পেলেন, আক্রমণকারী আসলে দুজন। হালকা পাতলা লোকটা তামাশা দেখছে, আর তাগড়া লোকটা লাথির পর লাথি চালাচ্ছে মাটিতে পড়ে যাওয়া লোকটার গায়ে যত্রতত্র। মেরেই চলেছে।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন প্রফেসর। মারপিটের কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাই সবসময় চরম কিছুই ভেসে ওঠে কল্পনায়। চামড়া ফুঁড়ে শরীরে ছোরা ঢুকছে, কিংবা বুলেট ছুটে এসে হাড়ের গায়ে দড়াম করে হাতুড়ি পিটছে ভাবলেই তলপেট খামচে ধরে প্রচণ্ড ভয়। ভয় লাগছে তাঁর। কিন্তু পরিচিত একজন পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে দেখলে না এগিয়ে পারা যায় না—দৌড় দিলেন তিনি গাড়ির দিকে।

শেষ কয়েক গজ প্রায় উড়ে গেলেন আদনান। দাঁড়ানো লোকটা দেখতে পেয়ে সাবধান করল সঙ্গীকে, কিন্তু ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন তিনি। হ্যাঁ, লুকাসই। রক্ত দেখতে পেলেন তিনি ওর নাকে-মুখে, শার্টে, কলারে। আরেক লাথি তুলেছিল তাগড়া জওয়ান লোকটা ধরাশায়ী লুকাসের উদ্দেশে, দড়াম করে একটা লাথি হাঁকালেন তিনি ওর তলপেট লক্ষ্য করে।

বেকায়দা লাথি খেয়ে কেঁউ করে উঠল লোকটা, মাথা নিচু করে টলমলো পায়ে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করছে। মাথাটা সহজ টার্গেট, কিন্তু রানার একটা কথা মনে পড়ল: প্রতিপক্ষের মাথায় ঘুসি মেরো না, হাড়ের সঙ্গে হাড়ের সংঘর্ষে বেশি ব্যথা পাবে তুমিই। ওসব কেবল টিভিতেই মানায়।

এক পা এগিয়ে জুডো চপ্ মেরে দিলেন তিনি লোকটার ঘাড়ের পাশে, তারপর বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন ফলাফলটা। দুই

কদম পিছিয়ে পড়ে গেল সে, পতন ঠেকালো দুই হাতের তালু আর দুই পায়ের হাঁটু দিয়ে। আরেক লাথিতে স্রেফ শুয়ে পড়ল সে জ্ঞানহারা লুকাসের পাশে।

এইবার চোখ গেল তাঁর দ্বিতীয় দুর্বৃত্তের দিকে। এগিয়ে আসছে লোকটা, কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ সামান্য ভাঁজ করে রেখেছে। আলো লেগে ঝিক্ করে উঠল ওর হাতে ধরা ছোরার ফলা। এবার ভয় নয়, নিখাদ আতঙ্কে জমে গেল প্রফেসরের কলজেটা। চমকে উঠেছে পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো। দরদর করে ঘাম বেরিয়ে কুল কুল করে নামছে তাঁর বুক-পিঠ বেয়ে। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন: তীক্ষ্ণধার ছোরাটা ভ্যাঁচ করে ঢুকে পড়েছে পাঁজরের ফাঁক গলে, এখন কচ্-কচ্ করে কাটছে তাঁর লিভার, ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড। পা দুটো উসখুস করছে দৌড় দেবার জন্য।

রানার আরেকটা মন্তব্য মনে এল: চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে বা পালাবার চেষ্টা করলে ঘায়েল হয়ে যাবে প্রতিপক্ষের হাতে। কিন্তু পারো না পারো, যদি একটু প্রতিরোধের ভঙ্গি নাও, তা হলে বলা যায় না, সে-ই হয়তো পিছিয়ে যাবে, কিংবা পালাবার চেষ্টা...

ডান হাত ঢুকে গেল জ্যাকেটের ভিতর, সড়াৎ করে সরু একটা শক্ত জিনিস বের করে আনলেন তিনি বুকের কাছ থেকে। মুঠোর ভিতর তীক্ষ্ণধার স্টিলেটোর মত কিছু একটা দেখতে পেয়ে থমকে গেল আক্রমণকারী। তাঁকে পা দুটো সামান্য ভাঁজ করে একটু ঝুঁকে ওস্তাদ নাইফ-ফাইটারের ভঙ্গি নিতে দেখে কেটে পড়বে কি না ভাবল সে একবার।

এসব ভঙ্গি করতে লজ্জাই লাগছে প্রফেসরের, নিজের প্রতিটি ভঙ্গি দেখতে পাচ্ছে তাঁর নিরাসক্ত মন। ডান হাতটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আগু-পিছু করছেন, বীভৎস একটুকরো হাসিতে বেরিয়ে পড়েছে দাঁত, একবার ডাইনে সরছেন, একবার বামে—কখন যে ছুরি চালাবেন তার ঠিক নেই। প্রথমে একটু থমকে গেলেও আবার একইঞ্চি দুইইঞ্চি করে সাবধানে এগোতে শুরু করল ছোরাধারী।

সামনের তাগড়া লোকটাও নড়ে চড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে এখন। হতাশায় ছেয়ে গেল তাঁর মন—এযাত্রা রক্ষে নেই আর। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কেটে যাচ্ছে দ্রুত, ধাপ্পা দিয়েও আর ঠেকানো যাবে না ওদের। আর কোনও কৌশল জানা নেই ওঁর।

পা দুটো আপনা আপনি ঝাঁকি খাচ্ছে, পালাতে চায়। লুকাসের কাছ থেকে কোনও সাহায্য আশা করা যায় না। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিটা ধরে রাখাও মুশকিল হয়ে উঠেছে। অনেক কষ্টে ঘুরে দৌড় দেয়া থেকে বিরত রেখেছেন নিজেকে। লুকাসকে এই অবস্থায় ফেলে যাওয়া যায় না। বীরপুরুষের অভিনয় করে যেতে হবে যতক্ষণ পারা যায়, তারপর যা থাকে কপালে।

পিছনে মৃদু খস খস শব্দ শুনে সচকিত হলেন আদনান। আরও লোক আছে নাকি! পরমুহূর্তে সামনের ছুরিওয়ালা লোকটার চোখে দেখতে পেলেন নিখাদ আতঙ্ক। কানের পাশে সোহানার কণ্ঠ শুনতে পেলেন, 'ঠিক আছে, আদনান ভাই। এবার একটু সরে দাঁড়াও দেখি।'

নিঃশব্দে ছায়ার মত এগিয়ে এসেছে ওরা দুজন। লাফিয়ে ডিঙালো লুকাসের দেহটা, তাঁর দু'পাশ দিয়ে এগিয়ে এল সামনে। সোহানা নিল ছোরাওয়ালার ভার, রানা উড়ে চলে গেল লম্বাচওড়া গুণ্ডাটার দিকে। কাঁপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঢিল করলেন প্রফেসর পেশিগুলো, শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কোনও মতে খাড়া রাখলেন নিজেকে।

দেখলেন, বিদ্যুৎ-বেগে ছোরা চালাল লোকটা। কোমরটা সামান্য বাঁকিয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে আওতার বাইরে, একপাশে সরে গেল সোহানা। ছোরাটা দুই ইঞ্চির জন্য ছুঁতে পারল না ওর বুকের খাঁচা। এইবার খোলা হাতে তালুর মাংসল জায়গাটা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল সোহানা লোকটার চিবুকের নীচে। ধাক্কার পিছনে দৌড়ের বেগ থাকায় জোর ঝাঁকি খেল লোকটার মাথা, মাটি ছেড়ে কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠে গেল পা, তারপর ধড়াস করে পড়ল চিত হয়ে।

ছোরাটা ছিটকে চলে গেল কয়েক হাত দূরে।

ততক্ষণে পাশ ফিরে ঝুঁকে লুকাসের জখম পরীক্ষা করছে সোহানা। সেই ফাঁকে রানার দিকে চাইলেন প্রফেসর। বিশালদেহী লোকটার জন্য রীতিমত দুঃখই হলো তাঁর। আগেই আবছা ভাবে নজরে পড়েছে, রানা-সোহানাকে ছুটে আসতে দেখে সঙ্গীকে ফেলে পালাবার চেষ্টা করেছিল লোকটা, কিন্তু পিছন থেকে ওর কোট ধরে ফেলেছে রানা। দুই হাতে সমানে ঘুসি চালাচ্ছে এখন, কেঁপে কেঁপে উঠছে লোকটার শরীর। যখন নেতিয়ে পড়ল, তখন একহাতে ওর কলার ধরে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে রেখে অপর হাতে ধীরে-সুস্থে সার্চ করল রানা ওকে। কোটের নীচে শোলডার হোলস্টার থেকে বের হলো একটা রিভলভার। কলারটা ছেড়ে দিতেই কাত হয়ে পড়ে গেল লোকটা মাটিতে; নড়ছে না, সম্ভবত জ্ঞান হারিয়েছে।

সোজা হয়ে প্রফেসরের দিকে ফিরল সোহানা। চোখে তাজ্জব হয়ে যাওয়া দৃষ্টি। 'আরে, আদনান ভাই, তুমি আবার কবে থেকে সঙ্গে চাকু রাখতে শুরু করলে?'

নিজের মুঠি করা হাতের দিকে চাইলেন আদনান, তারপর মুঠি খুলে দেখালেন বলপেনটা। 'কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা আরকী।'

হেসে উঠল সোহানা। 'কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছিল এক্সপার্ট নাইফ-ফাইটার! এই ভাব-ভঙ্গি কোত্থেকে শিখলে?'

'কোথায় আবার—টিভি থেকে!'

হেসে উঠল রানাও। বলল, 'দারুণ দেখিয়েছ কিন্তু, আদনান ভাই! এবার ভাবীর কাছে যাও। দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে বেচারির। আবোল তাবোল বকছিল।'

রওনা দিলেন আদনান, তবে মাঝামাঝি গিয়ে থামতে হলো। ড্রাইভওয়ে থেকে বাঁক ঘুরে দৌড়ে আসছে জেসিকা, পাশে দৌড়াচ্ছে রিচি হাওয়ার্ড, পিছনে দু-তিনজন বেয়ারা। দূর থেকেই উঁচু গলায় ডাকল জেসিকা, 'আদনান! সোহানা, ও ভাল আছে তো?'

'একটা আঁচড়ও লাগেনি,' জবাব দিলেন আদনান। স্বামীর গলা

শুনে সামান্য দিক পরিবর্তন করে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তাঁকে জেসিকা।

'কী ব্যাপার, কী হচ্ছে এখানে?' জিজ্ঞেস করল রিচি হাওয়ার্ড।

'দুজন লোক পিটিয়ে আধমরা করে ফেলেছে আপনার বন্ধু লুকাস ম্যাকপিলকে। সোহানার ধারণা খুব বেশি জখম হননি ভদ্রলোক, আপনি দেখুন গিয়ে।'

রিচি দৌড় দিল গাড়ির দিকে, পিছু পিছু গেল তিন বেয়ারা। আদনানকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বুকে গাল রাখল জেসিকা, 'কী ঘটছে কিছুই বুঝিনি আমি, কিন্তু সেটা যে ভয়ানক কিছু তা টের পেয়েছি তোমার ভয় দেখে।'

'ভয়?'

'হ্যাঁ। যখন তুমি থেমে দাঁড়িয়ে ওদেরকে ডাকতে পাঠালে, তখন তোমার গায়ে ভয়ের গন্ধ পেয়েছি আমি।'

কথাটা শুনে আদনান অবাক হলেন না, বিরক্ত তো নয়ই। তিনি জানেন, জেসিকা বাস করে স্বাদ, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের জগতে। অন্ধত্বের কারণে এই চারটি ইন্দ্রিয়ই ব্যবহার করতে হয়েছে বেশি বেশি, তাই অনুভবক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে এগুলোর। দেখা গেছে, জেসিকার ঘ্রাণশক্তি অনেক সময় কুকুরকেও হার মানিয়েছে।

'ওই গুণ্ডাগুলো,' আবার বলল জেসিকা। 'তোমার... তোমার কি ওদের সঙ্গে মারামারি করতে হয়েছে?'

'সামান্য,' বললেন প্রফেসর। তারপর হেসে উঠলেন। 'দাঁড়াও, এখুনি শুনতে চেয়ো না। একটু সময় পেলেই দেখবে মারপিটের কী রকম দুর্ধর্ষ কাহিনি দাঁড় করিয়ে ফেলি। আর, কটা দিন সুযোগ পেলে তো এমন বর্ণনা দেব, বিশ্বযুদ্ধের পর আমার এই মরণপণ যুদ্ধটাই দ্বিতীয় স্থান দখল করে নেবে ইতিহাসে। তবে তোমাকে চুপি চুপি বলছি: ফাইট হয়েছে, কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি হয়নি। একটা বলপেন দিয়ে ঠেকিয়ে দিয়েছি ওদের ছোরা।'

'বলপেন দিয়ে?'

'এই জন্যই তো কথায় বলেঃ অসির চেয়ে মসি বড়।' সংক্ষেপে সব জানালেন তিনি স্ত্রীকে। 'সত্যি বলতে কী, ওদেরকে আমার ভাল বদমাশ মনে হয়নি—স্রেফ দুই নম্বর। অ্যামেচার। রানা-সোহানা পৌঁছে এক মিনিটেই ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।'

'ওরা ঠিক আছে তো?'

উত্তর দেবার আগেই রানার বেণ্টলি কনভার্টিব্ল্ স্টার্ট নিল, হেড লাইট জ্বলে উঠল; তিন সেকেণ্ডের মধ্যে এসে দাঁড়াল ওটা আদনান-জেসিকার পাশে।

'চলে এলে যে?'

'লুকাসের জ্ঞান ফিরে আসছে,' বলল সোহানা। 'এখন রিচি করবে যা করার। এখানে দেরি করলে ফ্রেঞ্চ পুলিশের খপ্পরে পড়ে যাব, স্টেটমেন্ট নিতে নিতে এক্কেবারে বুড়ো করে ছেড়ে দেবে।'

পিছনের দরজা মেলে ধরলেন প্রফেসর জেসিকা উঠবে বলে, ঠিক তখনই লক্ষ করলেন রানা-সোহানা কৌতুকের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে। বিব্রত বোধ করলেন তিনি। 'দেখো!' তর্জনী তুলে শাসালেন তিনি, 'খবরদার, এ নিয়ে কোনও গল্প বানাবে না! দোহাই লাগে তোমাদের। পালিয়ে যে যাইনি, তার একমাত্র কারণ পা দুটো বিট্রে করল, কিছুতেই নড়তে চাইল না।'

'বাজে কথা বোলো না,' ফুঁসে উঠল জেসিকা। 'ওরা ওকে লাথির পর লাথি মারছে দেখেও তুমি ছুটে গেছ সাহায্য করতে! এর পর তো চেষ্টা করেও নিজেকে খাটো করে দেখাতে পারবে না। আমার ধারণা, দুর্দান্ত সাহসের পরিচয় দিয়েছ তুমি, আদনান। তুলনাহীন।'

'শুধু তা-ই না,' বলল সোহানা। 'পাক্কা ছোরাবাজের পোজ নিয়ে নেকড়ের মত দাঁত বের করে যে-রকম চাপা গর্জন ছাড়ছিল—ভাগ্য ভাল যে দূর থেকে চিনতে পেরেছিলাম, নইলে তো কাছে ঘেঁষার সাহস হতো না, ঘুরেই দৌড় দিতাম।'

দুই

জামার পিছনে যিপার ফেঁসে যাওয়ায় ওটার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল সোহানা, এমন সময় নক করে ওর ঘরে ঢুকল রানা। এগিয়ে এসে ওটা ছাড়িয়ে দিল, তারপর একটা ইজিচেয়ারে বসে আনমনে চেয়ে রইল সাগরের দিকে।

ড্রেস খুলে বাথরুমে ঢুকল সোহানা, দুই মিনিট পর বেরিয়ে এলো গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা আকাশী নীল রঙের একটা ড্রেসিং-গাউন পরে। রানাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাইতে দেখে হাসল মৃদু হাসি। জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ, রানা?'

'এবার আদনান ভাইয়ের মধ্যে আগের সেই প্রাণবন্ত, উচ্ছল ভাবটা দেখছি না,' বলল রানা। 'কেমন যেন চুপচাপ মনমরা হয়ে গেছে হাসিখুশি মানুষটা। তুমি কিছু জানো?'

'আমিও লক্ষ করেছি,' চেয়ারের হাতলে বসল সোহানা। 'কী যেন নিভে গেছে মানুষটার ভেতর। কথায় কথায় জেসিকার কাছ থেকে একটু একটু করে বের করেছি আসল ঘটনা। ব্যাপার আর কিছু নয়—টাকা।'

'টাকা?' অবাক হলো রানা। 'টাকার অভাব তো ছিল না আদনান ভাইয়ের? শুনেছিলাম, ইউনিভার্সিটির বেতন তো আছেই, তার ওপর কয়েকটা উঁচু মানের পাঠ্যবই লিখেছেন; নিয়মিত ভাল টাকা আসে রয়্যালটি থেকে।'

'আসত,' বলল সোহানা। 'এখন আর আসে না। এখন মাসিক বেতনটাই ওর একমাত্র উপার্জন। বিয়ের পর থেকে লেগে আছে

আদনান ভাই জেসিকার অন্ধত্ব ঘোচানোর ব্যর্থ চেষ্টায়। কোথায় না গেছে ওকে নিয়ে। জার্মেনি, সুইডেন, জাপান, আমেরিকা, সাউথ আফ্রিকা, সিঙ্গাপুর... যেখান থেকে কেউ একটু আশ্বাস দিয়েছে, ছুটে গেছে সেখানেই। জেসিকার বাবাও অনেক চেষ্টা করেছিলেন, ফল হয়নি। অনেক বারণ করেছে জেসিকা। কিন্তু কারও কথা শুনবে না আদনান ভাই। শেষমেশ আমেরিকার এক চক্ষু বিশেষজ্ঞের কথায় ওখানে নিয়ে গিয়ে একটা প্রাইভেট নার্সিং হোমে ভর্তি করে ছয় সপ্তাহ চিকিৎসা করিয়েছিল। দেড় মাসে বিশ হাজার ডলার খরচ করার পর তারা জানিয়ে দিল: কিছুই করার নেই, এ চোখ ভাল হবার নয়।'

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'মেয়েটাকে মনে-প্রাণে ভালবাসে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সত্যিই কি ফতুর হয়ে গেছে মানুষটা?'

'আমি যতদূর জানি, অনেক টাকা লোন নিয়েছিল ব্যাঙ্ক থেকে। রয়্যালটির সব টাকা এমনকী বেতনেরও একটা অংশ চলে যাচ্ছে ইনস্টলমেণ্ট শোধ করতে, আরও কয়েক বছর রয়্যালটির একটি পয়সাও ঘরে আসবে না। পৈত্রিক বাড়িটাও যাবে বন্ধকের টাকা শোধ করতে না পারলে।' কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'জেসিকার নিজস্ব কোনও আয়-রোজগার বা জমানো টাকা নেই। ফলে ভাল গ্যাঁড়াকলেই ফেঁসেছে ওরা। সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, এই সবকিছুর জন্য জেসিকা দায়ী মনে করে নিজেকে।' একটু থেমে আবার বলল ও, 'এটা কী রকম ব্যাপার, বলো তো, বন্ধু বা আপনজন যাদের তুমি ভালবাসো, তারা তোমার কাছ থেকে সব রকম সাহায্য নিতে প্রস্তুত, কিন্তু টাকা দিতে যাও—অপমান বোধ করবে! ওদের দেনা শোধ করে দেয়া আমাদের জন্য কিছুই না, কিন্তু...'

'হ্যাঁ। কিন্তু।' মাথা নাড়ল রানা। 'আমরা কেউ যদি টাকা দিতে চাই, কিংবা সামান্য ইঙ্গিতও দিই, চিরতরে হারাবো ওদের। যাকগে,

ভেবো না। বিপদ আসে, আবার কীভাবে যেন কেটেও যায়।'

'কেটে গেলেই ভাল,' বলল সোহানা। 'আর্থিক দুরবস্থায় পড়লে মানুষের মন ছোট হয়ে যায়। আমরা দাওয়াত করে খাওয়ালে তারা যদি খাওয়াতে না পারে, আলগোছে কেটে পড়ে, হারিয়ে যায়। আমরা বন্ধু হারাই।'

মুখ কালো করে চুপচাপ বসে থাকল রানা কয়েক মুহূর্ত।

'ভাল কথা,' হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল ও। 'আজ রাতে লুকাসের ব্যাপারটা তোমার কী মনে হলো?'

'কী মনে হলো মানে?' একটু অবাক হলো সোহানা। 'এরকম তো হর-হামেশাই হচ্ছে। বারে ঢুকে রিচি দেখল সিগারেট আনতে ভুলে গেছে, লুকাস গেল গাড়ি থেকে প্যাকেট আনতে; অমনি কবলে পড়ল ছিনতাইকারীর—এই রকম কিছু একটাই তো হবে।'

'কিন্তু ছিনতাই হয়নি কিছু। পেটানো হচ্ছিল শুধু। কেন?'

হাতের তালু দিয়ে চিবুক ঘষল সোহানা। 'তাই তো! আসলে অনুমান করবার মত যথেষ্ট তথ্য নেই আমাদের হাতে। খোঁজ নেয়া দরকার মনে করছ?'

'না।' একটু যেন বেশি তাড়াতাড়ি জবাব এলো। 'এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। ভাবছিলাম... নিছক কৌতূহল।'

কয়েক সেকেণ্ড রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল সোহানা। কিছু যেন আঁচ করতে চাইছে। রানা বিদায় নেয়ার পর কেন যেন ওর মনটা ভাল হয়ে গেল। মনে হলো, একটা বোঝা নেমে গেছে ওর কাঁধ থেকে, আরেকটা বলিষ্ঠ কাঁধ তুলে নিয়েছে সে-ভার। ওর আর চিন্তা না করলেও চলবে।

তিন

পরদিন দুপুর। বড়সড় পাওয়ারবোটের স্টার্নে বসে আছেন প্রফেসর আদনান। তাকিয়ে আছেন প্রায় দেড়শ' ফুট লম্বা টো-রোপের দিকে। রশির শেষ প্রান্তে সাগর থেকে ষাট ফুট উপরে উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে বিশাল একটা ঘুড়ি।

ওখানে ট্রাপিয বার দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে মাসুদ রানা, পায়ে স্লালোম স্কি। ওর পিঠে চড়ে উড়ছে জেসিকা—দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে রানার গলা। স্ত্রীর মুখটা দেখতে পাচ্ছেন আদনান রানার কাঁধের উপর: নির্মল আনন্দে হাসছে জেসিকা, আগে কখনও এই অভিজ্ঞতা হয়নি ওর।

এক হাত তুলল রানা টো-রোপ রিলিজ গিয়ারের দিকে। তাঁকে উইঞ্চ ঘুরিয়ে আরও দড়ি ছাড়তে বলছে। আদনান দেখতে পাচ্ছেন, দুই পায়ে আরও জোরে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল জেসিকা, তারপর একটা হাত নাড়ল তাঁর উদ্দেশে। প্রত্যুত্তরে হাত নাড়তে গিয়েও থেমে গেলেন আদনান, ভুলেই গিয়েছিলেন: জেসিকা দেখতে পাবে না।

একহাতে বোটের হুইল ধরা, ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে রয়েছে সোহানা ঘুড়িটার দিকে—যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। টো-রোপ ছাড়তে ছাড়তে গলা চড়িয়ে বললেন প্রফেসর, 'দেখো, দেখো! কী ফুর্তি! মহা আনন্দে রয়েছে এখন জেসিকা!'

'তুমিও চেষ্টা করে দেখো না, আদনান ভাই। মজা লাগবে। মনে হবে শ্যাম্পেনের নেশা!'

'তার চেয়ে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি পেলে আরও বেশি খুশি হবো,' বললেন প্রফেসর। 'এটা বিপজ্জনক মজা।'

সাঁ করে নেমে এলো ঘুড়িটা পোর্ট সাইডে, রানার স্কি যখন পানি ছোঁয় ছোঁয়, তখনই থ্রটল খুলে দিল সোহানা আরও। পাঁচ সেকেণ্ডে আশি ফুট উপরে উঠে গেল ঘুড়িটা ডানদিকে, স্টারবোর্ড সাইডে।

থ্রটল কমিয়ে সোহানা বলল, 'বোতলে এই আনন্দ পাবে না, আদনান ভাই।'

আদনানের চোখ তখন অন্যদিকে। 'ওই দেখো, তোমার হবু বর রিচি হাওয়ার্ড আসছে এইদিকে!'

চট্ করে একবার ওরদিকে চেয়েই সিদ্ধান্ত নিল সোহানা: ঘুড়িটা নামিয়ে আনতে হবে। রিচি আর ঘুড়ি, দুটোকে একসঙ্গে সামলানো সম্ভব নয়।

রানার দিকে একবার হাত নেড়ে স্পিড কমালো সোহানা। বোটের নাকটা এখনও বাতাসের দিকে তাক করা। ধীরে ধীরে নেমে এলো ঘুড়ি। রানার স্কি সাগর স্পর্শ করল। কয়েক সেকেণ্ড ভেসে থেকে ঝপাৎ করে পানিতে ডুবে গেল রানা জেসিকাকে পিঠে নিয়ে। সিলিণ্ডারের মত দেখতে দুটো ফ্লোট ভাসিয়ে রাখল ঘুড়িটাকে। পলিপ্রপিলিন টো-রোপ ভাসছে পানিতে।

রশি গুটিয়ে ঘুড়িটাকে কাছে নিয়ে এলেন আদনান, হাত বাড়িয়ে বোটে তুলে নিলেন জেসিকাকে। ঘুড়ির ফ্রেমটা ভাঁজ করতে ব্যস্ত রানা। রুদ্ধশ্বাসে বলল জেসিকা, 'আশ্চর্য! দারুণ! আমাকে দেখতে পেয়েছ, আদনান? মনে হচ্ছিল স্বর্গে চলে গেছি!' খুশি ও উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে ওর চেহারা।

দর্শনীয়ভাবে টার্নিং হল্ট করে বোট নিয়ে কাছে এগিয়ে এলো রিচি। উজ্জ্বল হাসিমুখ আর ঝকঝকে চোখ তুলে চাইল সে সোহানার দিকে। 'লুকাস ম্যাকপিলের বার্তা এনেছি, সোহানা! তোমাদের সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে আমার বন্ধু। একটু সেরে উঠে ফুলটুল নিয়ে নিজেই দেখা করবে ও তোমাদের...'

'লোক দুজন কেন ওকে পেটাচ্ছিল পুলিশ বের করতে পেরেছে ওদের পেট থেকে?'

কাষ্ঠহাসি দিল রিচি। 'আর বোলো না! শুনলে রেগেই যাবে তোমরা। পালিয়েছে ওরা, পুলিশ আসার আগেই!'

'পালিয়েছে?' ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল সোহানার।

'আমারই গাড়িতে করে, আমারই দোষে, বিশ্বাস করো! রানার দেয়া রিভলভারটা ওদের দিকে বাগিয়ে ধরে পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল ওটা।'

'পড়ে গেল! তামাশা করছ?'

'না, ঠাট্টা নয়। সিনেমার হিরোদের মত মাঝে মাঝে ওটা শূন্যে ঘুরিয়ে খপ্ করে ধরছিলাম। শেষবার ফসকে গেল হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিল ওটা তাগড়া লোকটা।' মুখ বিকৃত করল রিচি। 'লজ্জার ব্যাপার! খেপে গিয়েছিল পুলিশ।' ভয় পেয়েছিলাম, আমাকেই না আবার অ্যারেস্ট করে!'

'করলেও তোমার কিচ্ছু হতো না,' বলল রানা। ঘুড়ি ভাঁজ করে রেখে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। 'কোর্টে তোমার উকিল তোমাকে উন্মাদ ডিক্লেয়ার করলেই বাধ্য হতো ছেড়ে দিতে।'

যেন খুব মজা পেয়েছে, এমন ভঙ্গিতে পিছনে হেলে হেসে উঠল রিচি, কিন্তু চোখে সে হাসির রেশ পৌঁছল না। তারপর বলল, 'সত্যিই, অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা... ভাবা যায় না। যাকগে, এবার কাজের কথা।' সোহানার দিকে ফিরল সে, 'আমার পার্টির জৌলুস বাড়াতে তোমরা আসছ তো আজ?'

'হচ্ছে ওটা? বাতিল করোনি প্রোগ্রাম?'

'নাহ্, কী যে বলো! বন্দরের সেরা সুন্দরীদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সেজেগুজে আসবে ওরা। চলে এসো, ম্লান করে দাও ওদের! কোনও ছুতো কিন্তু শুনব না।'

রানার দিকে চাইল সোহানা। উত্তরটা রানাই দিল।

'ঠিক আছে, আসছি আমরা। এবার তোমার ভটভটি নিয়ে একটু

দূরে সরবে? কান ঝালাপালা হয়ে গেল!'

হাসিমুখে হাত নাড়ল রিচি, তারপর স্পিডবোট ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল দূরে জেটিতে দাঁড়ানো মারলিনের দিকে।

চার

সন্ধের একটু পর জেসিকাকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন আদনান মুস্তফি। 'দেখো তো, সব ঠিকঠাক আছে কি না। আমি বললাম: লিপস্টিক, টিপ, সিঁথি, ক্লিপ, হুক সব ঠিক আছে; কিন্তু আমার ওপর ভরসা নেই, আমি নাকি শাড়ির কিছুই বুঝি না, সোহানাকে দেখিয়ে সার্টিফিকেট পাওয়া গেলে তবে বুঝ মানবে!'

কলাপাতা-সবুজ একটা শাড়ি পরেছে জেসিকা। ফুটফুটে সুন্দর ফুলের মত লাগছে ওর মুখটা। বলল, 'ও সবসময়ে বলে ঠিক আছে, ঠিক আছে—ভাল করে না দেখেই। একবার তো প্রাইস ট্যাগ আঁটা কাপড় পরে ঘুরে এসেছিলাম এক পার্টি থেকে!'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সোহানা জেসিকাকে। 'চমৎকার লাগছে,' আশ্বস্ত করল ও। 'তবে এত দামি একটা শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং জুয়েলারি দরকার—বিশেষ করে এই ধরনের সোশাল পার্টিতে। সঙ্গে এনেছো কিছু?'

'না,' জবাব দিলেন প্রফেসর। 'আমরা পার্টির জন্য প্রস্তুত হয়ে আসিনি। বাড়িতে অবশ্য অপূর্ব সুন্দর, ঝলমলে একটা হীরার ব্রোচ আছে ওর। কিনেছিলাম আলজিয়ার্সের এক খোঁড়া ফেরিওয়ালার কাছ থেকে। লোকটা কসম খেয়ে বলেছিল: কোনও সন্দেহ নেই, পাথরগুলো খাঁটি হীরা। যদি মিথ্যে বলে থাকে, তা হলে পানিতে

গেছে আমার তিনটে ডলার।'

'আমি দু-একটা অলংকার ধার দিতে পারি,' বলে বেডরুমের দিকে হাঁটতে শুরু করল সোহানা। একবার গলায় হাত দিয়ে একটা ভুরু উঁচু করল রানার দিকে চেয়ে। মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল রানা। সোহানা ফিরে এলো চুনি বসানো দুটো রতনচুর, একজোড়া ব্রেসলেট, একটা হিরে বসানো আংটি আর গলায় পরার জন্য অপূর্ব সুন্দর এক মুক্তার মালা। 'এই যে। রিচি যদি জমকালো পার্টি চায়, পাবে। জৌলুস চায়, তার চেয়েও অনেক বেশি পাবে এখানে। বিশ্বসুন্দরী এলেও জ্ঞান হারাবে জেসিকার কাছে নক-আউট পাঞ্চ খেয়ে।'

'ইয়াল্লা, না!' ছটফট করে উঠলেন প্রফেসর, 'ওগুলো না!'

'কী এগুলো?' মুক্তার ভারী নেকলেস হাতে নিয়েই আড়ষ্ট হয়ে গেল জেসিকা। ও চেনে এটা, এর ইতিহাস জানে; জানে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডে ইনশিওর করা আছে এই মালা। সোহানাকে উপহার দিয়েছিল রানা এই হার। একচল্লিশটা মুক্তা বসানো আছে এই নেকলেসে, সবচেয়ে বড়টার ওজন একশ' তেরো গ্রেইন, আর ছোটটার ত্রিশ গ্রেইন। এগুলো কাজের ফাঁকে ফাঁকে পৃথিবীর সাতটা বিখ্যাত পার্ল-বেড থেকে নিজে ডুব দিয়ে তুলেছে মাসুদ রানা সোহানার জন্য। সময় লেগেছে পাক্কা আড়াই বছর। পছন্দসই মুক্তার জন্য বিশ হাজার ঝিনুক তুলতে হয়েছিল রানাকে।

'অসম্ভব!' রুদ্ধশ্বাসে বলল জেসিকা। 'এ আমি পরব না! মাই গড! এই জিনিস সঙ্গে রেখেছ কেন, সোহানা? ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে দেয়া উচিত এটাকে।'

'সেইজন্য তো দিইনি আমি ওটা,' বলল রানা হাসিমুখে। 'অলঙ্কার পরার জন্য, ভাল লাগার জন্য—লুকিয়ে রাখার জন্য নয়। এবার ঘোরো তো, সোহানা পরিয়ে দিক গয়নাগুলো।'

মাঝরাতে পুরোপুরি জমে গেল রিচি হাওয়ার্ডের পার্টি। দীর্ঘ টেরেস

রুমের একপাশে স্টেজে বসেছে ব্যাণ্ডপার্টির পাঁচজন, চমৎকার বাজাচ্ছে জনপ্রিয় গান ও বাজনার সুর। স্যাক্সোফোনের মনছোঁয়া লম্বা টানে বুকের ভিতরটা কাঁপে, কেমন নেশা ধরে যায়। ঘরের তিনপাশের দেয়াল কুঁচি দেয়া পর্দা দিয়ে ঢাকা, আগরবাতির গন্ধে প্রাচ্যের আবহ। বেশিরভাগ অতিথিই নাচছে, বিশ্রামের জন্য চেয়ারে বসছে, যার যে-মদ পছন্দ বোতল থেকে ঢেলে নিয়ে চুমুক দিচ্ছে গ্লাসে, গল্প করছে, তারপর আরেক পার্টনার বেছে নিয়ে চলে যাচ্ছে ডান্সফ্লোরে। সোহানা, জেসিকা ও প্রফেসরও মহানন্দে নাচছে পার্টনার বদল করে করে। রিচি ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক, হাসছে, কার কী দরকার দেখাশোনা করছে, খাবারের তদারকি করছে; কখনও বা কোনও রূপসী মহিলার সঙ্গে নেচে নিচ্ছে কয়েক মিনিট। রানা একবার দু'বার নেচে একটু আলাদা হয়ে বসে আছে।

হঠাৎ বেতালা একটা ঝনঝনে, তীক্ষ্ণ আওয়াজে চমকে উঠল পার্টির সবাই। সিম্বল্ বা কাঁসির মত শব্দ, তবে তার চেয়ে অনেক জোরালো। বাজনা থেমে গেল। অতিথিদের কলকণ্ঠ কয়েক সেকেণ্ড শোরগোলের মত শোনা গেল, তারপর চুপ হয়ে গেল সবাই।

ব্যাণ্ডপার্টির নিচু স্টেজে উঠে দাঁড়াল একজন লোক। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত লম্বা কালো প্লাস্টিকের বর্ষাতি পরেছে, মাথাটা কালো হুড দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা। শ্বাস নেবার জন্য ছোট একটা ফুটো থাকলেও চোখের জন্য আলাদা কোনও গর্ত নেই। সম্ভবত, ওটা এমন ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি যে ভিতর থেকে বাইরেটা দেখা যাবে, কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরের কিছুই দেখা যাবে না। লোকটার হাতে ব্যারেল কাটা একটা দোনলা বন্দুক।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে আরও তিনজন হুড পরা লোক দেখতে পেল রানা। দু'জন টেরেসরুমের দুই দরজা, আর বাকিজন সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং পাহারা দিচ্ছে। এদের প্রত্যেকের হাতেই কাটা বন্দুক। রিভলভার হাতে আরও তিনজন মুখোশ পরা মানুষ কামরার ভিতর ঢুকছে দেখে সরে জায়গা ছেড়ে দিল অতিথিরা। দু'জন মুখোশধারী

দুই দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল, তৃতীয়জন টহল দেয়ার ভঙ্গিতে চলে গেল কামরার শেষ মাথায়। কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর ব্যাণ্ড স্টেজে দাঁড়ানো লোকটা ভাঙা-ভাঙা ফ্রেঞ্চে কথা বলে উঠল:

'মন দিয়ে শুনুন, প্লিজ। যা বলার একবারই বলব। কেউ নড়বেন না। একটু পর ওয়েইটারদের একজন ট্রে হাতে এক-এক করে আপনাদের সবার সামনে দিয়ে যাবে। সঙ্গে মূল্যবান যা কিছু আছে আপনারা সেই ট্রে-তে রাখবেন। কেউ বাধা দিলে বা আদেশ অমান্য করলে মারাত্মক জখম হবেন।'

ব্যাণ্ডের দিকে ফিরে ইঙ্গিত করল লোকটা। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে বাজনা শুরু করল ওরা। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে খালি হাত নাড়ল মুখোশধারী, ধমকের সুরে জোরে বাজাবার নির্দেশ দিল। বেড়ে গেল আওয়াজ।

দুই হাতে কপালের দু'পাশ ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে কী যেন বিড় বিড় করছে রিচি। হঠাৎ যেন মাথা খারাপ হয়ে গেল তার। তেড়ে গেল একজন মুখোশধারীর দিকে। গর্জে উঠল রিভলভার, কিন্তু বাজনার শব্দে প্রায় ঢাকা পড়ে গেল গুলির আওয়াজ। থমকে দাঁড়াল রিচি, ব্যথায় কুঁচকে গেছে মুখ। একহাতে বাহু চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে, চোখে-মুখে উদ্‌ভ্রান্ত, হতবিহ্বল একটা ভাব। তেমনি জোরেশোরে বাজছে বাজনা। নড়ল না কেউ।

ভীত-সন্ত্রস্ত একজন ওয়েইটারকে আঙুলের ইশারায় ডেকে তার হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো একটা খালি ট্রে। আদনান দেখলেন, কামরার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রানা ও সোহানা। সোহানা চেয়ে রয়েছে রানার দিকে। রানার চেহারা নির্বিকার। তাকিয়ে আছেন বলে টের পেলেন প্রফেসর, সামান্য একটু মাথা নেড়ে দামি টাইপিন ও কাফলিঙ্ক খোলায় মন দিল রানা। সোহানাও ওর এমারেল্ড ব্রোচ খুলতে শুরু করল।

ওদের থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেসিকা। আদনান দেখলেন, দুধের মত সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ, দুই হাতে চেপে ধরে

আছে গলার কাছটা। ধক্ করে উঠল তাঁর কলজেটা, রক্ত সরে গেল নিজের মুখ থেকেও। মনে পড়ে গেছে, সোহানার সেই অসম্ভব দামি মুক্তোর মালা এখন জেসিকার গলায়!

জেসিকার সামনে এখন ট্রে হাতে ওয়েইটার। দেখলেন, মাসুদ রানা এগিয়ে গিয়ে আলগোছে ওর হাতদুটো সরিয়ে দিল গলার কাছ থেকে, হুক খুলে নেকলেস্‌টা ছেড়ে দিল ট্রে-র উপর। হীরার আংটি, রত্নচূর আর ব্রেসলেট জোড়াও গেল ওখানে। হতাশায় ছেয়ে গেল প্রফেসরের অন্তর। খানিক পরে নিজের শীর্ণ মানিব্যাগটা রাখলেন তিনি ট্রে-তে, দেখলেন তাঁর চেনা অলঙ্কারগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে আর সবার মূল্যবান জুয়েলারির সঙ্গে।

অপারেশনের বিদায় পর্বও একই রকম নিপুণ দক্ষতায় সারা হলো। শটগান হাতে টেরেস লাউঞ্জের দরজায় দাঁড়াল দুইজন, বাকি সবাই নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে নীচে, রাস্তাটা পেরোলেই ল্যাণ্ডিং স্টেজ। ইঞ্জিন স্টার্টের শব্দ কানে আসতেই দরজায় দাঁড়ানো লোক দু'জন অদৃশ্য হয়ে গেল। থেমে গেল বাজনা। সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠল। শোরগোলের শব্দ ছাপিয়ে কানে এল একটা শক্তিশালী বোটের আওয়াজ, দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমে।

মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে এখনও রিচি হাওয়ার্ড। মাথাটা ঝুলে পড়েছে নীচে, বাহু চেপে ধরা আঙুলের ফাঁক গলে টপ-টপ রক্ত পড়ছে মেঝেতে। রানা এসে দাঁড়াল ওর পাশে।

'আবারও...' যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে রিচি, মাথাটা নাড়ছে এপাশ-ওপাশ। 'হায় খোদা, সেই একই ঘটনা আবারও!'

'তোমার হাতটা দেখি, রিচি,' বলল রানা।

'আমার হাত? ও কিছু না... মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে গুলি।' পাগলাটে দৃষ্টিতে চারপাশে চাইল রিচি, তারপর টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল। 'এক ব্যাটা ডাক্তারকে দাওয়াত করেছিলাম, গেল কোথায়?' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, রাগে লাল হয়ে উঠল মুখটা। চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আর ওই ম্যানেজার? কোথায় গেল

হারামজাদা?' আরও চড়ে গেল গলা, 'আর অপদার্থ পুলিশগুলোই বা কোথায়?'

হাত খামচে ধরে লোকজনের ভিড় ঠেলে ছুটল সে সিঁড়ির দিকে। পিছন ফিরে রানা দেখল, ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে জেসিকা, এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে আছেন আদনান।

'চলো, এখান থেকে কেটে পড়া যাক,' বলল রানা।

'চলো,' ঘাড় কাত করল সোহানা। 'আমাদের স্টেটমেণ্ট কাল দিলেও চলবে।'

রানা স্টিয়ারিঙে, পাশে বসেছে সোহানা; পিছনের সিটে জেসিকাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছেন আদনান। কান্না থেমেছে, কিন্তু বেচারির কাঁপুনি যায়নি এখনও। ওর কথাটা বেরিয়ে এল আদনানের কণ্ঠ দিয়ে, 'ইশ্‌শ্‌! মুক্তাগুলো!'

'আক্ষেপ কোরো না, আদনান ভাই,' বলল রানা। 'মেনে নাও। এটা কপালের ফের।'

'আমার গায়ে ছিল গহনাগুলো!' ভাঙা গলায় বলল জেসিকা, 'আমি যদি ওগুলো না পরতাম—'

'আসলে আমিই তো জোর করে পরিয়েছি তোমাকে, তাই না?' সান্ত্বনা দিল সোহানা। 'তুমি না পরলে আমি পরতাম। এই একই ঘটনা ঘটত, জেসিকা। ওখানে কেউ আমরা যদি ট্যাঁ-ফোঁ করতাম, তা হলে শটগান দিয়ে ম্যাসাকার করত ওরা। যা ঘটেছে তার জন্য সামান্য দায়দায়িত্বও তোমার ওপর বর্তায় না। আমরা সবাই ঘটনার শিকার, সেটা মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি, সোহানা। কিন্তু মন মানতে চায় না। আমি একটা অপয়া। আমার যারা কাছের মানুষ, আপনজন; দেখেছি আমি, সব সময় তাদের ক্ষতি হয়।'

কথাগুলো মন খারাপ করে দিল সবার।

পাঁচ

পরের দুটো দিনে আদনান ধীরে ধীরে অনুভব করতে পারলেন, রানা-সোহানা যা বলেছে তা বানোয়াট কিছু নয়। কী হারালাম তা নিয়ে ভাবে না ওরা, সেটা অতীত—সময়টা খরচ হয়ে গেছে জীবন থেকে, আর কখনও ফিরে আসবে না। ভবিষ্যৎ নিয়েও বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় ওরা—সেটা আসেনি এখনও, না-ও আসতে পারে কোনও দিন। ওরা বাঁচে বর্তমানে। এখন, এই মুহূর্তে। একটা একটা করে যে-মুহূর্তগুলো আসছে সামনে, সেগুলো উপভোগ করতেই, সেগুলো ব্যবহার করে কিছু গড়ে তুলতেই ব্যগ্র।

কিন্তু জেসিকার আক্ষেপের শেষ নেই, কোনও সান্ত্বনাই শান্ত করতে পারছে না ওকে। সব দোষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে অনুশোচনায় মিশে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে। থেকে থেকে গাল বেয়ে নামছে পানি।

রিচি হাওয়ার্ডের সেই উচ্ছলতা নেই। টেলিফোন করে নিচু, লজ্জিত কণ্ঠে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। জানিয়েছে, ওর জখম সেরে উঠছে দ্রুত। কোনও শিরা বা রগে লাগেনি, মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট।

যেমন ছিল তেমনি হাসিখুশি রয়েছে রানা-সোহানা। সাঁতার কাটছে, মাছ ধরছে, বোটে করে ঘুরছে, ঘুড়িতে চড়ে উড়ছে—ছুটি কাটাচ্ছে মহানন্দে। ইনশিওরেন্স ক্লেইম করেই নিশ্চিন্ত। ডাকাতির ব্যাপারে আর কিচ্ছু ভাবতে রাজি নয়। তবে অনেক রাতে কোথায় যেন যায় মাসুদ রানা, ফিরে আসে ভোর হলে। কোথায় যায় জিজ্ঞেস

করলে কিছু বলে না, হাসে।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় কিছু কেনাকাটার জন্য স্ত্রীকে নিয়ে মার্কেটে গিয়েছিলেন আদনান মুস্তফি, আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। রানা বেরোচ্ছিল বাইরে, হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো, আদনান ভাই? এতো তাড়া কীসের?'

'ওখানে লুকাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল,' বললেন আদনান, 'বাজার করতে গিয়েছিল...'

'কী বাজার?' ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল রানার।

'এই, খাবার-দাবার, নিত্য প্রয়োজনীয়...'

'খাবার কিনছে?' আবার কথার মাঝখানে জিজ্ঞেস করল রানা, 'বেশি বেশি করে?'

'হ্যাঁ। ইয়টের জন্য, কয়েকদিনের রসদ। দেখা হতেই এগিয়ে এসে ওর প্রাণ বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ জানাল আমাদের, পার্টিতে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করল।' কনুই দিয়ে হালকা একটা গুঁতো মারলেন প্রফেসর জেসিকার পাঁজরে, 'এবার তুমি বলো, ডার্লিং।'

টগবগ করে ফুটছে যেন জেসিকা, অল্প অল্প কাঁপছে শরীরটা।

'ওই লোকটা ডাকাতির সময় উপস্থিত ছিল, সোহানা! আমার খুব কাছেই। তোমরা ওকে দেখেছিলে?'

রানার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে সোহানা বলল, 'না তো! আগের রাতে পিট্টি খেয়ে ও তখন বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে।'

'ভুল! আসলে মুখোশ পরে ওয়েইটারের পেছন পেছন ঘুরছিল,' বলল জেসিকা। 'চোখ রাখছিল ট্রে থেকে কোনও অলঙ্কার আবার খোয়া যায় কি না সেই দিকে।'

'তুমি জানলে কী করে?' হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে।

'আগে জানতাম না, এই তো একটু আগে জানলাম,' বলল জেসিকা। 'গন্ধ। সেই ডাকাতের গায়ের গন্ধই পেলাম আমি আজ লুকাসের গায়ে।'

'তুমি শিওর?' জানতে চাইল সোহানা।

'শিওর। কিন্তু প্রমাণ করতে পারব না। তবে গন্ধ চিনতে ভুল হয় না আমার কখনও। আমি জানি, ও ছিল সেদিন ডাকাতির সময় ওয়েইটারের ঠিক পাশেই।'

ভুল যে হয় না, সেটা ওরাও জানে। নিঃশব্দে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেও জেসিকা টের পায় কে এসেছে। ও পৃথিবীটাকে অনুভব করে নাক-কান-জিভ ও স্পর্শের মাধ্যমে। প্রত্যেকের গায়ের গন্ধ সে আলাদা ভাবে চেনে, তবে গন্ধকে যাতে গুলিয়ে না ফেলে সেজন্য অন্য কিছুতে রূপান্তর করে নেয়। সোহানার গন্ধ ওর কাছে যেন মখমলের স্পর্শ, রানার গন্ধ আড়-বাঁশীর সুর, আদনানের গন্ধ নারকোল-চিংড়ির স্বাদের মত।

'দারুণ, জেসিকা!' আন্তরিক প্রশংসা ঝরল রানার কণ্ঠে। 'দারুণ একটা তথ্য দিয়েছ! অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। এইবার ধরা পড়বে ছিনতাইকারীরা।'

'কে ধরবে, কী করে?' অবাক হলেন আদনান। 'পুলিশ? জেসিকার কথা ওরা বিশ্বাস করবে না। পাত্তাই দেবে না।'

'তা তো দেবেই না,' বলল রানা। 'ওদের হাত-পা বাঁধা। হাতে-নাতে ধরতে পারলে এক কথা, তা নইলে সলিড প্রমাণ চাই।'

'তা হলে?' হতাশ হয়ে পড়ল জেসিকা।

'নো চিন্তা, ডু ফুর্তি,' বলল রানা। 'এবার আমরা চারজন কাজে নামব। পানির মত সহজ হয়ে গেছে এখন ব্যাপারটা। সাবাশ, জেসিকা! আমরাই এখন ধরে ফেলব ওদের।'

কথাটা শুনে ঝিকমিক করে উঠল জেসিকার দৃষ্টিহীন, নীল চোখ। যেন মুহূর্তে দূর হয়ে গেছে ওর সব কষ্ট।

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন আদনান। 'চোর ধরা পুলিশের...'

'না। পুলিশ কিছু করতে পারবে না,' বলল রানা। 'ওদেরকে আইন মেনে চলতে হয়। ব্যাপারটায় প্যাঁচ পড়ে গেছে মেলা। আমরা যেভাবে অনেক ছেঁড়া সুতো জোড়া দিয়ে খাপে খাপে মেলাতে

পারছি, পুলিশের হাতে সে-রকম কোনও তথ্য নেই। ওদের পক্ষে চোরাই মাল উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।'

'তা হলে? আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে?'

'দেখা যাক,' হাসল রানা। 'চেষ্টা তো করব। জেসিকার এই তথ্যটা পেয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেলাম আমরা, কাজটা কাদের। এবার অ্যাকশনে যাব, লুটের মাল সব উদ্ধার করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ্। তবে, জেসিকা, তোমার সাহায্য লাগবে।'

'কী সাহায্য?' সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া জেসিকা। 'কী করতে হবে আমার?'

'আপাতত সোহানাকে টেবিলে খাবার সাজাতে সাহায্য করো। পেটটা ভরলে বুদ্ধি খুলবে, তখন বুঝতে পারব কোন্ পথে এগোতে হবে। তাই না, সোহানা?'

'চলো,' জেসিকার হাত ধরে রান্নাঘরের দিকে এগোল সোহানা।

'এই না বেরোচ্ছিলে?' রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন প্রফেসর। 'এখন আবার খিদে পেয়ে গেল! বাড়তি কী তথ্য আছে তোমার কাছে, একটু ঝেড়ে কাশো দেখি, বাছা?'

'ছোট-ছেট তথ্য, আদনান ভাই। কোস্টা স্মেরালডা। টেরেস রুম। সুন্দরী ছুকরিবিহীন প্লেবয় ইয়ট। লুকাসের মার খাওয়া। ওয়েস্টার্ন সিনেমার নায়কদের মত রিচির পয়েন্ট ফোরফাইভ রিভলভার লোফালুফি। বড়লোক মহিলাদের মধ্যে গহনার প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা। বুলেটের আঁচড় খেয়ে রিচির মাটিতে আছড়ে পড়া। সব জায়গামত বসছে না এখন?' হাসল রানা। 'রিচির ইয়টের ওপর চোখ রাখতে হবে। খাওয়া সেরে সারা রাতের জন্য বেরোব আজ।'

'কদিন ধরে এই কাজই করছ বুঝি? তোমার সঙ্গে আমিও যাব আজ।'

'একসঙ্গে দুজন কষ্ট করে লাভ নেই, আদনান ভাই,' বলল রানা। 'তুমি বরং দুটোর পর থেকে ডিউটি দাও। ঠিক রাত দুটোয়

জেটির পুবদিকে বাতিহীন ল্যাম্পপোস্টটার নীচে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। ঠিক আছে?'

'না, ঠিক নেই,' বললেন প্রফেসর। 'আমি টিচার মানুষ, রাত জেগে অভ্যেস আছে। আমি নেব প্রথম রাতের ডিউটি, তুমি খানিক ঘুমিয়ে নিয়ে তারপর এসো রাত দুটোয়।'

রাত ঠিক নয়টায় ফোন এল আদনানের। কণ্ঠে উদ্বেগ।

'রানা কোথায়?'

'ঘুমাচ্ছে,' জবাব দিল সোহানা। 'কেন, আদনান ভাই?'

'নোঙর তুলে ফেলেছে। বন্দর ছাড়ছে মারলিন!'

'তাই নাকি? ঠিক আছে। সম্ভব হলে কোন্দিকে যাচ্ছে দেখেই তুমি ফিরে এসো।'

বিশ মিনিট পর ফিরে এসে রানাকে বারান্দায় পেলেন আদনান। ওঁরই জন্য অপেক্ষা করছে। ওয়েট সুট পরে আছে রানা, মাথায় কালো নিওপ্রিনের হুড। বাড়ির সব বাতি নেভানো। 'পুব-দক্ষিণে যাচ্ছে ওরা,' বললেন তিনি চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে। 'মনে হয়, মার্সেই-র দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ভিলার পিছন দিয়ে যাবে। আর সবাই কোথায়?'

'বোট হাউসে,' বলল রানা। 'চলো যাই।'

একটা ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট বাড়িয়ে দিল ও তাঁর দিকে। ঝটপট ওটা পরে নিলেন প্রফেসর। লম্বা পা ফেলে চলে এলো ওরা বোট হাউসে। মাইলখানেক দূর দিয়ে ঝলমলে আলো জ্বেলে চলে যাচ্ছে রিচি হাওয়ার্ডের ইয়ট, মারলিন।

'যেদিক খুশি চলে যাবে এবার!' বললেন আদনান।

'সেজন্যই ওটাকে চোখের আড়াল করতে চাইছি না,' বলল সোহানা। রওনা হবার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে ও। ওয়াটারপ্রুফ জ্যাকেট পরেছে সোহানা ও জেসিকা। 'গরম কাপড়ের অভাব নেই,' পাওয়ারবোটের ইঞ্জিন চালু করে আবার বলল ও, 'কারও শীত

লাগলে লকার খুলে বের করে নেবে। ঠিক আছে?’

রানার পরনে ভিন্ন পোশাক কেন বুঝতে পারলেন না আদনান। সাগরের তীর ঘেঁষে চলছে পাওয়ারবোট, স্পিড বাড়ছে ক্রমে। দূরে মিটমিট করছে মারলিনের আলো। মাঝে মাঝে হুইলটা অটোতে দিয়ে শক্তিশালী বিনকিউলার চোখে তুলে দেখছে সোহানা ওটাকে। ওর হাবেভাবে বুঝতে পারলেন এখুনি ইয়টের বেশি কাছে যেতে চাইছে না সোহানা। সমান স্পিডে দূর থেকে অনুসরণ করতে চাইছে কেবল। মনে হয়, গভীর রাতে কাছে ভিড়তে চায়। কিন্তু তারপর কী হবে আন্দাজ করতে পারছেন না। কেউ কিছু বলছেও না।

‘বুঝলাম, মারলিনের টপস্পিড বিশ নট,’ বললেন তিনি শেষ পর্যন্ত। ‘পাওয়ারবোট নিয়ে ওটাকে ধরা আমাদের জন্য কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু তারপর, সোহানা? কাছেই তো যেতে পারব না ওটার, দেখে বা শুনে ফেলবে। তা ছাড়া ওদের কাছে অস্ত্র আছে। আর যদি ওদের অজান্তে কাছে যেতে পারিও, ওপরে উঠব কী করে? ঘাস ফড়িং হলে না হয় এক কথা ছিল, লাফ দিয়ে উঠে পড়তাম। ইয়টে চড়াই যদি না যায়, খামোখা ওর পিছু ধাওয়া করে লাভ কী?’

‘আমরা ওটার এতটা কাছে যাব না যাতে দেখতে বা শুনতে পায়,’ বলল সোহানা। ‘চিন্তা কোরো না, আদনান ভাই। চাঁদটা ডুবলেই আমরা কিছুটা কাছে যাব, এই বোটের আওয়াজও খুব কম, তা ছাড়া আজ কালো ঘুড়িটা ব্যবহার করবে রানা।’

ঘুড়ি? এই রাতের বেলা? এমনিতেই শীত, সোহানার কথা শুনে হাত-পা আরও ঠাণ্ডা হয়ে এলো প্রফেসরের। আঁধার সয়ে এসেছে চোখে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন, পাওয়ারবোটের এক পাশে হালকা ডিউর‌্যালিউমিনের তৈরি ঘুড়ির কাঠামোটা বাঁধা রয়েছে। রানার বিশেষ পোশাকের অর্থও বুঝতে পারলেন এতক্ষণে।

‘পাগল হয়ে গেছ তোমরা!’ বললেন তিনি, ‘এ অসম্ভব!’ রানার দিকে ফিরলেন তিনি কিছু বলবেন বলে, কিন্তু তার আগেই পেয়ে গেলেন উত্তর।

'আজই রাতে আমি সবাইকে নিয়ে মারলিনে উঠব বলে ঠিক করেছিলাম,' স্টার্নের উইঞ্চটা পরীক্ষা করছিল এতক্ষণ, ফিরে এসে বলল রানা। 'জেটিতে পেলে সবাই একসঙ্গে যেতে পারতাম, কিন্তু চলন্ত অবস্থায় প্রথমে একজনকে পৌঁছতে হবে ইয়টে—এইটুকুই তফাৎ। চেয়ে দেখো: ঢেউ প্রায় নেই বললেই চলে, টেক-অফ করতে কোনও অসুবিধে নেই; বাতাসটাও চমৎকার—ঠিক যেমনটি দরকার, এক ভাবে বইছে; ফলে কম স্পিডে ফ্লাই করতে পারব। লম্বা টো-লাইন থাকবে, যার ফলে ইয়ট থেকে অনেক দূরে থাকতে পারবে সোহানা।'

'লম্বা... মানে, কতটা লম্বা?'

জবাব দিল জেসিকা। 'সোহানা তো বলছে সাত-আটশো ফুট।'

'কী বললে?'

'ঘাবড়াও মাত, আদনান ভাই। কিছুদিন আগে এক অস্ট্রেলিয়ান দুই হাজার ফুট টো-র সাহায্যে এক হাজার ফুট ওপরে উড়েছে। সেটা অবশ্য দিনে। কিন্তু আমাদের তো আবার আঁধার দরকার। আর, আজকের রাতটাও এ-কাজের জন্যে চমৎকার।'

'ঘাড় মটকাবার জন্যে চমৎকার!' বললেন প্রফেসর। 'কী বলো তুমি! পাকা হাতে বোট সামলাতে হবে, সোহানার হাত অবশ্য ঠিকই আছে, কিন্তু ও তো তোমাকে দেখতেই পাবে না, ডান-বাঁ করবে কীভাবে?'

'আমার সঙ্গে একটা থ্রোট-মাইক থাকবে, সোহানার হেডসেটে থাকবে রিসিভার,' আশ্বস্ত করল রানা। 'কাজেই কোনও অসুবিধে হবার কারণ দেখি না। আমাকে না দেখলেও চলবে, আমিই জানিয়ে দেব কখন কী চাই। আপনাদের অ্যাপ্লায়েড ফিযিক্সে কী বলে—সম্ভব নয়?'

তর্ক করা বৃথা, টের পেয়ে চুপ হয়ে গেলেন প্রফেসর। সবার মুখ ভিজে যাচ্ছে সূক্ষ্ম জলকণা লেগে, একটু পর পর মুছতে হচ্ছে রুমাল দিয়ে। মাঝরাতের দিকে গতি বাড়াল সোহানা।

আরও দু'ঘণ্টা পর মারলিনকে পাশ কাটিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থামল পাওয়ারবোট। ঘুড়ির কাঠামো জোড়া দিয়ে ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে রানা। পশ্চিম আকাশের সরু চাঁদের তির্যক আলোয় আরও কালো দেখাচ্ছে ভূমধ্যসাগর। মাইল তিনেক পিছনে রয়েছে মারলিন। সব বাতি নিভিয়ে এখন শুধু ন্যাভিগেশন লাইট জ্বেলে এগিয়ে আসছে।

গগল্‌স্‌ পরে নিয়ে বোটের কিনার থেকে নেমে গেল রানা পানিতে। সোহানার নির্দেশে টেরিলিনের পালটা খুলে দিলেন আদনান। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুড়ি ভেসে উঠল বোটের পিছনে। পালের নীচে ঝুলন্ত বারটা ধরল রানা। আসল কাজ শুরুর আগে একটু প্র্যাকটিস করে দেখে নেবে সবকিছু ঠিক মত কাজ করছে কি না। ঘুড়িতে বা যোগাযোগব্যবস্থায় অসুবিধা না থাকলে হারনেস খুলে ফেলবে ও, ট্রাপিয বারে ঝুলে থাকবে। রানার নির্দেশ পেলে চলন্ত মারলিনের এক-দেড়'শ গজ কাছে চলে যাবে সোহানা বোট নিয়ে। ইয়টের কোর্সের সঙ্গে চল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে পাওয়ারবোট বাতাসের বিপরীতে চলবে, যাতে নামতে পারে রানা ইয়টের ডেকে।

মহড়া দেয়ার জন্য চলতে শুরু করল পাওয়ারবোট। খানিক পরেই পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল মারলিন। ন্যাভিগেশন লাইট ছাড়াও হুইলহাউসে আবছা আলো দেখা গেল। এক বা দুজন লোক থাকবে হয়তো হুইলহাউসে, তবে তাদের পিছন ফিরে তাকানোর সম্ভাবনা খুবই কম।

পাওয়ারবোটের পিছনে প্রায় চল্লিশ ফুট উপরে উঠে গেছে ঘুড়িটা, দেখা যায় কি যায় না। রিসিভারে কিছু নির্দেশ এলো, থ্রটল আরও খুলে দিল সোহানা। স্লালোম স্কি পরা রানাকে এখন ছায়ার মত আবছা দেখা যাচ্ছে। কিছুদূর স্কি করে এগোবার পর সারফেস ছেড়ে উঠে পড়ল ও শূন্যে।

সোহানা চেঁচিয়ে বলল, 'রশি ছাড়ো!'

উইঞ্চ কন্ট্রোলের হাতল চেপে ধরলেন প্রফেসর, আস্তে আস্তে

ছাড়তে শুরু করলেন টো-লাইন। কী ঘটছে জানার জন্য অস্থির হয়ে রয়েছে জেসিকা, কিন্তু স্থির হয়ে বসে আছে মূর্তির মত—কথা বললে পাছে সোহানা বা আদনানের মনোযোগ ছুটে গিয়ে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যায়!

পাওয়ারবোটের দুইশ' গজ পিছনে সাগর থেকে দেড়শ' ফুট উপরে উঠে পড়েছে রানা। বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওর মুখ, কিন্তু ওয়েট-সুটের ভিতর শরীরটা গরম।

'বাম দিকে স্লালোম করব এবার, সোহানা,' বলল ও থ্রোট-মাইকে। 'শুরু করলাম।'

বার ধরা হাত সরিয়ে শরীরের ওজন খানিকটা বামে চাপাল রানা। বামদিকে গোত্তা খেয়ে নামতে শুরু করল বিশাল ঘুড়ি। স্কি জোড়া যখন পানির একেবারে কাছে চলে এলো, তখন ডাইনে চাপাল ওজন, মুখে বলল, 'ওপরে!' রানাকে নিয়ে এবার উঠতে শুরু করল ঘুড়ি, সেই সঙ্গে সরে যাচ্ছে ডাইনে। এইরকম বার কয়েক এদিক-ওদিক করে একটা আন্দাজ এসে গেল ওর দূরত্ব ও হাওয়ার গতি সম্পর্কে। বলল, 'ঠিক আছে, সোহানা। এইবার এগোও।'

ভাও বুঝতে বুঝতে হারিয়ে ফেলেছে রানা ইয়টটাকে। সাবধানে স্পিড বাড়াল সোহানা। কিছুক্ষণ চলার পর আবার ন্যাভিগেশন লাইট দেখতে পেল ও মাইলখানেক সামনে, কিছুটা ডাইনে।

কাছাকাছি গিয়ে ল্যাণ্ড করার জন্য তৈরি হয়ে নিল রানা। স্কি দুটো ফেলে দিয়ে হারনেস খুলে বার ধরে ঝুলে পড়ল দড়াবাজের মত। অল্পক্ষণেই প্রায় ধরে ফেলল সোহানা মারলিনকে, এবার ওটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবে একপাশ দিয়ে। রানা সামান্য কাত হয়ে পোর্ট কোয়ার্টারের দিকে যাচ্ছে শুনে সোহানাও সেই অনুযায়ী বাঁক নিল, যাতে রানা যখন পিছনের ডেকে পৌঁছাবে ঠিক তখন টো-রোপটা ইয়টের স্টার্ন ও পাওয়ারবোটের সঙ্গে এক লাইনে থাকে।

রানার কণ্ঠ ভেসে এলো, 'আর একটু আস্তে, সোহানা। আরও ওপরে ভাল বাতাস আছে, তুমি দশ নটে নেমে যেতে পারো। গুড,

এবার একটু ডানদিকে। হ্যাঁ, এইভাবে ধরে রাখো। নামছি...'

শরীরের ওজন ডাইনে চাপাল রানা, বাঁকা হয়ে নেমে আসছে ইয়টের পিছনে ডেকের দিকে। পঁচিশ ফুটে নেমে এসে টের পেল মারলিন এগিয়ে আছে কিছুটা, আরেকটু বামেও সরতে হবে। 'থ্রটল, সোহানা। সামান্য। ঠিক আছে। ব্যস, আর না।'

ওপর থেকে ছোট্ট দেখাচ্ছিল আফটারডেক, কাছে এসে মস্ত লাগছে এখন। পিছনের রেইল টপকে ডেকের উপর চলে এলো ওর পা দুটো, এখনও বেশ অনেকটা উপরে; এখুনি নেমে না পড়লে স্টারবোর্ডের রেইল ডিঙিয়ে সাগরে গিয়ে পড়বে। শোধরানোর কোনও উপায় নেই। ঘুড়িটা একটু কাত করেই হাত ছেড়ে দিল ও বার থেকে, মুখে বলল, 'ওপরে, সোহানা!'

ঘুড়িটা চলে গেল উপরে। শরীরটা প্রায় গোল করে দুটো ডিগবাজি খেয়ে উপুড় হয়ে থামল রানা সেলুনের দেয়াল ঘেঁষে। এক মিনিট চুপচাপ পড়ে রইল ওখানে, কান খাড়া করে শুনছে কোথাও কোনও শব্দ হয় কি না; কচ্ছপের মত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে কোনও নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যায় কি না। এবার মাইকটা কণ্ঠনালির সঙ্গে ঠেসে ধরে বলল, 'নখ কামড়ানো বন্ধ করতে বলো জেসিকাকে, পৌঁছে গেছি। তোমরা একটু দূরে সরে গিয়ে অপেক্ষা করো, আবার যোগাযোগ করতে আমার কিছুটা দেরি হতে পারে।'

ওয়েট-সুটের যিপ কিছুটা খুলে ক্লিপ দিয়ে আঁটা ট্র্যান্সমিটারের সুইচ অফ করে দিল রানা। খারাপ ল্যাণ্ডিঙের জন্য ডেকে ঘষা খেয়ে বাম গাল কিছুটা ছড়ে গেছে, হাত তুলে একটু আদর করে নিল জায়গাটা। বার কয়েক খুলে বন্ধ করে আঙুলগুলোর আড়ষ্টতা দূর করল। তারপর ঊরুতে বাঁধা নিওপ্রিনমোড়া একটা প্যাকেট খুলল। ওটার ভিতর থেকে বেরোল ওর প্রিয় ওয়ালথার পিপিকে, ছোট একটা বাক্সে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ, কিছু ওষুধ, এক রোল সার্জিকাল টেপ আর ইথার ভরা একটা অ্যারোযল স্প্রে। উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ পায়ে সেলুনের কোণ ঘুরে এগোল ও সামনে।

আধমাইল বামে, ইয়টের পাশাপাশি একই গতিতে চলছে পাওয়ারবোট। প্রায় নিঃশব্দে।

'আমরা কখন ইয়টে উঠব, সোহানা?' জানতে চাইল জেসিকা।

'রানা ডাকলেই যাব আমরা। এই ধরো, আর আধঘণ্টা। আগে ক্রু-দেরকে সামলাতে হবে। ওরা আছে মোট আটজন।'

'এত লোকের বিরুদ্ধে রানা একা! খুব কঠিন...'

'না-না। কঠিন ছিল ইয়টে পৌঁছানো। সেই কাজটা হয়ে গেছে। রিচি আর লুকাস থাকে ওপরের দুটো ডেক-কেবিনে; বাকি সবাই ঘুমায় নীচের হোল্ডে। ইয়টের কোথায় কী আছে, সব মুখস্থ রানার। সঙ্গে প্রত্যেকের জন্যে উপহার নিয়ে গেছে ও—এক গজ করে প্লাস্টার, আর একটা বোতলে করে খানিকটা ক্লোরোফর্ম। ওতেই ঠাণ্ডা থাকবে ওরা।'

ছয়

ঘুম জড়ানো চোখ মেলল রিচি হাওয়ার্ড। ওর কাঁধ ধরে কে যেন ঝাঁকাচ্ছে। খেঁকিয়ে উঠল সে, 'অ্যাই! কী হয়েছে? কোন্ শালা...'

ক্লিক করে শব্দ হলো মৃদু। বাতি জ্বলে উঠল কেবিনে। একটা থ্রিটু ক্যালিবারের ওয়ালথার পিপিকে-র নাকের সিঙ্গেল ফুটো চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। চোখ মিটমিট করার পরও যেমন ছিল তেমনি রইল ওটা, মিলিয়ে গেল না। পিস্তলের ফুটো থেকে রিচির দৃষ্টি সরে পিছনে দাঁড়ানো কালো ওয়েট-সুট পরা লোকটার মুখের উপর স্থির হলো।

ধড়মড় করে উঠে বসতে যাচ্ছিল, নাকে-মুখে পিস্তলের গুঁতো

খেয়ে শুয়ে পড়ল আবার। রানা! মাসুদ রানা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর সামনে পিস্তল হাতে। চেয়ে যে রয়েছে, চাখ দুটো যেন ঠাণ্ডা, নীলচে বরফের দুই টুকরো। কী ঘটছে এসব? বড়লোক সোহানার পেছন পেছন সারাক্ষণ খোদাই ষাঁড়ের মত ঘোরে গুড ফর নাথিং ভাঁড়টা। ও এখানে কেন? এলোই বা কী করে!

কয়েক সেকেণ্ড বোঝার চেষ্টা করল রিচি কী ঘটছে, আরও কয়েক সেকেণ্ড ব্যয় করল সে ওর মিথ্যার ঝুলি হাতড়ে; বুঝতে পারছে না ঠিক কী বলে নিস্তার পাবে। আস্তে করে বাম হাত বাড়াল একটা বোতামের দিকে।

মাথা নাড়ল রানা। নরম গলায় বলল, 'কোনও লাভ নেই, রিচি। হুইলের লোকটা ছাড়া বাকি সব ক'জন ঘুমিয়ে। বেল বাজিয়ে ঘুম ভাঙাতে পারবে না ওদের কারও। বারণ করা সত্ত্বেও যদি বোতামে আঙুল ছোঁয়াও, গুলি করে তোমার হাত ফুটো করে দেব আমি। সত্যিকারের গুলি, সেদিনকার মত লুকাসের ছোড়া ফাঁকা গুলি না। ব্যাগে ভরা শুয়োরের রক্তের দরকার পড়বে না, কারণ প্রচুর রক্ত বেরোবে তোমার নিজের শরীর থেকেই।'

ওর চেহারা দেখে রানা বুঝতে পারল, ঘুমের ঘোর পুরোপুরি কেটে গেছে রিচির। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিল তাড়াতাড়িই। চোখ সরু করে তাকালো রানার দিকে। কঠিন সুরে বলল, 'মস্ত বিপদে পড়েছ, মিস্টার মাসুদ রানা। টের পাচ্ছ? অন্যের ইয়টে অনুপ্রবেশ, জোর-জুলুম, সশস্ত্র ডাকাতি...'

'নষ্ট করবার সময় নেই আমার হাতে, রিচি,' বলল রানা। 'তোমাদের অনুকরণ করেই বলছি: *মন দিয়ে শোনো, প্লিজ। যা বলার একবারই বলব।* আমি জানি, তুমি নও, লুকাস ম্যাকপিলই আসল বস্। চেক করে দেখেছি, ও-ই ভাড়া নিয়েছে ইয়টটা। ওরই পরিকল্পনামাফিক ছিনতাই হয়। প্লেবয় হিসাবে তোমাকে রাখা হয়েছে সামনে। অভিনেতা। ঠিক একইভাবে ডাকাতি করেছ তোমরা স্মেরালডা, নিস এবং বন্দর ছাড়াও আরও কয়েক শহরে। তোমার

মত একই ভাবে ফাঁকা গুলি খেয়ে মেঝেতে আছড়ে পড়েছিল অঘটন ঠেকাবার জন্য দাঁড় করিয়ে রাখা লোকটা, কারও সাহস হয়নি বাধা দেয়ার।' এই পর্যন্ত বলে থামল রানা। খাটের পাশে রাখা একটা লকারের উপর বসল। পিস্তলটা স্থির রয়েছে রিচির পেট বরাবর।

'এবার কিছুটা অনুমান করব। স্মেরালডার পুনরাবৃত্তি করার খায়েশ হলো লুকাসের, তোমাকে বলল বন্দরের সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে। ভয় পেলে তুমি। রিচি হাওয়ার্ডের পার্টিতে দ্বিতীয়বার ডাকাতি হলে কারও মনে সন্দেহ জাগতে পারে। অনেক কাকুতি-মিনতি করলে, কিন্তু তোমার আপত্তিতে কান দিল না লুকাস, লোভে অন্ধ হয়ে গেছে সে তখন। কেটে পড়ার সাহস নেই তোমার, সে-জন্যই ওকে খুন করবার প্ল্যান করেছিলে তুমি সেদিন বোলেদর রেস্তোরাঁর কার-পার্কে। ওই দুই গুণ্ডাকে নিয়োগ করেছিলে তুমিই। কিন্তু কিছু না জেনে প্রফেসর আদনান মুস্তফি বাঁচিয়ে দিল ব্যাটাকে। ফলে দ্বিতীয়বার একই কায়দায় ডাকাতির আয়োজন বাতিল করা গেল না।'

একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে রানা রিচির চোখের দিকে। ওর চেহারা দেখেই অনুমানের সত্যতা টের পেল। কপালের চিকন ঘাম এখন ফোঁটায় ফোঁটায় নামছে গাল বেয়ে।

'পুলিশকে খবর দিলাম আমি, তোমার মুখ শুকিয়ে গেল। তোমার ভয়, ধরা পড়লে মুখ খুলতে পারে দুই গুণ্ডা পুলিশের কাছে; আর তা হলে বারোটা বাজাবে তোমার লুকাস ম্যাকপিল। কাজেই ক্লাউনের ভূমিকায় নামতে হলো তোমাকে—আমরা সরে যেতেই রিভলভারটা হাত থেকে ফেলে পালাবার সুযোগ করে দিলে ওদেরকে। তোমার ওই গপ্পো সোহানা বা আমি কেউই বিশ্বাস করিনি। তারপর যখন দেখলাম, আবার সেই সাগর-পারের পার্টি থেকে একই কায়দায় ছিনতাই হচ্ছে, তোমার হাতের মাংস ফুটো করে বুলেট বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আর কারও গায়ে লাগছে না, জখমটা দেখাতে তোমার মহা আপত্তি—তখন বুঝতে কিছুই বাকি

থাকল না আর।'

রিচির গলা শুকিয়ে কাঠ, ঢোক গিলল, তারপর মিন মিন করে বলল, 'প্রমাণ করতে পারবে এসব? কোর্টে দাঁড়িয়ে?'

'প্রমাণ করতে যাবই না,' বলল রানা। 'লুকাস আসলে তোমার বস্। যমের মত ভয় পাও তুমি ওকে। আমি যদি ওকে শুধু বলি, তুমিই ওকে খুন করার ব্যবস্থা করেছিলে; ও কি কোনও প্রমাণ চাইবে? আমার প্রমাণ করতে হবে না, রিচি, ও নিজেই বুঝে নেবে কেন কী ঘটেছিল।'

মনে হলো কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল রিচি। ভয়ে কুঁচকে গেছে চেহারাটা। মেনে নিয়েছে পরাজয়। বলল, 'বিনিময়ে তুমি যদি কিছু চাও, আমি রাজি। কী চাও তুমি, মাসুদ রানা?'

'একটু সহযোগিতা, রিচি,' বলল রানা। 'সেইসঙ্গে লুটের মাল, অবশ্যই।'

সাগরের দোলায় দুলছে ইয়ট। ইঞ্জিন বন্ধ।

হুইলহাউসের লোকটা ঘুমাচ্ছে বেঘোরে। সার্জিকাল টেপ দিয়ে হাতদুটো বাঁধা, পা বাঁধা নাইলনের দড়ি দিয়ে। পাওয়ারবোট এখন সেঁটে আছে ইয়টের গায়ে, রানা গ্যাংওয়ে নামিয়ে দিতেই উঠে এসেছে সোহানা, আদনান ও জেসিকাকে নিয়ে। সোহানা এগিয়ে এসে রানার গালটা পরীক্ষা করল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

পাংশু চেহারা নিয়ে রানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে রিচি হাওয়ার্ড।

'ভাগ্যিস জেসিকাকে সঙ্গে এনেছিলাম,' বলল রানা। 'তা নইলে আমাদের সব খাটনি আজ বরবাদ হয়ে যেত।'

'লুটের মাল কি ইয়টে?' জানতে চাইলেন আদনান।

'হ্যাঁ। কিন্তু ভজকট করে ফেলেছি, আদনান ভাই।' বিরক্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'কী রকম?'

'এখন দেখছি নাটের গুরু আসলে লুকাস। এইট্টা,' বুড়ো আঙুল

দিয়ে রিচিকে দেখাল রানা, 'ওর ভেড়া। এদের কাউকে বিশ্বাস করে না লুকাস, একমাত্র ও-ই জানে কোথায় রাখা আছে লুটের মাল। আমি এ-ব্যাটাকে সর্দার মনে করে আগেই অজ্ঞান করে দিয়েছি লুকাসকে ইঞ্জেকশন দিয়ে। একটানা কয়েক ঘণ্টা ঘুমাবে ও, কিন্তু অত সময় আমাদের হাতে নেই। অবশ্য জেগে থাকলেও ওর কাছ থেকে কথা আদায় করা যেত কি না সন্দেহ আছে।'

'তা হলে কি চোরের ওপর বাটপারি করতে এসে খালিহাতে ফিরতে হবে আমাদের?' হতাশ কণ্ঠে জানতে চাইলেন প্রফেসর।

'না। আমাদের সঙ্গে জেসিকা আছে না? সবকিছু নির্ভর করছে এখন ওর ওপর। গোটা ইয়ট সার্চ করতে হলে পুরো এক সপ্তাহ লেগে যাবে—অথচ আর একটা ঘণ্টাও এখানে থাকা আমাদের জন্য নিরাপদ নয়।' জেসিকার দিকে ফিরল এবার রানা। 'এবার তা হলে কাজে লেগে যাও, জেসিকা। তুমি যদি লুটের মাল খুঁজে না পাও, বিফল হয়ে ফিরতে হবে আমাদের।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জেসিকার মুখ, ভেজা কপাল থেকে পানির কণা মুছল হাতের পোঁছায়। আনন্দ গোপন করতে জানে না ও। হাসছে খিল খিল করে। এত আনন্দ, এত খুশি ওর মধ্যে খুব কমই দেখেছেন আদনান।

'অনেক সোনা ছিল ওখানে,' বলল জেসিকা। 'কাজেই আমার খুঁজে পাওয়া উচিত। কিন্তু দুটো তামার রড বা টিউব লাগবে যে।'

'আমি একটা আর্থিঙের তার পেয়েছি স্টোরে, দেখো তো এতে কাজ হবে কি না?' বলে দুই সুতা ব্যাসের আড়াই ফুট লম্বা একটুকরো তামার তার বাড়িয়ে ধরল রানা।

ওটা হাতে নিয়ে জেসিকা বলল, 'এটাকে দুই ভাগ করে দিতে পারলে সুবিধে হতো।'

'এক্ষুনি অর্ধেক করে দিচ্ছি,' বলে পকেট থেকে চার ফলার একটা সুইস অফিসার্স নাইফ বের করল রানা।

'কিছুটা ছোট-বড় রেখো,' বলল জেসিকা।

প্রথমে ছুরি দিয়ে চেষ্টা করে হলো না যখন, রেত ও করাতের ফলা চালিয়ে দুই খণ্ড করে ফেলল রানা তারটাকে। একটা খণ্ড সতেরো ইঞ্চি, অপরটা তেরো।

স্টারবোর্ড রেইলের কিনার থেকে শুরু করল জেসিকা। ধীর পায়ে এগোচ্ছে। দুই হাত সামনে বাড়ানো, তামার তার দুটোও সামনের দিকে তাক করা। কী হয় দেখবে বলে উদগ্র আগ্রহ নিয়ে সবাই চলেছে ওর পিছন পিছন। ওর এই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কথা অনেকদিন আগে শুনেছে রানা সোহানার কাছে। কয়েকটা গোল্ড-মাইন প্রসপেক্টর কোম্পানির হয়ে চুক্তি-ভিত্তিতে কাজও করেছে জেসিকা বিয়ের আগে।

তিন-চার ফুট সরে সরে লম্বালম্বি ভাবে দুইবার আসা-যাওয়ার পর তৃতীয়বার ইয়টের মাঝামাঝি এসে জেসিকার হাতের তার দুটো সরে গিয়ে গুণ-চিহ্নের আকৃতি নিল। থেমে দাঁড়াল ও। চেহারায় গভীর মনোনিবেশের ছাপ। সামান্য ডাইনে সরে পা ঠুকল ও ডেকের উপর।

'এইখানে, রানা। দশ ফুট নীচে। একটু কমও হতে পারে।'

'এর নীচে কী, রানা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'চলো, দেখি গিয়ে।'

প্রফেসরকে একটু পর পর ডেকের ওই জায়গাটায় জুতো দিয়ে শব্দ করতে বলে বাকি সবাই নেমে গেল নীচে। দেখা গেল, ওখানে একটা বাল্কহেড। পার্টিশনের একপাশে এয়ার-কণ্ডিশনিং ইউনিট, অন্য পাশে পেইন্ট স্টোর ও ওঅর্কশপ। খুব ধীরে একইঞ্চি-দু'ইঞ্চি করে এগোচ্ছে এখন জেসিকা। আবার গুণ-চিহ্ন তৈরি করল তামার তার। বাল্কহেডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল জেসিকা।

'এইখানে,' বলল সে। 'ডেক লেভেলে।'

'বাল্কহেডের নীচের দিকে একটা ভেন্টিলেটার গ্রিড দেখা যাচ্ছে,' বলল সোহানা। 'তোমার পায়ের কাছে। রানা, দেখো তো, একটা স্ক্রুড্রাইভার পাওয়া যায় কি না।'

ইতিমধ্যে নেমে এসেছেন প্রফেসর। চটপট চারটে স্ক্রু খুলে ফেললেন তিনি। গ্রিড সরিয়ে হাত বাড়িয়ে শাফ্‌টের ভিতর থেকে চামড়ার একটা ব্যাগ বের করে আনলেন। ওর ভিতর তুলো দিয়ে মুড়ে থরে থরে সাজিয়ে রাখা আছে লুঠ করা সমস্ত অলঙ্কার। 'বের করে ফেলেছ, ডার্লিং!' বললেন তিনি নিচু, কাঁপা গলায়।

জেসিকার গাল দুটো কুঁচকে গেল, পানি এসে গেল চোখে। কিন্তু এ-কান্না আনন্দের। এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে হা-হা করে হেসে উঠলেন প্রফেসর প্রাণখোলা হাসি।

ব্যাগের ভিতরটা নেড়েচেড়ে দেখল সোহানা। একনজরেই অনেকগুলো অলঙ্কার চিনতে পারল ও। মাথা ঝাঁকাল রানার দিকে চেয়ে।

'এবার কী, রানা?' চট্‌ করে ওর হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল রিচি হাওয়ার্ড।

'তোমার কেবিন,' বলল রানা। ইশারা করল পিস্তল দিয়ে। 'আমরা চলে যাচ্ছি এখন। তুমি চাইলে লুকাসকে যেমন দিয়েছি, তেমনি এক ডোজ বারবিচুরেট পুশ করতে পারি তোমার শরীরে। আটজনের মধ্যে কেউ না কেউ জেগে উঠে মোচড়ামুচড়ি করে খুলে ফেলবে বাঁধন, তারপর মুক্ত করবে বাকি সবাইকে। সেটাই বোধহয় কিছুটা নিরাপদ হবে তোমার জন্য, কী বলো?'

মাথা ঝাঁকালো রিচি। এগোল দরজার দিকে।

সাত

পনেরো মিনিটের মধ্যেই আকাশের গায়ে মারলিনের সিলুয়েট আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেল। পাওয়ারবোটের হুইল আবার সোহানার

হাতে। দুলন্ত ভূমধ্যসাগরের পিঠ চিরে দিয়ে তীর বেগে ছুটছে ওদের বোট উত্তর-পশ্চিম বরাবর। হুড খুলে ফেলেছে সোহানা। বাতাসে উড়ছে ওর দীর্ঘ চুল। ওয়েট সুট পাল্টে লকার থেকে গরম কাপড় বের করে পরেছে রানা। মস্ত বড় একটা হাই তুলে সিটের পিছনটা নামিয়ে দিয়ে এখন শোয়ার তাল করছে।

'মনে হচ্ছে, স্বপ্নের মধ্যে আছি!' বললেন আদনান, 'সুখস্বপ্ন। আজই কি লুটের মাল সব তুলে দেবে পুলিশের হাতে?'

'নাহ্!' জবাব দিল সোহানা, 'পুলিশের ধারে-কাছেও যাব না।'

'তা হলে? ওদের শাস্তি হবে না?' জানতে চাইল জেসিকা।

'শাস্তি শুরু হয়ে যাবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। খোয়া গেছে লুটের মাল, কিন্তু কেউ জানে না কীভাবে, এটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার নয়। রিচি ছাড়া সবাই মনে করবে ওদেরই ভেতর কেউ করেছে কাজটা। কিন্তু কাউকে দিয়ে স্বীকার করানো যাবে না কার কাজ। কেউ কারও কথা বিশ্বাস করবে না, সবাই সন্দেহ করবে সবাইকে, ফলে ভেঙে যাবে দল। আমরা মাঝ-সাগরে চড়াও হয়ে নিয়ে এসেছি ব্যাগ, এই গল্প লুকাস ম্যাকপিলকে শোনাবার সাহস হবে না রিচির।' একটা হাই তুলল সোহানা, তারপর বলল, 'তোমরা একটু গড়িয়ে নাও। সবাই মিলে রাত জাগার কোনও মানে হয় না।'

'ঠিক বলেছ,' বললেন আদনান। 'কিন্তু মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন ঘুরপাক খেলে ঘুম আসবে কী করে, শুনি?'

'কী প্রশ্ন, আদনান ভাই?'

'পুলিশের কাছে যাবে না বলছ, তা হলে এই অলঙ্কারগুলোর কী হবে? মালিকেরা তাদের জিনিস ফেরত পাবে না?'

'নিশ্চয়ই পাবে। শোনো, দু'চার দিন পর তুমি আর জেসিকা এই ব্যাগটা খুঁজে পাবে, ধরো, কোনও সাগর-সৈকতে। এমন এক জায়গায় পাবে, যেখানে প্রচুর লোকজন আছে; আর এমন এক সময়ে, যখন ধনী ক্লায়েন্টদের চাপাচাপিতে ইনশিওরেন্স কোম্পানিগুলো সবাই মিলে ওগুলোর উদ্ধারকারীকে অন্তত এক লাখ

ডলার পুরস্কার দেবে বলে ঘোষণা করবে। এবার ক্লিয়ার?'

'কীসের ক্লিয়ার? আরও তো এলোমেলো হয়ে গেল সব! দাঁড়াও। আগে শুনি, এর মধ্যে পুরস্কার আসছে কী করে?'

'দেয় সবাই। অন্তত দশ পার্সেন্ট তো দিতেই হবে। তা না হলে আমরা ওগুলো ফেরত দিতে দেরি করব।'

'বুঝলাম, ব্ল্যাকমেইলিং। এবার শোনা যাক, লোকজন থাকতে হবে কেন?'

'ওরা সাক্ষ্য দেবে, সত্যিই তোমরা ব্যাগটা বালির নীচ থেকে খুঁড়ে তুলেছ। তোমাদের হই-চই শুনে ভিড় করে ঘিরে ধরবে মানুষ, ছবি তুলবে মুহুর্মুহু। যাদের মাল খোয়া গেছে, তারা ছুটে আসবে; সাংবাদিক এসে ছেঁকে ধরবে, বীমা কোম্পানিগুলো আসবে, পুলিশ আসবে—রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবে তোমরা। তারপর পুরস্কারের ট্যাক্স-ফ্রি এক লাখ ডলার পকেটে পুরে হাসতে হাসতে চলে যাবে লণ্ডন।'

'অ্যাঁ?' শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল জেসিকা, লাফিয়ে উঠে বসল। 'পুরস্কারের টাকা আমাদের পকেটে আসবে কেন?'

'তা হলে কার পকেটে যাবে শুনি?' পাল্টা প্রশ্ন করল সোহানা। তারপর ব্যাখ্যা করল, 'তুমি লুকাসকে চিনিয়ে দাওনি? তুমিই লুটের মাল খুঁজে বের করোনি? যা বলছি, সত্যি কি না? তোমাকে ছাড়া কোনদিনই পেতাম না আমরা অলঙ্কার। ওদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ না থাকায় আজকের অ্যাডভেঞ্চারের ফলে ওরা আইনের আশ্রয় নিলে মস্ত বিপদে পড়তে পারতাম আমরা। তাই না, রানা?'

কোনও জবাব নেই। আরে! ঘুমিয়ে পড়ল নাকি মানুষটা!

সামনে ঝুঁকে ভাল করে দেখলেন আদনান রানার মুখটা। 'হায়, খোদা! বেঘোরে ঘুমাচ্ছে! মানুষ, না পিশাচ?' আগেও ঘুমন্ত রানাকে দেখেছেন তিনি। ঘুমালে ওর মুখটা শিশুর মত হয়ে যায়। আজ আরও বাচ্চা দেখাচ্ছে। এলোমেলো চুল, গালে ছড়ে যাওয়ার দাগ; শুয়ে আছে, ঠিক যেন ক্লান্ত এক পথকলি। পরিষ্কার বুঝতে পারছেন,

জেসিকা আজ বাজারে গিয়ে লুকাসকে চিনতে পেরেছে শুনেই ওঁদের পুরস্কার পাইয়ে দেওয়ার প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছিল এই রহস্যময় যুবক। আশ্চর্য একটা মমতা বোধ করলেন তিনি মহৎপ্রাণ এই মানুষটার প্রতি। ফিরলেন সোহানার দিকে।

'বেশ, বুঝলাম, জেসিকা খুঁজে বের করেছে জুয়েলারির ব্যাগ। কিন্তু রানা আমাদের নিয়ে গিয়েছিল। নিজের ঘাড় মটকাবার ঝুঁকি নিয়ে ঘুড়িতে করে নেমেছে ডেকে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'তা ঠিক। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছিল ও। যদি সাহস থাকে তবে পুরস্কারের অর্ধেক টাকা ওকে সেধে দেখতে পারো। আমার বিশ্বাস, সেইটাই হবে তোমাদের শেষ দেখা।'

তিন দিন পর প্রফেসর আদনান মুস্তফি স্ত্রীকে নিয়ে একদল টুরিস্টের সঙ্গে একটা ট্রাভেল এজেন্সির আয়োজন করা প্যাকেজ ট্যুরে গেলেন সাঁ মিগুয়েল বিচে। বেলা এগারোটার দিকে বিচে পড়ে থাকা একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসিয়ে স্ত্রীর ছবি তুলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল জেসিকা, 'আরে! এটা কী! সাপ নাকি?'

উপস্থিত সবার চোখ ঘুরে গেল অন্ধ মেয়েটির দিকে। ও তখন একটা দড়ি ধরে টানছে। দেখা গেল, পাথরের পাশে একটা বালি আর আলগা নুড়ি ভর্তি খাঁজে প্রায় দুই ফুটের মত চলে গেছে দড়িটা। সেটার শেষ মাথায় বাঁধা একটা চামড়ার ব্যাগ বেরিয়ে এল বাইরে।

ওর ভিতর কী আছে দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। যখন দামি সব গহনা বেরোতে শুরু করল, হুলুস্থূল পড়ে গেল চার পাশে। মোবাইলে খবর দিচ্ছে সবাই এদিক-ওদিক। কেন ডাকাতরা কদিন আগে লুট করা মাল এইখানে এনে লুকিয়ে রাখল, তাই নিয়ে নানান অনুমান বেরিয়ে এলো নানান জনের মাথা থেকে।

ভণ্ডুল হয়ে গেল সৈকতভ্রমণ। সবাই মিলে ব্যাগ নিয়ে হাজির হলো গিয়ে পুলিশ-স্টেশনে।

ঠিক সেই সময়ে ভিলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছে রানা, হাতে পেপার। সপাৎ সপাৎ স্যাণ্ডেলের আওয়াজ কানে আসতেই ঘাড় ফিরিয়ে চাইল।

উজ্জ্বল কমলা রঙের সুইম-সুট পরেছে সোহানা, চুলগুলো ঘাড়ের পিছনে বাঁধা। সাঁতার কাটবে সাগরে। রানাকে কোমরের ধাক্কায় একপাশে সরিয়ে দিয়ে নিজের জন্য জায়গা বের করে নিল সোহানা। একটু বাঁকা হয়ে মুখোমুখি হলো রানার। ওর দুই কাঁধে হাত রেখে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইল রানার মুখের দিকে। কী যেন বলতে চায়, কিন্তু দ্বিধা করছে।

আরও একটু সরে সোহানাকে আরাম করে বসার জায়গা দিল রানা। সোহানা বলল, 'এই এক লাখ ডলার পেয়ে আদনান ভাই আর জেসিকা ধারদেনা শোধ করে সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারবে আবার। তার পরেও আরও কিছু থেকে যাবে হাতে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। একটু পর আবার বলল সোহানা, 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, কিছু মনে করবে?'

হাসল রানা। 'কবে কী মনে করেছি?'

'কদিন ধরে ভাবছি, তুমি আমাকে কিছুই বলোনি কেন। তুমি জানতে, ওই রাতে ডাকাতি হবে, কারা করবে তা-ও জানতে, তাই না?'

সোহানার চোখে চোখ রাখল রানা, 'তুমি টের পাওনি?'

'জেসিকা লুকাসের গন্ধ পাওয়ার আগে বুঝিনি। সেদিন বুঝলাম, ওটা তোমার জন্য নতুন কোনও খবর ছিল না। তখনই মনে হলো, তুমি আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলে ওদের।'

'সেই রাতে বোলেদর রেস্তোরাঁয় যা যা ঘটেছে, এভাবে ছাড়া আর কোনও ভাবে মিলছিল না,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, আমি জানতাম পার্টিতে ছিনতাই হবে। ভেবেছিলাম, দু'চারদিন অপেক্ষা করে প্রমাণ করে দেব, এজন্য দায়ী রিচি গং। ভাবছিলাম, প্রমাণটা জেসিকা আর

আদনান ভাইকে দিয়ে কী করে করানো সম্ভব। কিন্তু জেসিকা লুকাসকে চিনে ফেলায় ক্রেডিটটা ওর ওপর চাপানো সহজ হয়ে গেল। মারলিন যে কবে কখন রওনা হবে, তা-ও জানা ছিল আমার। আদনান ভাই স্বচক্ষে সেটা দেখে আসায় ভাল হয়েছে।'

মৃদু হাসল সোহানা। 'সেজন্যই পাওয়ারবোটে যা যা প্রয়োজন সব রেডি করে রেখেছিলে আগে থেকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'রিচি জানত কোথায় ব্যাগটা আছে, তাই না?'

আবার মাথা ঝাঁকাল ও। 'এটাও বুঝে ফেলেছ?'

'লুকাসকে কয়েক ঘণ্টার জন্য ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয়েছে তোমার জেসিকাকে ওগুলো আবিষ্কারের সুযোগ দেয়ার জন্য। ঠিক?'

'হ্যাঁ। রিচি জানত লুকাসের কেবিনে লকারে রাখা আছে লুটের মাল। আমার খুঁজতে হয়নি। যখন বলেছি দুই গুণ্ডা ভাড়া করে লুকাসকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনার কথাটা আমার জানা আছে, লুকাসও জানবে সহযোগিতা না করলে, তখন সুড়সুড় করে আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে জায়গাটা।'

'তা হলে তুমিই ওটা নিয়ে গিয়ে গ্রিডের ভিতর শাফটে রেখেছিলে জেসিকাকে দিয়ে আবিষ্কার করাবে বলে?'

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। 'সবই দেখছি তুমি জানো, সোহানা। সে-কথা আমাকে বলোনি কেন? এ কটা দিন শুধু শুধুই আমি অপরাধবোধে ভুগলাম!'

অবাক হলো সোহানা। 'বা রে, তুমি আমাকে বলোনি বলেই আমিও কিছু বলিনি। ডাকাতির ব্যাপারে আমি শিওর ছিলাম না, কিন্তু যদি হয়, তা হলে পুরস্কারের পরিমাণ যেন বাড়ে, সেজন্যই তোমার দেয়া মালাটা আমি হাতছাড়া করেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি, তুমি আমার উদ্দেশ্য টের পেয়েছিলে বলেই চট্ করে রাজি হয়েছিলে মালাটা জেসিকাকে পরাবার ব্যাপারে।' মাথাটা একটু নিচু করল সোহানা, তারপর নিচু গলায় বলল, 'তবে একটা সত্যি কথা

তোমাকে বলি: যখন ওটা লুঠ হয়ে গেল, তখন আমার কলজেটা ফেটে যেতে চাইছিল। গহনা হারাবার দুঃখে নয়—কী কষ্ট করে তুলেছিলে তুমি ওগুলো দিনের পর দিন সাগরে ডুব দিয়ে দিয়ে! শুধু আমার জন্যে। ওটা আমি আর ফিরে না-ও পেতে পারতাম!'

টপ-টপ দু-ফোঁটা পানি পড়ল সোহানার চোখ থেকে। পানিটা মুছিয়ে দিয়ে ওর দুই গাল ধরল রানা দু-হাতে। আলতো একটা চুমু দিল চিবুকে। হাসছে ওর দুষ্টামির হাসি।

'ওগুলো তো শুধুই মুক্তা, সোহানা। তোমার জন্যে তুলেছিলাম, তুমি কত খুশি হবে ভেবে মনের আনন্দে একটা একটা করে সংগ্রহ করেছিলাম। ওগুলো যদি কোনও দিন চুরি হয়ে যায়ও, জেনো, আমার আনন্দটুকু থাকবে চিরকাল—কেউ কোনও দিন সেটা চুরি করতে পারবে না।'

এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহানা রানার বুকে। দু-হাতে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদছে।

খুনে পিশাচ

এক

পুরুষ ময়না দুটো মারামারি বাধিয়েছে আবার। জামরুল গাছের ডালে বসে উৎসাহের সঙ্গে তা-ই দেখছে তাদের পরিবার-পরিজন। দুই পরিবারের দুই কর্তার মধ্যে লেগে গেছে ক্ষমতার লড়াই। চলছে তুমুল প্রতিযোগিতা, কে কাকে মাটিতে ফেলে আটকে রাখতে পারে দু'পা দিয়ে।

'বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেলল! মেরে ফেলল!' চেঁচাচ্ছে যে জিতছে, সে-ই।

অপরটি হুবহু অনুকরণ করল মিসেস আশরাফকে, 'আনিকা, দেখ্ তো একটু, জ্বালিয়ে মারল বদমাশগুলো!'

'তাড়া ওগুলোকে এখান থেকে!' বলল ডালে বসা একজন।

মাঝে মাঝেই ঝগড়া বাধিয়ে কর্তৃত্ব ফলায় পাহাড়ি ময়না দুটো। বকা দিলেন মিসেস আশরাফ, কিন্তু তাঁকে পাত্তা দিল না ওরা। জানে, চেয়ার ছেড়ে উঠবে না এখন গৃহকর্ত্রী।

কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কে টেকনাফ শহরের বারো মাইল আগে উত্তর-পশ্চিমে চলে গেছে ইঁট বিছানো একটা এবড়োখেবড়ো পথ। ওই সরু, আঁকাবাঁকা, পাহাড়ি পথ ধরে সাড়ে চারমাইল গেলে পৌঁছানো যায় 'প্রশান্তি' এস্টেটে। অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আলী আশরাফের একশ' একর জায়গা জোড়া এই এস্টেটে রয়েছে পাহাড়ের ঢালে কমলা বাগান,

আর ফাঁকা সমতল জায়গায় ধান-গম-ভুট্টার খেত। সীমানা ঘিরে সারি সারি সুপারি-খেজুর-তাল ও নারকেলের গাছ। এ ছাড়া আম-জাম-কাঁঠাল-লিচু-পেয়ারা-বাতাবিলেবু-আতা সহ হরেক জাতের ফল ও ফুলগাছেরও অভাব নেই। আর আছে রাবার প্ল্যান্টেশন ও জঙ্গল।

চারপাশে নির্জন পাহাড়-জঙ্গল-বাগান-ফসলের খেত, মাঝখানে মেহগনি ও বার্মিজ টিকের তৈরি সাদা রং করা মাঝারী আকারের দোতলা বাংলো—নাম, শান্তিনীড়। ব্রিটিশ আমলে তৈরি হলেও নিয়মিত মেরামত করা হয় বলে দেখলে বোঝা যায় না বাংলোটার বয়স এখন একশ' পঁয়ষট্টি বছর। এস্টেট থেকে খানিকটা পশ্চিমে পাহাড়-জঙ্গলের ওধারে দিগন্তবিস্তৃত, সুনীল বঙ্গোপসাগর। নিখাদ প্রকৃতির শুদ্ধ পরশ মেলে তৃতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা সৈকতে গিয়ে বসলে, ওখানে টুরিস্টের হই-হট্টগোল, কিংবা অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলা প্লাস্টিকের সর্বনাশা বর্জ্য নেই।

শরতের বিকেল। ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ হাওয়ায় বাতাবি লেবু ও পাকা তালের সুবাস। মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। দখিনমুখী বাংলোর সামনের বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে স্বামী কাগজ দেখছেন, টি-টেবিলের ওপাশে বসে দ্রুত হাতে উলের সোয়েটার বুনছেন মিসেস আশরাফ; মাঝে মাঝে মুখ তুলে প্রশস্ত উঠান ভরা সবুজ ঘাসের চাদরে উত্তেজিত ময়না দুটোর ঝগড়া দেখছেন। মুচকি হাসলেন তিনি। ঝগড়াটা বাহানা, আসলে বিস্কুটের ভাগ চায়।

মিসেস আশরাফকে বিস্কুটের টিনে হাত দিতে দেখে মুহূর্তে থেমে গেল মারপিট, ছোট ছোট কয়েক লাফে কাছে চলে এল দুই বদমাশ। গোটাকয়েক বিস্কুট দু'হাতের তালুতে চেপে ভাঙলেন গৃহকর্ত্রী, তারপর গুঁড়োগুলো ছড়িয়ে দিলেন সামনে। ওমনি কিচিরমিচির আওয়াজ তুলে গাছের ডাল ছেড়ে ছুটে এল সব ক'টা ময়না, জুটে গেল ভোজসভায়; শুরু হলো ব্যস্ত ভঙ্গিতে সুস্বাদু

খাবার খুঁটে তোলার প্রতিযোগিতা, তারই ফাঁকে একটু সুযোগ পেলেই পাশের অন্যমনস্ক প্রতিযোগীর মাথায় ঠোকর মারা। কেউ কেউ আবার ছোট ছোট লাফ দিয়ে টি-টেবিলের তলায় গিয়ে ঢুকল বিস্কুটের বড় টুকরোর আশায়।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখলেন মিসেস আশরাফ, স্বামীর দিকে তাকালেন। কই, কাগজ তো দেখছেন না, চোখ বুজে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন মেজর জেনারেল আলী আশরাফ। গত এক সপ্তাহ ধরে মনমরা, আত্মমগ্ন হয়ে আছেন তিনি।

'আরেক কাপ চা দেব?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন মিসেস আশরাফ।

'না।' চোখ মেলে ন্যাপকিনে মুখ মুছলেন আশরাফ সাহেব। 'আনিকা কোথায়? ওকে দেখছি না যে?'

'কক্সবাজারে গেছে ওর এক বান্ধবীর জন্মদিনের পার্টিতে, সন্ধের আগেই চলে আসবে।' টেবিল থেকে একটা ঘণ্টি তুলে নিয়ে নাড়লেন তিনি। মিষ্টি টুং-টাং শব্দ হলো। ফুড়ুৎ করে উড়ে আবার ডালে গিয়ে বসল পাখিগুলো।

বিরাট বপু দুলিয়ে বাংলোর ভিতর থেকে হাঁসফাঁস করতে করতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল প্রৌঢ়া সরুপা বিবি। এ-বাড়িতে তিরিশ বছরেরও বেশি হলো কাজ করছে এই বিধবা মহিলা।

মনিবদের চা পর্ব শেষ বুঝে ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে জিজ্ঞেস করল সে, 'আফা, নিয়া যামু?'

'হ্যাঁ, নিয়ে যাও।' আরেকটা কথা মনে পড়ল মিসেস আশরাফের। 'এ-বছর পেয়ারা তাড়াতাড়ি পেকেছে, সরুপা। আমাদের কিন্তু জেলি বানিয়ে ফেলা দরকার।'

'বোতল লাগবো, আফা,' সরল হাসল মহিলা।

'কেন? গতবছরই না ঢাকা থেকে জেলির জন্যে বারোটা বোতল আনিয়ে দিলাম? কী হলো ওগুলোর?'

'নয়ডা দ অহনও বরা, আফা। বাকিগিনিত এই বচ্ছর আমের মিষ্টি আচার রাখলেন না?'

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বললেন, 'ঠিক আছে, আনিকাকে দিয়ে বোতল আনিয়ে নেব।'

'জে, আফা।' ট্রেতে চায়ের পট, কাপ-পিরিচ ও বিস্কুটের প্লেট তুলে নিয়ে ড্রইংরুম হয়ে কিচেনে ফিরে গেল সরুপা বিবি।

উলের কাঁটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মিসেস আশরাফ, যন্ত্রের মতো চলছে আঙুল দ্রুতগতিতে। এবার শীত আসার আগেই স্বামী ও মেয়ের জন্য সোয়েটার বুনতে চান। বোনার কাজ চলছে, কিন্তু তাকিয়ে আছেন তিনি দূর দিগন্তের দিকে। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলাগুলোয় কে জানে কার রক্তের রং মাখিয়ে দিয়ে পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে সূর্যটা।

বড়জোর আর আধঘণ্টা, তারপরেই রঙ হারিয়ে কালচে হতে হতে মিলিয়ে যাবে আকাশের সব রঙ। ডোবার ব্যাঙগুলো একযোগে ডাকতে শুরু করবে আঁধার নামলে, সেইসঙ্গে কোরাস ধরবে অসংখ্য ঝিঁঝি পোকা। আনিকা এখনও এলো না।

'গাড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছ?' নীরবতা ভাঙলেন আশরাফ সাহেব।

কান পাতলেন তাঁর মিসেস। 'হ্যাঁ, গাড়িই। আনিকা ফিরছে বোধহয়।'

মাথা নাড়লেন আলী আশরাফ। 'না, এটা জিপগাড়ি।'

বাড়ছে শক্তিশালী ইঞ্জিনের গুরুগম্ভীর আওয়াজটা, কাছে চলে আসছে। কড়া ব্রেকের শব্দ হলো। তিন মিনিট পর বাগানের খোয়া বিছানো সরু পথ ধরে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা তিনজন লোককে হেঁটে আসতে দেখলেন স্বামী-স্ত্রী। কারা এরা! দামি পাঞ্জাবী পরা সামনের লোকটা পিছনের দু'জনের চেয়ে অন্তত ছ'ইঞ্চি বেশি লম্বা। দেহটা একটু মোটার দিকে তার। পাক ধরেছে দাড়ির এখানে-ওখানে। কাছে আসবার পর বোঝা গেল,

পঁয়তাল্লিশের বেশি হবে না তার বয়স।

আর্মিতে থাকলে কঠোর পরিশ্রম করিয়ে বাড়তি মেদ ঝরানো হতো এর, ভাবলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল। পিছনের লোক দুটোর হাতে বড়সড় দুটো লাল সুটকেস দেখে কুঁচকে গেল তাঁর ভ্রূ। মনে হচ্ছে ওজন আছে, বয়ে আনতে কষ্ট হচ্ছে লোকগুলোর।

সরাসরি টি-টেবিলের কাছে এসে থামল সামনের লোকটা, 'আস্‌সালামু-আলাইকুম, জনাব আশরাফ,' বলে হাসি দিতেই ঝকঝকে সাদা ছোট ছোট দাঁতগুলো ঝিলিক দিয়ে উঠল তার।

কড়া আতরের বিশ্রী গন্ধে নাক কুঁচকে উঠতে চাইল মিসেস আশরাফের। তবু জোর করে ঠোঁটে টেনে আনলেন স্মিত হাসি।

লোকটার সঙ্গী দু'জন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে দলনেতার দু'ফুট পিছনে, দু'ফুট ডানে-বামে। কেমন যেন চকচকে দৃষ্টি তাদের চোখে। মনে হয়, কী এক আকণ্ঠ নেশায় ডুবে আছে বুঁদ হয়ে, অথবা সম্মোহিত।

'ওয়ালাইকুম-আসসালাম,' বললেন আলী আশরাফ, চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না, বা হাত বাড়িয়ে দিলেন না তিনি করমর্দনের জন্য।

'আমি মুফতি আলাওয়াল হানিফী,' নিজের পরিচয় দিল সালাম-প্রদানকারী। 'আমার সম্পর্কে হয়তো ধারণা আছে আপনার, জনাব আশরাফ। আপনার সঙ্গে মোলাকাতের সুযোগ হওয়ায় খুব খুশি হলাম। সুবহান-আল্লাহ্!'

পিছনের দু'জন হাতের সুটকেস কাঠের মেঝেতে নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সামনের সঙ্গীর দিকে চেয়ে আছে তারা সতর্ক চোখে। দলনেতার সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও চোখ এড়াচ্ছে না তাদের।

'এরা আমাদের সংগঠনের খিদমতগার,' কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বোলাল মুফতি আলাওয়াল হানিফী। হাসছে তৃপ্তির হাসি।

টেবিল থেকে পাইপ বের করে বাউলে এরিনমোর তামাক ভরতে শুরু করলেন মেজর জেনারেল আলী আশরাফ। তামাক ভরবার ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করলেন দাড়িওয়ালা লোকগুলোর টুপি, সিল্কের পায়জামা-পাঞ্জাবী, চামড়ার সাদা নাগরা জুতো, লাল সুটকেস দুটো। দ্রুত ভাবলেন, এদেরকে তাঁর স্টাডিতে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হতো। ওখানে ডেস্কের ওপরের ড্রয়ারে তাঁর রিভলভারটা রয়েছে। জানতে চাইলেন শান্ত স্বরে, 'বলুন, কী করতে পারি আমরা আপনাদের জন্যে?' পাইপ ধরিয়ে আনারসের সুবাসমাখা নীলচে ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে দেখলেন তিনি মুফতি আলাওয়াল হানিফীর সুদর্শন, ফর্সা চেহারা।

হানিফীর হাসিটা যেন চিরস্থায়ী, একটুও সঙ্কুচিত হলো না লালচে দু'ঠোঁট। বড় বড় খয়েরী চোখ দুটোতে তার হালকা বিস্ময়ের ছাপ। হাসি-হাসি চেহারাতেই বলল, 'মাওলানা হান্নান হুজুরের পক্ষ থেকে একটা পয়গাম নিয়ে এসেছি আমি। তিনি জানতে চান আপনি কেমন আছেন... আর, আপনার জমিটার দাম কত।'

চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল, ধোঁয়া ছাড়লেন পাইপে টান দিয়ে। তাঁর দেখাদেখি উঠলেন মিসেস আশরাফও। এখনও ভদ্রতাসূচক হাসছেন তিনি। মৃদু স্বরে বললেন, 'আমরা ভাল আছি, মিস্টার হানিফী। এতটা পথ কষ্ট করে আপনাদের আসতে হলো বলে সত্যিই খুব খারাপ লাগছে। কক্সবাজার বা টেকনাফে খোঁজ নিলেই জানতে পারতেন, এস্টেট বিক্রি করবেন না আমার স্বামী। এটা ওঁর পৈত্রিক সম্পত্তি, কাজেই, বুঝতেই পারছেন...'

হাসিমুখে মিসেস আশরাফের কথা শুনছিল হানিফী, উনি থেমে যাওয়ায় চোখ সরিয়ে মেজর জেনারেলের দিকে তাকাল সে। মুখ খোলায় বোঝা গেল মিসেস আশরাফের একটা কথাও গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। 'আমাদের হুজুরের যে উদ্দেশ্যে জমি

দরকার, তাতে এর চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না। চারপাশে পাহাড়-জঙ্গল, পিছনে খোলা সাগর—ঠিক আমাদের যা দরকার। আপনি যুক্তিসঙ্গত যে-কোনও অঙ্কের টাকা চাইতে পারেন, জনাব আশরাফ।'

'আপনি আমার স্ত্রীর কথা শুনেছেন, প্রশান্তি বিক্রি করব না আমরা কখনও,' বললেন আলী আশরাফ। 'আপনারা অন্য কোনও জায়গা দেখুন গিয়ে।'

হো-হো করে হেসে উঠল মুফতি হানিফী। মনে হলো হাসিটা তার কৃত্রিম নয়। দাড়িতে হাত বোলানোর ফাঁকে মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়ল সে, কথা বলল এমনভাবে, যেন অবুঝ কোনও কিশোরকে বোঝাচ্ছে: 'আপনি আমার কথা এখনও মেহসুস করতে পারেননি, জনাব আশরাফ। আমাদের হুজুরের এই জায়গাটাই দরকার, টেকনাফের আশপাশে আর কোনও জমি নয়। যে-কোনও দাম হাঁকুন, যত খুশি। ...কত চাই আপনার?'

মেজর জেনারেল আলী আশরাফ ধৈর্য না হারিয়ে বললেন, 'আপনিই বরং বুঝতে ভুল করছেন, মিস্টার হানিফী। ভুল বুঝে আমাদের সবারই সময় নষ্ট করছেন। আমি যতদিন বেঁচে আছি, বিক্রি হবে না প্রশান্তি। এবার আপনারা যদি আসেন, তা হলে ভাল হয়। ওজু করে নামাজে বসব। শহরে পৌঁছতে এমনিতেই মাগরেব পেরিয়ে যাবে আপনাদের।' বাগানের বামদিকের একটা হাঁটাপথ দেখালেন তিনি হাতের ইশারায়। 'এদিক দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবেন আপনাদের গাড়ির কাছে।'

ভদ্রতা করে ওই পথের দিকে দু'পা এগোলেন আলী আশরাফ সাহেব, কিন্তু মুফতি আলাওয়াল হানিফী একচুল না নড়ায় থেমে যেতে হলো তাঁকে। খেয়াল করলেন, আগন্তুকের খয়েরী চোখ দুটোর দৃষ্টি আগের চেয়ে অনেকখানি শীতল হয়ে গেছে।

হাসিটা মুফতি হানিফীর ঠোঁটে লটকে রয়েছে এখনও, তবে প্রদর্শিত দাঁতের সংখ্যা কমে গেছে বেশ কয়েকটা। 'একমিনিট

জনাব,' নরম সুরে বলল সে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদের কিছু নির্দেশ দিল মৃদু কণ্ঠে।

লোকটার আচরণে হঠাৎ পরিবর্তন দেখে ভিতরে ভিতরে নড়ে গেলেন মিসেস আশরাফ। স্বামীর আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন তিনি।

নির্দেশ পেয়ে লাল সুটকেস দুটোর ডালা খুলল সঙ্গী দু'জন। দুটো সুটকেসই কানায় কানায় ভরে আছে পাঁচশ' টাকার নোটে। থরে থরে সাজানো বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল।

অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেলের নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিটা আবার একটু চওড়া হলো মুফতি হানিফীর। 'পুরো পনেরো কোটি আছে এখানে। বহোত রুপেয়া, কী বলেন, জনাব? টাকাগুলো সব আপনার হয়ে যেতে পারে। দলিল তৈরি। আপনি শুধু স্ট্যাম্প-কাগজের লেখাগুলো একটু পড়ে নিয়ে সই করে দেবেন। আসুন, শুভ কাজটা সেরে ফেলা যাক। তারপর পরস্পরের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নেব আমরা।'

বিরক্তিকর লোকটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে বাগানের পথটা তর্জনী তাক করে দেখালেন আলী আশরাফ। 'আপনারা এবার আসুন। যা বলার বলে দিয়েছি আমি আগেই। টাকার লোভ দেখাবেন না আমাকে। প্রশান্তি বিক্রি হবে না। ব্যস!' স্ত্রীর বাহু ধরে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন তিনি।

'দাঁড়ান, একমিনিট!' এক কদম সামনে এগিয়ে তর্জনী তুলে ধমকের সুরে বলল মুফতি আলাওয়াল হানিফী। তার হাসি থেকে মিলিয়ে গেছে সমস্ত উষ্ণতা। খয়েরী চোখ দুটোর দৃষ্টি হয়ে উঠেছে হিমশীতল, কঠোর। শান্ত স্বরে বলল সে, 'আপনি ভুল করছেন, জনাব। আমার সঙ্গে মিলিটারি মেজাজ দেখাবেন না। ওসব ট্রেনিং নেওয়া আছে আমারও। যদি আপনি আমাদের এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ার মত বেওকুফি করেন, অন্য পথ ধরব তখন আমরা।'

'শাটাপ্!' গর্জে উঠলেন মেজর জেনারেল। 'গেট আউট, আই সে! গেট দ্য হেল আউট অভ হিয়ার!'

হঠাৎ ভীষণ ভয় পেলেন মিসেস আশরাফ। শক্ত করে স্বামীর কনুই খামচে ধরলেন তিনি। অভয় দিতে তাঁর হাতের উপর হাত রাখলেন আশরাফ সাহেব, গলা নামিয়ে বললেন, 'আপনারা আসুন। পুলিশ ডাকতে বাধ্য করবেন না আমাকে।'

লাল টুকটুকে জিভ বের করে উপরের ঠোঁট চাটল মুফতি, হাসি-খুশি ভাবের লেশমাত্র নেই আর তার চেহারায়। কর্কশ স্বরে বলল, 'তা হলে, জনাব, আপনি বেঁচে থাকতে বিক্রি হবে না এ-জমি—এ-ই তো আপনার শেষকথা?' ডানহাত পিছনে নিয়ে তুড়ি বাজাল সে একবার। পিছনের লোক দু'জনের হাত চলে গেল পাঞ্জাবীর নীচে। কোমরে বাঁধা হোলস্টার থেকে দুটো সিগ-সাওয়ার সেমি-অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে এল হাত দুটো।

আঁৎকে উঠে মুখে হাত চাপা দিলেন মিসেস আশরাফ।

'ঠিকই ধরেছেন,' জোরের সঙ্গে বলতে চাইলেন আলী আশরাফ, কিন্তু গলার ভিতরটা খুব শুকনো ঠেকল তাঁর। ঢোক গিললেন। বিশ্বাস করতে পারলেন না, সত্যি সত্যি তাঁকে খুনের হুমকি দেয়া হচ্ছে। নিশ্চয়ই মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে লোকটা। 'আমার শেষকথা আপনি শুনেছেন,' বললেন খসখসে স্বরে।

আস্তে করে মাথা দোলাল মুফতি হানিফী। 'তা হলে আপনার পরে যে এই সম্পত্তির মালিক হবে...মানে আপনার মেয়ে...তার কাছ থেকেই এটা কিনে নেব আমরা।'

আরেকবার চুটকি বাজাল সে, তারপর চট্ করে পিছিয়ে দাঁড়াল তিন কদম। সরে গেল লাইন অভ ফায়ার থেকে।

পিস্তল ধরা হাত উঁচু করল তার দুই সঙ্গী, ট্রিগারে চাপ দিল। তাদের লক্ষ্যবস্তু দরজার সামনে বারান্দায় দাঁড়ানো স্বামী-স্ত্রী। গুলির শব্দে জামরুলের ডাল ছেড়ে পালাল ময়নাগুলো। বাংলোর পিছন থেকে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল শেকলে বাঁধা জার্মান শেফার্ড

কুকুরটা। আশরাফ দম্পতি মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরেও একের পর এক গুলি চালিয়ে গেল নিষ্ঠুর ঘাতকরা।

গুলির আওয়াজে বাংলোর কোনা ঘুরে ছুটে এলো এস্টেটের ম্যানেজার-কাম-গার্ড অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার-মেজর আবুল কালাম। রক্তাক্ত জেনারেল ও তাঁর স্ত্রীর পাশে দাঁড়ানো সশস্ত্র লোকগুলোকে দেখেই কাঁধে ঝোলানো রাইফেলটা নামাতে গেল সে। এই রাইফেল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে বহু পাকিস্তানি হানাদার ও রাজাকার খতম করেছে সুবেদার-মেজর। আজ কি তার সেই বিশ্বস্ত রাইফেল ব্যর্থ হবে?

ভালমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার বুকে একইসঙ্গে ঢুকল দুটো বুলেট। ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে হুড়মুড় করে চিত হয়ে পড়ে গেল আবুল কালাম। রাইফেলটা পড়ল তার বুকের উপর।

দামি কাপড় বাঁচিয়ে দেহগুলোর উপর ঝুঁকে কোথায় গুলি লেগেছে দেখল মুফতি আলাওয়াল হানিফী, সুবেদার-মেজর আবুল কালাম পা আছড়াচ্ছে দেখে ইশারা করল। পিস্তলে নতুন ম্যাগাযিন ভরে গুরুতর আহত মানুষটার মাথায় গুলি করল তার সঙ্গীদের একজন।

তিনজনই মারা গেছে নিশ্চিত হয়ে সন্তুষ্ট মনে বাগানের পথ ধরে গাড়ির দিকে ফিরে চলল মুফতি হানিফী। ডালা লাগিয়ে সুটকেসগুলো তুলে নিল তার দুই সঙ্গী, হাঁটছে তার পিছন পিছন।

টয়োটা জিপে উঠে ধীরেসুস্থে রওনা হয়ে গেল তিনজন।

কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কে উঠে ডানে বাঁক নিল টয়োটা। কয়েক মাইল এগোনোর পর সুটকেস হাতে নেমে গেল অনুচর দুজন, কাছেই কোথাও ওগুলো হেফাজতে রাখার ব্যবস্থা আছে। টেকনাফ শহরের কাছাকাছি এসে নির্জন পাহাড়ি রাস্তা থেকে জিপটা গড়িয়ে ফেলে দেয়া হলো নাফ নদীতে। ওটা ডুবে যাবার পর টেকনাফ সদরের দিকে হেঁটে চলল হানিফী। রাত বারোটা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে সে, তারপর গোপনে পার হবে নাফ নদী,

সতর্ক নাসাকা বাহিনীর চোখ এড়িয়ে চলে যাবে মায়ানমারের ভেতরে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত থুরং গ্রামের কাছে, নিজেদের অস্থায়ী অবকাশ-যাপন কেন্দ্রে।

ওদিকে গোধূলির ম্লান আলোয় 'শান্তিনীড়'-এর চওড়া বারান্দা ও সামনের লনে পড়ে থাকল তিনজন মানুষের বুলেটবিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত লাশ। বেগম সাহেবার লাশের পাশে বসে বুক চাপড়ে কাঁদছে বোকাসোকা সরুপা বিবি। কিছুক্ষণ পর একটা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পেল ও। বাঁক ঘুরে বাংলোর দিকেই আসছে গাড়িটা। কান্না আরও বেড়ে গেল সরুপা বিবির। আসছে আনিকা।

দুই

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর শুটিং রেঞ্জ। ফিল্ড এজেন্টদের নিখুঁত লক্ষ্যভেদের জন্য উচ্চপর্যায়ের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এখানে।

দেশের বিরুদ্ধে বৈদেশিক যে-কোনও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করবার জন্য সেই পাকিস্তান-আমলে সৃষ্টি করা হয়েছিল কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। আর্মি থেকে অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় জোর করে এর পরিচালনার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল মেজর জেনারেল রাহাত খানের উপর। স্বাধীনতার পর আজও তিনিই কর্ণধার। নিজের হাতে গড়ে নিয়েছেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন শাখা থেকে বাছাই করা দুর্ধর্ষ কয়েকশ' যুবককে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে রয়েছে তারা, কোথাও দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত

হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণের পরোয়া না করে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, অকুতোভয় এইসব বাঙালি ছেলে শ্রদ্ধা-সমীহ কেড়েছে দেশ-বিদেশে।

বিসিআই-এর কর্ণধার মেজর জেনারেল রাহাত খানের নির্দেশেই মার্কসম্যানশিপ পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে আজ এই শেষ বিকেলে। পরীক্ষার্থী শুধু একজন।

নয় নম্বর লেখা বোর্ডের পাশে ফায়ারিং পয়েন্ট-এ বসে আছে বিসিআই-এর সেরা এজেন্টদের অন্যতম, মাসুদ রানা। এইমাত্র দ্বিতীয় গুলি করে উঠে বসেছে ও, গুলিটা কোথায় লাগল দেখবে বলে।

ওর কাছ থেকে সাড়ে সাতশ' মিটার দূরে "৯" লেখা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ছয়ফুট বর্গাকৃতি টার্গেটকে শেষ বিকেলের সোনালী রোদে খালি চোখে দেখতে লাগছে ছোট্ট একটা রং-জ্বলা ডাকটিকিটের মতো। ওর রাইফেলে বসানো স্পেশাল ওয়েদারবাই ৬ X ৬২ স্নাইপার-স্কোপের ভিতর দিয়েও যে খুব ভাল দেখা গেছে, তা নয়—কুচকুচে কালো বুল্স্ আইটাকে মনে হয়েছে পূর্ণগ্রহণ লাগা চাঁদের মত ঝাপসা, আর ওটাকে ঘিরে একফুট পর পর আঁকা দুই ইঞ্চি চওড়া বৃত্তগুলোকে মনে হয়েছে ফ্যাকাসে নীল রং-পেন্সিলের দাগ। গুলি কোথায় লাগল বোঝবার উপায় নেই।

ছোট্ট ট্রাইপডে বসানো হাই-পাওয়ার্ড টেলিস্কোপে চোখ রাখল রানা। মনে হলো দশ ফুট দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে টার্গেটটা। ভালই মেরেছে ও। প্রথম গুলিটা লেগেছিল বুল্স্ আইয়ের সেন্টার থেকে অনেকটা দূরে, এলিভেশন ও উইণ্ডেজ অ্যাডজাস্টের পর এবারেরটা লেগেছে তিন ইঞ্চি নীচে আর দুই ইঞ্চি বামে। মাথা নাড়ল রানা, রাইফেলটা যিরো হয়নি এখনও।

বাতাসের গতি নির্দেশক নীল ও হলুদ পতাকাগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। গত আধঘণ্টায় পুবদিক থেকে হাওয়ার গতি বাড়েনি তেমন। ডানদিকে দু'ঘাট সরিয়ে স্কোপের উইণ্ড গেজ ঠিক

করল ও, তারপর তিন ঘাট উপরে তুলতেই পয়েন্ট অভ এইম-এ চলে এলো স্কোপটার ক্রস-চিহ্ন। শুয়ে পড়ে রাইফেলটা তুলল কাঁধে, ট্রিগার গার্ডে আঙুল পুরে ট্রিগারে রাখল তর্জনী। শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করল এবার, সাবলীল শ্বাসের ফাঁকে আলতো করে চাপ বাড়াল ট্রিগারে।

শুটারশূন্য ফাঁকা রেঞ্জে কড়াৎ করে গর্জন ছাড়ল একাকী রাইফেল। গুলিটা বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তেই অনুভব করল রানা, ঠিক জায়গামতই লাগবে এবার বুলেট।

'গুড! ভেরি গুড!!' মাসুদ রানার পিছনের উঁচু সিমেন্ট-মঞ্চ থেকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন চিফ রেঞ্জ অফিসার। দূরবীন থেকে চোখ সরিয়ে তাকালেন রানার দিকে। 'ঠিক এরকম চালিয়ে যান দেখি। পালটে দিচ্ছি টার্গেট।'

একটা বোতামে চাপ দিতেই নীচে নেমে গেল প্রথম টার্গেট, উঠে এল আরেকটা। রাইফেলের স্টকে গাল ঠেকাল রানা, চোখ রাখল স্কোপের রাবার আই পিস-এ। প্যান্টে ডানহাতটা মুছে শক্ত করে ধরল ট্রিগার গার্ডের পিছনের পিস্তল-গ্রিপ, পা দুটো ছড়িয়ে দিল আরেকটু। এবার ফাইনাল। পরপর পাঁচটা গুলি করতে হবে ওকে বিরতি না দিয়ে। প্রথমটার পর বাকি বুলেটগুলো একইভাবে ব্যারেল থেকে বের হবে কি না, ভাবল রানা। সম্ভবত বেরোবে। বিসিআই-এর টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের ওয়েপন এক্সপার্ট পাগলা ডক্টর শামশের আলীর নিজ তত্ত্বাবধানে তৈরি বুলেট—তিনি ওকে জানিয়েছেন, দু'সেকেণ্ড দেরি করে গুলি করলে কোনও 'ফেড' হবে না।

বিসিআই-এর ল্যাবোরেটরিতে অনেক যত্নে রাইফেলটার উপর কারিগরী ফলিয়েছেন ডক্টর শামশের আলী। এ-ধরনের রাইফেলের রেঞ্জ সাধারণত পাঁচশ' মিটার, কিন্তু সাড়ে সাতশ' মিটার দূর থেকেও মানুষ খুন করবার ক্ষমতা আছে ওর হাতের এই .২৫০-৩.০০০ ক্যালিবার অস্ত্রটার। হাই ভেলোসিটি সাতান্নটা

বুলেট দিয়ে শামশের আলী বলেছেন, সাতটা টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্য, বাকিগুলো অন্য কাজে লাগবে। বোল্ট অ্যাকশন পাল্টে দশ শটের রিপিটার-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে রাইফেলটাকে, কিন্তু তার ফলে গুলির ভেলোসিটি যাতে না কমে, সে-ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ওর মতো এজেন্টদের যে-ধরনের কাজে রাইফেল ব্যবহার করতে হয়, সে-ধরনের কাজে অস্ত্রের ওজন কম হওয়া দরকার, তাই হালকা রাইফেল বাছাই করা হয়েছে। স্যাভেজ ৯৯এফ-এর ওজন মাত্র সাড়ে ছ'পাউণ্ড। অস্ত্রটা কাঁধে ঝুলিয়ে অনায়াসে মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে পাড়ি দিতে পারবে ও।

'রেডি?' পিছন থেকে জানতে চাইলেন চিফ রেঞ্জ অফিসার।

'রেডি।'

'পাঁচ থেকে গুনছি তা হলে। শুরু করলাম। পাঁচ... চার... তিন... দুই... এক। ফায়ার!'

তপ্ত পাঁচটা কিউপ্রোনিকেল বুলেট-বর্ষণের প্রচণ্ড শব্দ হলো পরপর পাঁচবার। টার্গেট নেমে গেল চোখের পলকে, তারপর উঠে এলো আবার। বুলস-আই-এ দেখা গেল পাঁচটা ছোট সাদা ডিস্ক।

'চমৎকার!' নিখাদ প্রশংসার সুরে বললেন রেঞ্জ অফিসার, নেমে এলেন সিমেন্টের মঞ্চ থেকে। রানা উঠে দাঁড়ানোর পর ওর হাতে ধরিয়ে দিলেন শুটিঙের রেকর্ড।

স্কোপ অ্যাডজাস্ট করবার পরপরই সাড়ে সাতশ' মিটার দূরের টার্গেটে বিরতিহীন পাঁচটা গুলি করতে হয়েছে ওকে। ফলাফল: পাঁচবারে পাঁচবারই বুলস-আই, গ্রুপিং—পৌনে দুই ইঞ্চি। রেকর্ডে চোখ বুলিয়ে রেঞ্জ অফিসারকে ধন্যবাদ দিল রানা, স্কোপ সহ রাইফেলটা কেসের ভিতর ভরে স্ট্র্যাপ দিয়ে শক্ত করে স্টক ও ব্যারেল আটকে নিল, যেন জোরালো ঝাঁকিতেও সামান্যতম না নড়ে, তারপর রওনা হয়ে গেল গাড়ির দিকে।

পিছন থেকে মাসুদ রানার দিকে চেয়ে থাকলেন রেঞ্জ অফিসার। কেন এই অপ্রতুল আলোয় সাড়ে সাতশ' মিটার দূরের

লক্ষ্য ভেদ করতে বলা হয়েছে বিসিআই-এর জীবন্ত কিংবদন্তি মাসুদ রানাকে, কে জানে! নিয়ম অনুযায়ী পনেরো ইঞ্চি বৃত্তাকার বুলস-আই দেয়া হয়, কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম করে ওঁকে দিতে বলা হয়েছে ছ'ইঞ্চি বৃত্ত। কারণটা নিশ্চয়ই টপ সিক্রেট। ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালেন রেঞ্জ অফিসার, বাড়ি ফিরবেন অফিসে তালা দিয়ে।

পরদিন সকাল সাড়ে ন'টা। বিসিআই হেডকোয়ার্টার। মতিঝিল।

দশ মিনিট হলো মেজর জেনারেল রাহাত খানের অফিসে ঢুকেছে রানা বসের সুন্দরী প্রাইভেট সেক্রেটারি ইলোরাকে একটা উড়ন্ত চুমু উপহার দিয়ে ভ্রূ-শাসনের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে। পাইপ নেড়ে আবছা ইঙ্গিতে ওকে বসতে বলেছেন রাহাত খান, চেয়ে নিয়ে শুটিঙের রেকর্ডটা দেখেছেন, তারপর সাতশ' পঞ্চাশ মিটার দূরের টার্গেটে ওর পাঁচটা গুলিই বুলস আই-এ লেগেছে দেখে গম্ভীরমুখে 'নট ব্যাড' বলে চলে গেছেন জানালার ধারে। তখন থেকে একবারও ফিরে না তাকিয়ে একমনে নীচের ব্যস্ত রাজপথের যানবাহন চলাচল দেখছেন তিনি। ওখান থেকে নিশ্চয়ই খেলনার মত লাগছে ওগুলোকে।

অফিসটা বদলায়নি, বুড়ামিয়াও প্রায় আগের মতোই আছে, ভাবল রানা। সপ্রতিভ অভিজাত চেহারা, ধবধবে সাদা ইজিপশিয়ান কটনের স্টিফ-কলার শার্ট, দামি ট্রপিকাল সুট, ব্রিটিশ কায়দায় বাঁধা মেরুন স্ট্রাইপ দেয়া লাল টাই। ছিমছাম, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। দাঁতে কামড়ে ধরে আছেন পাইপ। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছে রানা, গোলমাল রয়েছে কোথাও।

বুলস আই-এর চেয়ে ভাল লক্ষ্যভেদ হয় না, অথচ বুড়োটা বলেছে নট ব্যাড—এ-পর্যন্ত ঠিকই ছিল, কিন্তু তারপর থেকে আর তো কিছুই স্বাভাবিক ঠেকছে না! বুড়ামিয়া কথা কয় না ক্যান? কারণ ছাড়া নিশ্চয়ই ডাকেনি? কোনও অ্যাসাইনমেণ্ট আছে ওর

জন্যে? তাকাচ্ছেও না ওর দিকে! আবার নেভা পাইপে দু'বার টান দিয়েছে! দেখি তো, বুড়ো, তোর কপালের বামদিকে শিরাটা টিপটিপ করে লাফায় কি না! চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে কাত হয়ে ঝুঁকে রাহাত খানের কপাল দেখার চেষ্টা করল রানা। নাহ্, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ঘুরে তাকালেন রাহাত খান, তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল রানা, যেন নড়ে বসছে, এমনি ভাবে সিধে হলো। উদাস চেহারা।

ফিরে এসে ছাই পরিষ্কার করলেন তিনি পাইপের, টেবিল থেকে পাউচ তুলে নিয়ে তামাক ভরলেন বাউলে, কাজটা শেষ করে রনসন লাইটার জ্বালতে গিয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টে বসলেন সুইভেল চেয়ারে। পাইপটা পিস্তলের মত করে তাক করলেন রানার বুকে। পরিষ্কার দেখল রানা, কপালের শিরাটা টিপটিপ করছে! কথা নেই মুখে।

'বল্ না বাপ, কী হয়েছে তোর!' মনে মনে বলল রানা।

'রানা,' খুকখুক করে কাশলেন রাহাত খান। 'যা বলছিলাম।'

'জী, সার,' তাড়াতাড়ি সায় দিল রানা।

ভ্রূ কুঁচকে ওকে দেখলেন রাহাত খান। 'এখনও কিছু বলিনি আমি। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই জী, সার?'

বকা খেয়ে চুপ করে থাকল রানা। বুড়োর মেজাজটা এমন বদখত হয়ে আছে কেন! হয়েছেটা কী?

তিনবারের চেষ্টায় পাইপে আগুন ধরাতে পারলেন রাহাত খান, হাত মৃদু মৃদু কাঁপছে তাঁর। মনে হলো কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছেন। হার্টবিট বেড়ে গেল রানার—নিশ্চয়ই কোনও অ্যাসাইনমেন্ট! পাইপের বাউল থেকে বেরোনো ধোঁয়ার দিকে চেয়ে বললেন, 'রানা, কখনও কি তোমার মনে হয়েছে, ব্যক্তিগত কাজে তোমাদেরকে ব্যবহার করেছি আমি?'

'না, সার। কখনোই না।' জোর দিয়ে বলল রানা।

আনমনা হয়ে গেলেন রাহাত খান, চুপ করে থাকলেন।

'সার, কোনও কাজে কি আমাকে...' কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর কথাটা আলতো করে পাড়ল রানা।

'না... হ্যাঁ,' অস্বস্তি বোধ করে বিরক্ত হয়ে উঠলেন রাহাত খান। ভ্রূকুটি করে চাইলেন রানার দিকে। 'একটা কাজের কথা ভাবছি। কিছুটা বিসিআই সংক্রান্ত হলেও আসলে এর অনেকটাই ব্যক্তিগত বলতে পারো। ...রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল আলী আশরাফকে তো চিনতে তুমি?' অনামিকা দিয়ে ডান চোখের নীচে চুলকালেন রাহাত খান।

'জী, সার। যোগ্য অফিসার ছিলেন।'

'হ্যাঁ, ছিল। খবরটা পড়েছ তা হলে।'

'জী, সার। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কারা যে এভাবে হঠাৎ...'

'হাজি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল হান্নানের নামটা আসেনি কোনও পেপারে,' রানাকে থামিয়ে দিলেন রাহাত খান। 'আসেনি, কিন্তু কাজটা ওদেরই। ওর সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড মুফতি আলাওয়াল হানিফী নিজে উপস্থিত ছিল হত্যাকাণ্ডের সময়।'

নাম দুটো শুনে ভিতর ভিতর চমকে গেল রানা। এরা ঘোর জঙ্গি। ধর্মভিত্তিক, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আব্দুল হান্নান ও আলাওয়াল হানিফী পরিচিত নাম। নিজ দলে প্রচণ্ড প্রভাব আছে আব্দুল হান্নানের। ধরে নেয়া যায়, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দলের শীর্ষ অবস্থানে পৌঁছে যাবে। হানিফীও উঠে আসবে কাছাকাছি উঁচু কোনও পদে।

'গত এক সপ্তাহে শুধু এটুকু জানা গেছে, এদের নামে কোনও ফাইল নেই, পুলিশ বা ডিজিএফআই রিপোর্ট নেই,' বললেন রাহাত খান।

লোক দুটোর ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে একটা সপ্তাহ ব্যয় করেছেন বস্! অবাক হলো রানা, জিজ্ঞেস করল, 'ওদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছেন কি, সার, ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওরা জড়িত বলেই?'

সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে শরৎ-আকাশের সাদা মেঘের দিকে তাকালেন রাহাত খান, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আশরাফের অল্পবয়েসী একটা মেয়ে আছে, রানা। গত সপ্তাহে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বাবা-মার ক্ষতবিক্ষত লাশ পেয়েছে মেয়েটা। জানা গেছে, ওদের সম্পত্তি কিনে নেবে বলে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা তিনজন দাড়ি-টুপিওয়ালা লোক এসেছিল বাংলোয়। যে-গাড়ি নিয়ে এসেছিল, খুন করে সেই গাড়ি নিয়েই চলে যায় তারা। খুনিদের ব্যাপারে জানাতে পারেনি পুলিশ কিছুই।'

'কেন খুন করা হলো, সার?'

'আশরাফের এস্টেট কিনে নেবার প্রস্তাব পাঠাচ্ছিল আব্দুল হান্নান বেশ কিছুদিন ধরে। আশরাফ তার এস্টেট বিক্রি করবে না জানানোর পর থেকে নানান ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল ওর ওপর। এবার পাঠিয়েছে আলাওয়াল হানিফীকে ওর শেষকথা জানবার জন্যে। কক্সবাজারের এসপি আরমান আজিজুল হকের কাছ থেকে জানা গেছে কিছুটা, বাকিটুকু আঁচ করে নিয়েছি আমি।'

'উদ্দেশ্যটা কী, সার? শুধুই জমি দখল?'

'না,' দৃঢ় স্বরে বললেন রাহাত খান, সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকালেন। 'আমাদের রোহিঙ্গা এজেন্টের মাধ্যমে যতটুকু তথ্য পেয়েছি, তা থেকে জানা গেছে, টেকনাফের ওদিকে মায়ানমার সীমান্তের ওপারে দলীয় জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছে আব্দুল হান্নান বেশ অনেকদিন হলো। তবে মায়ানমার সরকারের চোখ পড়ে গেছে ইদানীং তাদের ওপর, শীঘ্রি অস্ত্রের মুখে বাংলাদেশে পুশইন করা হবে জঙ্গিদের। সেই কারণে বাংলাদেশের ভেতরে কোথাও নিজেদের আস্তানা সরিয়ে আনতে চাইছে আব্দুল হান্নান। শহর থেকে কাছে, অথচ জনবিরল একটা জঙ্গল ভরা পাহাড়ি অঞ্চল, পুবে মায়ানমার সীমান্ত, পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর দিয়ে অস্ত্র আনা-নেওয়া আর যখন খুশি সরে পড়ার

সুবিধা—এই সবদিক বিবেচনা করে তার আস্তানার জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছে সে আশরাফের এস্টেট। পথ থেকে কাঁটা সরিয়ে দিয়ে লোকটা ভাবছে এবার মেয়েটিকে বাধ্য করতে পারবে তার প্রস্তাব মেনে নিতে। ওর বোধহয় ধারণা হয়েছে, যা খুশি করে পার পেয়ে যাবে ও, অন্যায়ের প্রতিকার করার সাধ্য নেই কারও। সরকার ও প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করবে।'

'সার, আমরা যদি...'

'এই কেসে অফিশিয়ালি হস্তক্ষেপের কোনও এক্তিয়ার নেই আমাদের... অন্তত এখনও। এটা একটা ক্লিন মার্ডার কেস। সিভিল ক্রাইম। পুলিশ ডিল করবে, এবং যথারীতি কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে না।' খুকখুক করে কাশলেন রাহাত খান। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার মুখ খুললেন, 'আশরাফ দম্পতিকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চিনতাম আমি। খুব বড় মনের মানুষ ছিল আশরাফ। আমার চেয়ে বেশ কিছুটা জুনিয়ার হলেও ওর সঙ্গে সম্পর্কটা আমার ছিল বন্ধুর মতোই। ওর বিয়েতে গিয়েছিলাম আমি বরপক্ষ হয়ে। পারিবারিক সব অনুষ্ঠানে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেত ও। ওর মেয়ের জন্মদিনে দাওয়াত পেতাম প্রতিবছর। আমার কোলে উঠলে নামতে চাইত না পিচ্চিটা। মাত্র তেইশ বছর বয়সে একদম এতিম হয়ে গেল আনিকা।'

নরম স্বরে জানতে চাইল রানা, 'আব্দুল হান্নান আর মুফতি হানিফী এখন কোথায়, সার?'

রানার দিক থেকে চোখ সরিয়ে পাইপের বাউলের দিকে তাকালেন রাহাত খান। 'নাফ নদীর ওপারে, বার্মিজ এক জমিদারের শিকারের কুঠি ভাড়া নিয়েছে ওরা। মায়ানমারের ওদিকের মানচিত্র দেখে বের করেছি, থুরং নামে একটা গ্রামকে পাশ কাটিয়ে যেতে হয় ওখানে। পাহাড়-জঙ্গল ভরা দুর্গম নির্জন এলাকা।'

থেমে গেলেন রাহাত খান। পাইপটা নিভে গেছে, ওটা আবার ধরালেন। থেমে থেমে বললেন, 'বুঝতে পারছি না ঠিক কী করা উচিত।'

মাথা নিচু করে চিন্তা করছে রানা। ভুলে গেছে রাহাত খানের উপস্থিতি। ও জানে না, ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন বৃদ্ধ।

পরিষ্কার উপলব্ধি করল ও, আমার বন্ধুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নাও, এই নির্দেশ অফিশিয়ালি দেয়া যায় না। নির্দেশ দিচ্ছেন না রাহাত খান। তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তারপর এমন একটা পর্যায়ে এসেছেন, যখন ন্যায়-বিচার করতে হলে কাউকে না কাউকে নিজের হাতে আইন ও অস্ত্র তুলে নিতে হবে। এখানটাতেই থমকে গেছেন নীতিবান জেনারেল। মুখ ফুটে বলতে পারছেন না: যাও রানা, ওই খুনি পিশাচগুলোকে খতম করে দিয়ে এসো।

কী করা উচিত তা নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই রানার মনে মেজর জেনারেল আলী আশরাফ বা তাঁর স্ত্রীকে ভালভাবে চেনে না ও, চিনবার দরকারও নেই। নিরস্ত্র কয়েকজন বর্ষীয়ান মানুষকে খুন করেছে আব্দুল হান্নান আর মুফতি হানিফী। কেন? নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য! জঙ্গি ফ্যানাটিকদের ট্রেনিং দিয়ে এদেশের বুকে বিষাক্ত ছোবল হেনে ক্ষমতা দখলের মতলবে। ব্যাপারটা জানার পর ওর কী করা উচিত? অবশ্যই সাধ্যমত বাধা দেয়ার চেষ্টা করা উচিত—তা-ই না?

দেশের স্বার্থেই এদের উপর পাল্টা আঘাত হানা জরুরি। ওই নরপিশাচগুলো এখন গুলি করে নিরপরাধ মানুষ মারছে, এরপর বোমা ফাটিয়ে শত শত সাধারণ নির্বিরোধী মানুষের জীবন নেবে। এদেশে গণতন্ত্র যতদিন আছে, ক্ষমতায় বসতে পারবে না ওরা কিছুতেই; কিন্তু সংগঠিত হবার সুযোগ পেলেই ধর্মের নামে খুন-জখম, বোমাবাজি, অন্যায়-অত্যাচার, মিথ্যাচার ও জুলুম-জবরদস্তির মাধ্যমে গোটা দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবে।

যার যেমন খুশি ফতোয়া দিয়ে গলা-রগ-হাত কাটবে মানুষের। দেশটাকে নিয়ে যাবে চরম জাহেলিয়াত ও অন্ধকারের যুগে। থেমে যাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির চর্চা, অগ্রগতি, উন্নতি। আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের মতো বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে লাখো শহীদের রক্তে অর্জিত সোনার বাংলাদেশ।

জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সরাসরি ভূমিকা রাখছে এই আব্দুল হান্নান আর তার চেলা আলাওয়াল হানিফী। ধর্মান্ধ এই অর্ধশিক্ষিত, স্বল্পবুদ্ধির লোকগুলো অধর্মকেই ধর্ম জ্ঞান করে এদেশেরই কিছু তরুণকে টাকার লোভ দেখিয়ে ভুল পথে চালনা করে আত্মঘাতী বানাচ্ছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-উন্নতি বিঘ্নিত করতে চাইছে জনসাধারণের।

তিক্ত অনুভূতি হলো রানার মনে। এই তো সেদিন ও কাগজে দেখেছে চট্টগ্রামেরই কোথায় যেন একের পর এক মানুষ খুন করছে সীমান্তের ওপার থেকে আসা এক পাগলা হাতি—এরা সেই পশুর চেয়েও ক্ষতিকর, ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক। ঘাতক প্রাণী মেরে ফেললে দোষ হয় না হন্তার।

হঠাৎ চোখ তুলে রানা দেখল, একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছেন রাহাত খান, চুপচাপ লক্ষ করছেন ওর ভাবান্তর। নিচু কণ্ঠে ও বলল, 'সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকায় আদালতে এদের বিচার বা শাস্তি হবে না, সার। কিন্তু বেঁচে থাকলে সেই আদালতেই বোমা মেরে খুন করবে ওরা বিচারককে।'

মেজর জেনারেলের দৃষ্টি ফাঁকা হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য, নিজের ভেতরে জবাব খুঁজছেন যেন তিনি। তারপর নিয়ে ফেললেন সিদ্ধান্ত। ধীরে ধীরে পাশ ফিরে সরু একটা ফাইল তুলে টেবিলের উপর রাখলেন। ওটাতে কোনও টাইটেল নেই, টপ-সিক্রেট বোঝাতে কোনও লাল ফিতেও নেই। ফাইলটা টেবিলের উপর দিয়ে ঠেলে দিলেন তিনি রানার দিকে। 'মায়ানমার থেকে সীমান্ত পেরিয়ে পাগলা হাতি এসে আমাদের মানুষ খুন করছে। ওটা শিকারে আগ্রহী হতে পারো মনে করে তোমার জন্যে একটা

পারমিশন করিয়ে রেখেছিলাম। চিফ ফরেস্টারের সই করা পারমিট ফাইলেই পাবে। ডক্টর শামশের আলীর কাছ থেকে হান্টিং রাইফেল আর স্পেশাল গুলি গতকালই পেয়েছ। ওগুলো নিয়ে কী করবে, সে সিদ্ধান্ত তোমার।'

টেবিলের বামপাশ থেকে মোটাসোটা একটা ফাইল টেনে নিলেন বৃদ্ধ। তার মানে, এবার তুমি কেটে পড়ো, বাছা।

সরু ফাইলটা তুলে নিয়ে বৃদ্ধের অফিস থেকে বেরিয়ে গেল রানা নিঃশব্দে। হঠাৎ করে ঘুরলে ও দেখতে পেত, সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন কট্টর বৃদ্ধ ওর দিকে।

টেকনাফ এলাকায় পাগলা হাতির উপদ্রবের খবরটা চোখ এড়ায়নি বুড়োর, ভাবল রানা। ওদিকের কয়েকটা গ্রামে আট-দশজন লোক মেরে ফেলেছে একটা পাগলা সাদাহাতি। নাফ নদী পেরিয়ে মায়ানমার থেকে আসে মর্দা হাতিটা, বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়িঘর-খেতখামার নষ্ট করছে ওটা আশপাশের গ্রামগুলোতে। রাইফেল নিয়ে ওখানে যাবার মত ভালো একটা ছুতো বটে! বুড়োর ঘর থেকে বেরিয়ে ইলোরাকে কৌতূহল নিয়ে তাকাতে দেখে চোখ টিপল ও, তারপর ওর দিকে এগোবার ভঙ্গি করল; ভয় পেয়ে মেয়েটা টেবিল থেকে মোটা একটা রুল তুলছে দেখে হাসিমুখে বেরিয়ে গেল করিডরে। সিঁড়ি বেয়ে এক ফ্লোর নীচে নেমে নিজের অফিস কামরায় ফিরল ও। ঘড়ি দেখল, সকাল সাড়ে দশটা।

অফিসে ঢুকে প্রথমেই ওর সেক্রেটারি মিথিলাকে ছুটির দরখাস্ত টাইপ করতে বলল রানা, তারপর মন দিল ফাইলে। রাহাত খানের নিজ হাতে আঁকা সুন্দর মানচিত্রটা দেখে অবাক হলো ও। পথের দূরত্ব দেখানো হয়েছে সাড়ে দশ মাইল। তবে সেটা নাফ পেরোনোর পর। চোরাকারবারীদের ব্যবহৃত একটা মেটোপথের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও আছে। মানচিত্রটা সযত্নে পকেটে রেখে দিল ও। ওটা সংগ্রহের সেরা জিনিসগুলোর অন্যতম

হিসেবে মর্যাদা পাবে ওর কাছে বাকি জীবন।

ফাইলটা পড়া শেষ করে ড্রয়ারে রেখে তালা আটকাল রানা। সেক্রেটারি মিথিলা ছুটির দরখাস্ত নিয়ে আসায় চোখ বুলিয়ে দেখল ভুলভাল আছে কি না, তারপর প্রশংসার দৃষ্টিতে ওকে সিক্ত করে সই করে দিল। ওটা যাবে এবার চিফের কাছে।

কম্পাস, জাঙ্গল ফেটিগ, কমাণ্ডো নাইফ, কমব্যাট বুট, জাল বার্মিজ পরিচয়-পত্র, বার্মিজ গান-লাইসেন্স সহ ওর জন্য সাজিয়ে রাখা হ্যাভারস্যাকটা স্পেশাল এফেক্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে সংগ্রহ করে নিল রানা, রওনা হয়ে গেল লিফটের দিকে। ওর পরিচয়পত্রে লেখা আছে, ও মায়ানমার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের রেঞ্জার।

পাঁচ মিনিট পর প্রকাণ্ড দালানটার প্রশস্ত গেট দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে বেরিয়ে গেল রানার লরেল গ্রিন মেটালিক কালারের টয়োটা প্রিমিও সেডান।

তিন

চওড়া একটা বাঁক নিয়ে সাবলীল ভঙ্গিতে বাংলাদেশ বিমানের ফকার-২৮ নেমে এলো কক্সবাজার এয়ারপোর্টের রানওয়েতে, সংক্ষিপ্ত দৌড় শেষে রাজকীয় ভঙ্গিতে থেমে দাঁড়াল টার্মিনাল ভবনের সামনে। সিঁড়ি লাগানো হতেই খুলে গেল দরজা, সুন্দরী এয়ারহোস্টেস-এর মিষ্টি হাসি উপহার নিয়ে একে একে নামতে শুরু করল যাত্রীরা। সবার শেষে নামল সুদর্শন এক সুঠামদেহী যুবক—পিঠে একটা হ্যাভারস্যাক, হাতে কালো একটা লম্বা কেস। স্পেশাল পারমিশন নেওয়া আছে রানার, টারমিনাল ভবনে যেতে

হবে না ওকে। টারম্যাকে পা রাখতেই ওর পাশে এসে থামল সবুজ একটা ঝরঝরে জিপগাড়ি। ড্রাইভিং সিট থেকে লাফ দিয়ে নামল হাসি-খুশি এক সপ্রতিভ তরুণ, রানার হাত থেকে প্রায় জোর করে কালো কেসটা নিয়ে জিপের পিছনের সিটে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন, মাসুদ ভাই?'

'ভাল,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল রানা। 'তোমার কী খবর, তুহীন?'

'চলছে, মাসুদ ভাই।'

রাইফেলের কেসের পাশে হ্যাভারস্যাক নামাল রানা, চলে এলো সরাসরি কাজের কথায়, 'রুম বুক করা হয়েছে?'

'জী, মাসুদ ভাই। নাফ হোটেলের দোতলায় আপনার রুম। সিঁড়ির ডান পাশেরটা।' ইতস্তত করল তরুণ। 'ইয়ে, ঢাকা থেকে সোহেল ভাই বললেন, জিপ নিয়ে সরাসরি টেকনাফে চলে যাবেন আপনি। ড্রাইভার হিসেবে আমিও কি আসব আপনার সঙ্গে? সারাদিন অফিস করার পর নিশ্চয়ই ক্লান্তি লাগছে আপনার?'

'বিশ্রাম নিয়েছি দুপুরে,' বলল রানা। 'টেকনাফে পৌঁছেও কম করেও দু'ঘণ্টা রেস্ট নিতে পারব। তুমি পরে একসময় ওখান থেকে জিপটা সংগ্রহ করে নিয়ো—ঠিক আছে?'

'ওকে, মাসুদ ভাই।' ইগনিশন কী বাড়িয়ে দিল তুহীন, 'আমি তা হলে রিকশা নিয়ে শহরে চলে যাই।'

চাবিটা নিল রানা, বলল, 'রিকশায় ফিরতে হবে না, আমিই বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাব তোমাকে।'

খুশি হলো তরুণ বিসিআই এজেন্ট। কিছুক্ষণ মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গ পাওয়াও অনেক লাভ। হাসিমুখে উঠে বসল প্যাসেঞ্জার সিটে।

পনেরো মিনিট লাগল রিকশার ভিড়ে পথ করে চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের প্রশস্ত, নতুন মহাসড়কে উঠতে। ডানে তাকিয়ে বঙ্গোপসাগরের গায়ে শেষ বিকেলের চোখ ধাঁধানো সোনালী সূর্যটাকে জ্বলজ্বল করতে দেখল রানা। তুহীনকে ওর বাসায়

নামিয়ে দিয়ে ছুটল জিপ। রামু পর্যন্ত চমৎকার রাস্তা, ওখান থেকে ডাইনে মোড় নিয়ে পড়ল টেকনাফের পথে। মিটারে চোখ বুলিয়ে আগেই নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে রানা, ট্যাঙ্ক ভরা আছে ফিউয়েলে। একসেলেরেটার পেডালে চাপ দিয়ে টের পেয়েছে, দেখতে ঝরঝরে হলে কী হবে, ফাইন টিউন করা রিকণ্ডিশণ্ড ইঞ্জিন সাড়া দেয় একটু ইশারা পেলেই।

কিন্তু স্পিড তোলার উপায় নেই। সরু পথ।

খানিক পরেই সন্ধ্যা নেমে আসবে বলে রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা কম—হিমছড়ি যাবার *চাঁদের গাড়ির* মতো প্রাচীন ছাদখোলা জিপ, ধোঁয়া তৈরির কারখানা নড়বড়ে বেবি ট্যাক্সি আর দু'একটা ছ্যাকরা বাস।

রাস্তার দু'পাশে ডানে-বামে ফসলের সবুজ খেত, কখনও দু'একটা ছনের ঘর, কখনও-সখনও নিচু টিলার উপর অপূর্ব সুন্দর ঐতিহাসিক বৌদ্ধ মন্দির। আঁকাবাঁকা সরু পথে একটানা কিছুক্ষণ চলার পর রানার মনে হলো, গোলকধাঁধায় পড়ে একই পথে ঘুরপাক খাচ্ছে বুঝি ও, গন্তব্যে পৌঁছনো যাবে না কোনওদিন।

সূর্যটা আকাশ রাঙিয়ে দিয়ে ডুবে গেল দিকচক্রবালের ওপারে। তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝপ্ করে নেমে এল অন্ধকার। ঘড়ি দেখল রানা, সোয়া ছ'টা। গতি আরও কমাতে হলো ওকে।

হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোর আকর্ষণে ছুটে এসে জিপের উইণ্ডশিল্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভর্তা হচ্ছে অজস্র বেপরোয়া পোকা। আরও দু'ঘণ্টা পর সড়কের সবচেয়ে উঁচু খাড়াইটার উপর উঠে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট নীচে ঢালের শেষে টেকনাফ শহরের বৈদ্যুতিক বাতির দেখা পেল রানা।

রাত নেমেছে বলে রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে এসেছে শহরের। সাদা রং করা তিনতলা নাফ হোটেলে পৌঁছতে দশ মিনিটও লাগল না ওর। হোটেলের লবিতে বরাবরের মতোই টিভি চলছে।

সোফা, চেয়ার ও টুলে বসে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের খেলা দেখছে অনেকে। তাদের কেউ কেউ তাকাল নবাগত যুবকের দিকে, বুঝে নিল, আরও একজন ট্যুরিস্ট এসেছে; তারপর আবার মনোযোগ ফেরাল খেলায়।

কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কোঁচকানো শার্ট, লুঙ্গি ও নোংরা টুপি পরা দাড়িওয়ালা ম্যানেজারকে চোখ তুলে পান-খাওয়া খয়েরী দাঁতগুলো বের করতে দেখে বলল, 'তিনদিনের জন্যে একটা রুম বুক করা হয়েছে আমার নামে। আমি মাসুদ রানা।'

ঘনঘন মাথা ঝাঁকাল ম্যানেজার, রেজিস্টার এগিয়ে দিয়ে দেখাল কোথায় রানাকে সই করতে হবে। সই করা হয়ে যেতেই পিছনের বোর্ড থেকে রুমের চাবিটা কাউন্টারের উপর রেখে মিশ্র আঞ্চলিক টানে বলল, 'রুম নম্বর দুইশত এখুঁশ। খানা কি রুমে ফাডাই দিমু?'

দুটি বাক্যেই রানা বুঝে নিল, এ-লোক নোয়াখালির; তবে বহু বছর আছে এই অঞ্চলে। এখন কথা বলছে চট্টখালির ভাষায়।

'না। রেস্টুরেন্টেই খেয়ে নেব।' বেয়ারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে দেখে কাউন্টারে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেলের কেসটা তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিল রানা।

ও পা বাড়াতেই ম্যানেজারের চোখ গেল লম্বাটে কালো বাক্সটার দিকে। কৌতূহলের ছাপ পড়ল তার চেহারায়, জিজ্ঞেস করল, 'ওইডাত কী, বাই?'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে চাইল রানা। 'অস্ত্র।'

'অস্ত্র!' ম্যানেজারের বিস্মিত কণ্ঠস্বর শুনে উপস্থিত সবাই ফিরে তাকাল এদিকে। 'অস্ত্র খীজইন্য?'

খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অসুবিধে নেই, তাই মৃদু হেসে বলল রানা, 'হাতি। পাগলা হাতি মারার জন্যে।' বুকপকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে এমন ভাবে তুলে ধরল, যাতে

কামরার সবাই দেখতে পায়। 'সরকারী পারমিট। আমি এসেছি পাগলা হাতি শিকার করতে।'

অবাক চোখে দেখল ওকে সবাই ।

'আঁই তো মনো কইচ্চিলাম সন্ত্রাসীই নি,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হাসল ম্যানেজার। 'বালো, বালো। হাতিখান মাইন্ন্যেষ মারি তরাস সিষ্টি করি লাইসে। খামের খাম ওইব ওইগারে মারি লাইলে।'

'সে-চেষ্টাই করব,' বলে সিঁড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। ওর দিক থেকে আবার টিভির দিকে চলে গেল দর্শকদের দৃষ্টি। চিৎকার শুনে বোঝা গেল, ছক্কা মেরেছে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান।

অ্যাটাচ্‌ড্‌-বাথরুম সহ ডাবল-বেড ঘরটা মাঝারী আকারের, তবে সাজানো-গোছানো। বিদেশি ট্যুরিস্টদের কথা মনে রেখে তৈরি।

শাওয়ার সেরে পরিচ্ছন্ন হয়ে আধঘণ্টা পর নীচের রেস্টুরেণ্টে নেমে এলো রানা, মেনু দেখে মুরগির মাংস, সবজি, ডাল ও ভাতের অর্ডার দিল।

ঝালের কারণে খাওয়া গেল না। একগ্রাস খাবারের সঙ্গে আধগ্লাস করে পানি গিলে কোনওমতে সিকিভাগ খাবার পেটে চালান দিয়ে উঠে পড়ল রানা। বিল মিটিয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরল। হাত-ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল বিছানায়, চোখ বুজল। ঘড়িতে বাজে দশটা, রাত ঠিক বারোটার সময় রওনা হবে, স্থির করেছে ও। দু'ঘণ্টা বিশ্রাম নিলে তরতাজা হয়ে উঠতে পারবে।

ঘুমিয়ে পড়ল রানা দু'মিনিটের মধ্যে।

বারোটা বাজবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে লবিতে নেমে ম্যানেজারকে দেখল না ও। লবি ফাঁকা হয়ে গেছে। টিভি বন্ধ। ম্যানেজারের চেয়ারের পাশে একটা টুলে বসে ঝিমাচ্ছে কমবয়সী একজন বয়। পিঠে হ্যাভারস্যাক, কাঁধে রাইফেল নিয়ে ওকে

নামতে দেখে ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে ড্যাবড্যাব করে তাকাল সে।

'ম্যানেজার সাহেবকে বোলো, আমি হাতি শিকারে বেরিয়ে গেছি,' তাকে বলল রানা। 'আমার গাড়িটা থাকল, যদি এদিক দিয়ে না ফিরি, তা হলে দু'একদিনের মধ্যে তুহীন নামে এক ভদ্রলোক এসে নিয়ে যাবেন ওটা।'

'জে, সার।'

বয়-এর হাতে রুমের চাবিটা দিয়ে লবি থেকে বেরিয়ে আঙিনা পার হয়ে অন্ধকার রাস্তায় চলে এলো রানা, রওনা হয়ে গেল নাফ নদীর সমান্তরাল একটা সরু রাস্তা ধরে। রাস্তার ওপার থেকে দাঁত খিঁচিয়ে ঘেউ-ঘেউ করে হুমকি দিল একটা নেড়ি কুত্তা, তবে প্রতিপক্ষের আচরণে ভয়ের চিহ্ন নেই দেখে উৎসাহ হারাতে দেরি করল না।

অস্ত্রসহ রানাকে হনহন করে হাঁটতে দেখে বিডিআর-এর টহলদার জওয়ানরা থামাল একবার মাঝপথে। শিকারের পারমিট আর অস্ত্রের লাইসেন্স দেখিয়ে ডিউটি অফিসারের হাত থেকে ছাড়া পেল ও, হাঁটার গতি বাড়াল আরও।

বাতাসে সাগরের লোনা গন্ধ। দূরে কোথাও রেডিওতে বাজছে পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়ার বাঁশীতে মিয়া কি টোড়ি। আঁধার রাত। নির্মেঘ আকাশে হাজারো লাল-নীল-হলুদ নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে, কালো মখমলের মসৃণ চাঁদোয়ার বুকে আবছা আলো ছড়াচ্ছে। বাতাসে ভাসছে গম্ভীর, মোটা আড় বাঁশীর জাদু।

শহর থেকে বেশ অনেকটা দূরে সরে এসে বাঁক নিয়ে পৌঁছে গেল রানা নাফের তীরে। অনেকগুলো চারদিক খোলা ছাপড়া ঘর দেখা গেল এখানে। সম্ভবত সপ্তাহের বিশেষ কোনও দিনে হাট বসে, এখন জনশূন্য, নিঝ্‌ঝুম। পাড়ে বাড়ি খেয়ে মৃদু ছলাৎ-ছল আওয়াজ করছে নাফের পানি। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে সাগরের গা ছমছম করা শোঁ-শোঁ গর্জন। সাগর থেকে নাফের উজানে

এগিয়ে আসছে উজ্জ্বল একটা চোখ-ধাঁধানো বাতি। নেভির পেট্রল বোট।

বেশ কয়েকটা জেলে নৌকা বাঁধা আছে ঘাটে। ছইওয়ালা নৌকাই বেশি। ওগুলোর একটাতেও কুপির আলো জ্বলছে না। কেউ যদি ছইয়ের ভিতরে থেকেও থাকে, এতক্ষণে ঘুমে বিভোর।

সিগারেট ধরিয়ে চারপাশে নজর বুলাল রানা। ঘাটে পাহারাদার নেই। বোধহয় ঘুমিয়ে হালাল করছে বেতনের টাকা। নৌকাগুলোর পাশ দিয়ে নদীর তীর ধরে কিছুদূর হেঁটে ঢেউয়ের দোলায় দোদুল্যমান ছোট্ট একটা ডিঙি পছন্দ হলো ওর। চোরের মতো আশপাশ দেখে নিয়ে ডিঙিতে উঠে পড়ল রানা। সিগারেট ফেলে দিয়ে কাঁধের বোঝা নামিয়ে বৈঠা খুঁজতে গিয়ে ওর ধারণা হলো, নৌকা-চোর বোধহয় আরও আছে এদিকে। পাটাতনের নীচেও বৈঠা নেই, ডিঙির মালিক বাড়ি নিয়ে গেছে তার বৈঠা।

একটু পর ঘাটের কাছে বাঁধা ছইওয়ালা একটা পেটমোটা নিঃসঙ্গ নৌকা তার দুটো বৈঠার একটাকে হারাল চিরতরে, ডিঙি নৌকার হুঁশিয়ার মালিক হারাল তার ডিঙি। সার্চলাইট জ্বেলে এক চোখো দানবের মতো পাশ কাটাল নেভির পেট্রল বোট। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বৈঠা বেয়ে রওনা হয়ে গেল রানা উত্তর-পুব দিকে। স্রোত ওকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইল দক্ষিণে, সাগরের দিকে, তবে রুখতে পারল না নৌকার অগ্রগতি। একটু একটু করে কাছে চলে এলো মায়ানমারের পাহাড়ি উপকূল।

কিছুক্ষণ পর ঝাঁকি খেল ডিঙি, ঘশ্‌শ্‌শ্‌ আওয়াজ করে তলা ঠেকে গেল বালিতে। হ্যাভারস্যাক ও রাইফেল তুলে নিয়ে নদীর তীরে নামল রানা, আঁচ করল, অনেকখানি সরে গেছে ও স্রোতের টানে—টিলাটক্করের মাঝ দিয়ে ওকে যেতে হবে উত্তর-পুবে। ওদিকেই কোথাও থুরং গ্রাম।

গলুই ধরে ডিঙিটাকে জোরে একটা ঠেলা দিল রানা মাঝনদীর দিকে, যেন ফেরত পাঠাতে চায় ওটা মালিকের কাছে। আসলে,

ওটাকে ভাসিয়ে দিয়ে ও কোথায় নেমেছে তার প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করল। হেলে-দুলে চলল নৌকা সাগরের দিকে। তীরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল রানা, এটা নদী পারাপারের জায়গা নয় বলে মায়ানমার সীমান্তরক্ষীদের এদিকে থাকার কোনও কারণ নেই, তবুও ওর কান খাড়া। ঝিঁঝি ডাকছে জোরেশোরে, বালির তটে পানির চাপড়ের মৃদু শব্দ, পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই একটা বাদুড় উড়ে গেল নাকের উপর দিয়ে বাংলাদেশের দিকে। বিশ্রাম নিয়ে অপ্রশস্ত সৈকত পেরিয়ে আগাছা ভরা টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা, মেজর জেনারেল রাহাত খানের আঁকা মানচিত্র অনুযায়ী ওর গন্তব্য দশ কি এগারো মাইলের মত বড়জোর। চোরাকারবারীদের ব্যবহৃত পথটা পাবার পর থুরং গ্রামে পৌঁছে যেতে হবে শেষরাতের আগেই। টিলার মাথায় উঠে কম্পাস দেখে দিক ঠিক করে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল রানা মাঝারি গতিতে।

রাত সোয়া একটার দিকে পৌঁছে গেল ও নির্দিষ্ট ল্যাণ্ডমার্ক-এর কাছে। বৃক্ষশূন্য উঁচু পাহাড়ের কোল জুড়ে বসে আছে বিশাল বৌদ্ধ মন্দিরটা, বেশ দূর থেকেও দেখা যায়। পড়ো মন্দিরে বুদ্ধের আরাধনা করবার মতো কেউ এখন আর নেই বোধহয়। মন্দিরের গায়ে জন্মেছে কয়েকটা বটগাছ। ওগুলোর বয়সও নেহায়েত কম নয়, জটা পাকানো দাড়ির মতো ঝুরি ছেড়ে দিয়ে থম মেরে আছে, যেন ছড়াচ্ছে অশুভ কোনও বার্তা।

মন্দিরের পায়ের কাছ দিয়ে গর্জন-চাপালিস আর বয়রা গাছের ঘন জঙ্গলের বুক চিরে এঁকেবেঁকে পুবে চলে গেছে চোরা-কারবারীদের ব্যবহৃত সেই মেটো পথ, বারবার উঁচু-নিচু হয়েছে ছোটখাটো টিলার কারণে। তিনমাইল ওই নির্জন পথেই থাকল রানা। পাহাড়ি গাছগুলোর পাতার তৈরি ঘন আচ্ছাদনের ফাঁক দিয়ে নামল কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদের মায়াভরা রূপালী আলো, ম্লান করে দিল নক্ষত্রগুলোকে। সুবিধে হলো পথ চলতে।

হাত-ঘড়ির লিউমিনাস ডায়াল দেখল রানা। দুটো পঁয়তাল্লিশ।

পিছিয়ে পড়েনি ও। আরও আধমাইল যাবার পর চওড়া হলো জংলা পথ। দেড় মাইল হাঁটার পর পথের এ অংশে লোক চলাচল আছে বলে মনে হলো ওর, ছাঁটা হয়েছে পথের দু'ধারে আগ্রাসী ঝোপঝাড়ের ডালপালা। একটা বাঁক ঘুরে দেখতে পেল বাঁশ ও কাঠের তৈরি ছোট ছোট কুটির। কুকুর থাকতে পারে গ্রামে। তেড়ে এলে খুন করতে হবে ওগুলোকে। আওয়াজে ঘুম ভেঙে জড় হয়ে যেতে পারে লোকজন।

নিঝুম রাতের ঘুমন্ত গ্রাম দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে আবার সরু, আঁকাবাঁকা পথে উঠল রানা, কম্পাস রিডিং দেখল, ঠিক পথেই আছে। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে উত্তর-পুব দিকে গেছে উঁচু-নিচু রাস্তা। গতি বাড়াল চলার।

পৌনে চারটের দিকে লক্ষ করল, পাতলা হয়ে আসছে জঙ্গল। প্রথমে ওর মনে হলো প্রচুর বাঁশ ও কলাগাছ জন্মেছে এদিকটায়, তারপর এখানে-ওখানে ফসলের মাঠ ও বাড়ি-ঘর চোখে পড়তেই বুঝতে পারল, চলে এসেছে ও থুরং গ্রামের কাছে। পথ ছেড়ে সরে গিয়ে বর্ধিষ্ণু গ্রামটা ঘুরে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোল রানা, লক্ষ রাখল রোহিঙ্গা বসতিটার দিকে।

থুরং গ্রামের বাড়িগুলো একটা থেকে অন্যটা খুব দূরে নয়, কিন্তু ডানদিকের চৌকো একটা বড় মাঠের একপাশে কুটিরের সংখ্যা অনেক বেশি মনে হলো ওর। কুটিরগুলো অপেক্ষাকৃত নতুনও। দু'চারটে তাঁবুও রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ওগুলোই বুঝিয়ে দিল, আসলে মাওলানা আব্দুল হান্নানের অনুসারী জঙ্গিদের আস্তানায় পৌঁছে গেছে ও।

পাহারাদার আছে জঙ্গিদের ক্যাম্পের সীমানার বাইরে, জঙ্গলের কিনারায়। তাদের একজনকে দক্ষিণমুখী হয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসে গাছের গোড়ায় পানি ছিটাতে দেখল ও। লোকটার সিগারেটের আগুন উজ্জ্বল হচ্ছে থেকে থেকে। কাজ সেরে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল সে, রাইফেলটা নেড়েচেড়ে কাঁধে ঠিকমত

ঝুলিয়ে নিয়ে টহল শুরু করল মাঠের প্রান্ত ধরে।

নিশ্চিন্তে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে পুবদিক লক্ষ্য করে পা বাড়াল রানা। পঞ্চাশ ফুট যাওয়ার আগেই ওর গায়ে ঠাণ্ডা পরশ বুলিয়ে বয়ে গেল একঝলক তাজা হাওয়া। একটু পরেই রক্তহিম করা গর্জন ছাড়ল কয়েকটা কুকুর। উঁচু গলায় সঙ্গীকে কী যেন বলল প্রহরীদের একজন, কথাগুলো বুঝতে পারল না ও।

'খাঁচা খুলে দে ছেড়ে,' কুকুরের গর্জনের উপর দিয়ে শুনতে পেল কর্কশ কণ্ঠের জবাবটা। 'শিয়াল-টিয়াল হবে। তাড়িয়ে দিয়ে আসুক।'

এক ঝটকায় পিঠ থেকে হ্যাভারস্যাক নামিয়ে চেইন টেনে ব্যাগ খুলল রানা, ত্রস্ত হাতে বের করে আনল প্লাস্টিকের ছোট কৌটোটা, তারপর হ্যাভারস্যাক পিঠে ঝুলিয়ে কৌটার মুখ খুলে গুঁড়ো-মরিচ ছিটাতে ছিটাতে ঝেড়ে দৌড় দিল জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে। বারকয়েক হোঁচট খেল হ্যাভারস্যাকটা পিঠের উপর লাফাতে শুরু করায়। বোধহয় ঢিল হয়ে গেছে স্ট্র্যাপ। ইংলিশ-উইন্টার থার্মোফ্লাস্কের ভেতরে ঝাঁকি খেয়ে ঢুকঢুক আওয়াজ তুলল পানীয়।

হঠাৎ কয়েকগুণ বেড়ে গেল কুকুরের হুঙ্কার। ছেড়ে দেয়া হয়েছে ওগুলোকে। গা শিউরানো গর্জন শুনে মনে হয় ডোবারম্যান। শিকার ও শিকারীদের দূরত্ব কমছে দ্রুত। সোৎসাহে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল হিংস্র জন্তুগুলো।

প্রাণটা হাতে নিয়ে উড়ে চলল রানা, তারপরও ধাওয়ারত ডোবারম্যানের সঙ্গে দূরত্ব কমল না ওর। কাছিয়ে এলো ঘেউ-ঘেউ হুঙ্কার। দু'মিনিট বড়জোর, তারপরেই শিকারের সন্ধান পেয়ে যাবে খুনি ডোবারম্যানগুলো, নাগালে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে রানার কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেলবে কোনও একটা, বাকিগুলো টুকরো টুকরো করবে ওকে। কয়েক সেকেণ্ড পর আরও বেড়ে গেল গর্জন, এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে গলা ফাটাতে লাগল হিংস্র জন্তুগুলো। খেপে

গেছে মরিচের গুঁড়োর ঝাঁজাল গন্ধে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে।

পাঁচ মিনিট একটানা প্রাণপণ দৌড়ে অনেকখানি সরে গেল রানা, তারপর কুকুরের চিৎকার শুনতে না পেয়ে হাঁটতে শুরু করল বিড়ালের মতো নিঃশব্দে।

তবে ওর চেয়ে নিঃশব্দ বিড়ালও আছে। পাঁচফুট দূরে গাছের আড়াল থেকে লোকটাকে বের হতে দেখল রানা, রাইফেল তুলছে কাঁধে। ওকে দেখেছে আগেই, কাছে আসায় পোশাক দেখে নিশ্চিত হয়ে গেছে, এ-লোক তাদের দলের কেউ নয়। রানা ছয় ফুট দূরে থাকতে গর্জে উঠল, 'হ্যাণ্ডস আপ!'

লাফ দিল রানা। সামনে। বাম হাতে রাইফেলের নলটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল, ডান হাতে কোমরের খাপ থেকে এক ঝটকায় বের করে আনল কমাণ্ডো নাইফটা। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে সরে যেতে চাইল লোকটা, সেইসঙ্গে চেষ্টা করছে রাইফেল তাক করতে।

আরও এক পা সামনে এগিয়ে বামহাত বাড়িয়ে খাকি ফেটিগ পরা প্রহরীর দাড়ি খামচে ধরল রানা, সজোরে নীচের দিকে টান দিয়েই ছোরার কোপ বসাল ঘাড়ে। পরমুহূর্তে পোঁচ দিল সামনে-পিছনে। *ফচ্* শব্দ করে ফাঁক হলো লোকটার ঘাড়ের মাংস, কচকচ করে হাড় কেটে কণ্ঠনালী ছিঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো ছোরা। ছিন্ন মস্তকটা মাটিতে পড়ে গড়িয়ে গিয়ে স্থির হলো দু'ফুট দূরে। ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হলো লোকটার কাটা গলার ভিতর থেকে। রাইফেল ছেড়ে দিয়েছিল আগেই, এবার নিঃশব্দে কাত হয়ে পড়ে গেল লোকটা মাটিতে, তড়পাতে শুরু করল জবাই করা গরুর মতো। একমিনিট পার হবার আগেই নিথর হয়ে গেল দেহটা।

একটা ঝোপের ভিতর ঢুকে অপেক্ষা করল রানা। আরও প্রহরী থাকতে পারে। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল, জঙ্গলের স্বাভাবিক শব্দ ছাড়া অন্য কোনও আওয়াজ নেই, এগিয়ে এলো না কেউ। মৃত লোকটার খোঁজ পড়েনি এখনও। গ্রামের সীমানায়

টহল দেবার জন্য বেশ কয়েকজন লোক রেখেছে নিশ্চয়ই জঙ্গিরা, তাদের কেউ চলে আসবার আগেই দেহটার ব্যবস্থা করা দরকার।

মোটা একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেস দিয়ে লাশটা বসিয়ে রেখে চারপাশ সাবধানে ঘুরে দেখে এলো রানা, তারপর লাশটা টেনে নিয়ে বারোফুট দূরে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলল। মুণ্ডুটাও স্থান পেল খণ্ডিত দেহের পায়ের কাছে। আট ইঞ্চি ব্লেডের ছোরাটা মুছে নিয়ে রেখে দিল খাপে। এবার দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল রানা গ্রাম ও তার পাশের মাঠ পিছনে ফেলে—আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক।

রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মাঝখানে চুপচাপ পড়ে আছে জঙ্গিদের ট্রেইনিং গ্রাউণ্ড। ফিযিকাল ট্রেইনিঙের বিভিন্ন গ্যাজেটগুলো বাংলাদেশ আর্মির ট্রেইনিং গ্রাউণ্ডের অনুকরণে তৈরি। ছোটখাটো একটা শুটিং রেঞ্জও চোখে পড়ল রানার। সবই থুরঙের ধারে-কাছে।

গ্রামটা অনেকখানি পিছনে ফেলে এসে নিশ্চিন্ত হলো রানা। গভীর জঙ্গলে প্রহরী রাখার কথা নয় জঙ্গিদের।

এখান থেকে বড়জোর দু-আড়াই মাইল দূরে রয়েছে বার্মিজ জমিদারের সেই কুঠি।

সামনের জঙ্গল আবার আগের মতই ঘন, জনবসতির চিহ্নও চোখে পড়ল না আর। বিশ্রাম নিতে থামল রানা, পিঠ ও কাঁধের বোঝা নামিয়ে বসল সেগুনগাছের গোড়ায়। ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছে পুব আকাশের কালো রং। সূর্য উঠতে দেরি আছে, তবে একটু পরেই ধূসর হয়ে যাবে ওদিকটা। থমথমে অরণ্যে কানে এলো ছোটখাটো প্রাণীদের চলাফেরার মৃদু শব্দ। দূরে আউ-উ-উ-উ-উ আওয়াজ করে নেকড়ের মতো ডাক ছাড়ল গোটা দুয়েক রামকুত্তা। উঠে পড়ল রানা।

দুটো টিলা টপকানোর পর দু'দিকের অজস্র কাঁটাঝোপ ও লতাগুল্মে ভরা ঘন জঙ্গলের কারণে গোলমত আরেকটা উঁচু টিলায়

উঠতে বাধ্য হলো রানা। আকাশ ধূসর হয়ে গেছে, কিন্তু চারপাশের গাছপালার জন্য উপর থেকে নীচের উপত্যকা চোখে পড়ল না ওর। কাছেই কোথাও থাকার কথা বার্মিজ জমিদারের সেই শিকার-কুঠি। তরতর করে উঠে গেল রানা উঁচু একটা গর্জন গাছের মগডালে। ওখান থেকে চারপাশ দেখা গেল ছবির মতো পরিষ্কার।

টিলার ঢালের যেখানে শেষ, সেখান থেকে পাঁচশ' মিটার দূরে আয়তাকার উপত্যকার মাঝখানে টলটলে পানির গোলাকার দিঘিটা যেন রূপালি এক চকচকে আয়না। জমিদার বলে কথা, দিঘির ব্যাস ছয়-সাতশ' মিটারের কম হবে না। ওপারে, সবুজ ঘাসে ছাওয়া লনের পিছনে দোতলা কুঠিটা দেখে মনে হলো রূপকথার কোনও নিঃসঙ্গ রাজকন্যার অভিশপ্ত বন্দিশালা। পুবের ঢেউ খেলানো ধোঁয়াটে পাহাড়গুলোর ওপার থেকে বিরাট সোনালী গোলকের মতো মুখ তুলছে সূর্য। তারপরও চারপাশের সবকিছুতে হালকা কুয়াশার আলতো পরশ।

চারদিক আরও ভালভাবে রেকি করতে গাছের উপর আরও কিছুক্ষণ থাকবে বলে ঠিক করল রানা।

ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে পুবের কুয়াশামোড়া নীলচে পাহাড় ডিঙিয়ে সবুজ উপত্যকায় চলে এল প্রথম-সকালের নরম রোদ, ঝলমল করে উঠল দিঘির পানি।

সযত্নে সাজানো-গোছানো সব, কিন্তু মানুষজনের দেখা নেই। মনে হচ্ছে, যেন থিয়েটারের রোমাঞ্চ জাগানিয়া শূন্যমঞ্চ।

পকেট থেকে খুদে বিনকিউলার বের করে কুঠির আশপাশে চোখ বোলাল রানা। এই টিলা থেকে নেমে উপত্যকায় যেতে হবে ওকে, তারপর উঁচু ঘাসবনের মাঝ দিয়ে পৌঁছতে হবে দিঘির পারে, নইলে রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে আসবে না ওই কুঠি। টিলার নীচে ঢালের যেখানে শেষ, সেখানেই থেমে গেছে চাপালিস, বয়রা, সেগুন, শাল ও গামারী গাছের সারি। ওখান

থেকে হাঁটু-সমান ঘাসের আরও পাঁচশ' মিটার উন্মুক্ত বিস্তৃতি পেরিয়ে তারপর ওই বিশাল জলাশয়ের তীর—ছাড়া ছাড়া ভাবে জন্মানো গাব, ছাতিম, নারকেল ও চাপালিস গাছগুলোর ওপাশে। ওপারের কুঠিটা সেখান থেকে অন্তত সাড়ে সাতশ' মিটার দূরে। কুঠির কাছাকাছি দিঘির উপর তিন উচ্চতার তিনটি ডাইভিং বোর্ড দেখা যাচ্ছে। ওদিকটায় সামান্য কিছু ঝোপ-ঝাড় ও বড় কয়েকটা গাছ আছে বটে, কিন্তু ওগুলোর কাছে যাওয়া যাবে না—তাতে ঝুঁকি নিতে হবে অনেক বেশি। কুঠির কেউ ওকে দেখে ফেললে আড়াল থেকে গুলি করে ফেলে দিতে পারবে সহজেই।

কুঠি-বাড়ির জানালাগুলোর কোনোটাতেই সরানো হয়নি পর্দা, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে না। তার মানে, নাস্তার আয়োজন করছে না কেউ।

লোকচক্ষুর অন্তরালে কি নামাজ পড়ে ওরা? ফযরের নামাজের জন্য ওঠেনি নাকি? নাকি নামাজ পড়ে আবার ঘুমিয়েছে? কখন উঠবে ঘুম থেকে? কী করবে উঠে? দিঘিতে জলকেলি করত বার্মিজ জমিদার, সেজন্যই তীরে ওই শৌখিন ডাইভিং বোর্ড তৈরি করেছিল। হাজি আব্দুল হান্নান আর মুফতি আলাওয়াল হানিফীও কি দিঘিতেই নামবে গোসল করতে? করলে কখন? রোদের তেজে ভ্যাপসা গরম বাড়ছে। বিনকিউলারটা পকেটে রেখে দিয়ে সারাদিন অপেক্ষার মানসিক প্রস্তুতি নিল রানা। দিনশেষেও যদি দিঘির তীরে লোকগুলো না আসে, তা হলে ঝুঁকি নিয়ে কুঠির কাছে যেতে হবে ওকে।

কিছুক্ষণ পর কুঠির বামদিকের কোনায় ছোট একটা জানালা খুলে যেতে দেখে গর্জন গাছ থেকে নেমে পড়ল রানা, দ্রুতপায়ে নিঃশব্দে নামতে শুরু করল টিলার ঢাল বেয়ে। তবুও ওর অস্তিত্ব অজানা থাকল না জঙ্গলের প্রাণীদের কাছে—টিঁ-টিঁ করে ডাক ছেড়ে প্রতিবেশীদের সতর্ক করে দিল কয়েকটা হট্টিটি পাখি, সঙ্গে সঙ্গে কিচিরমিচির করে সাড়া দিল গাছে গাছে বানরের দল।

টিলার ঢালের শেষ ঝোপ থেকে ক্ষুর দাপিয়ে ঘন জঙ্গলের দিকে দৌড়ে চলে গেল একটা মস্ত শিংওয়ালা গয়াল হরিণ, লাল ঝুঁটিওয়ালা একটা কাঠ-ঠোকরা পাখনায় উজ্জ্বল হলদে-সবুজের ছিট নিয়ে লুকিয়ে পড়ল অচেনা গাছের খোঁড়লে, ছোটাছুটি করে গাব গাছের নিবিড় পাতায় তৈরি বর্মের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজল লম্বা লেজওয়ালা দুটো কালো রঙের দৈত্য-কাঠবিড়ালি।

বুনো প্রাণীদের সতর্কতাসূচক আওয়াজে কারও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় কি না ভেবে শঙ্কা বোধ করল রানা। বিনকিউলার চোখে কেউ যদি আঙিনা থেকে এদিকে তাকায়, তা হলে ঘাসের বন পাড়ি দিয়ে গোপনে দিঘির তীরে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে ওর পক্ষে।

টিলার গোড়ায় পৌঁছে ঢালের শেষে একটা শিলকড়ই গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা, কালো ধোঁয়ার সরু রেখা বের হতে দেখল কুঠির বামপাশের চিমনি থেকে। নাস্তা তৈরি হচ্ছে হেঁসেলে।

ডিমভাজা, মাংস, মচমচে বাটারটোস্ট আর কফির স্বাদ মনে পড়ে গেল ওর। টের পেল, খিদেয় জ্বলছে পেট। গাছের গুঁড়ির আড়ালে বসে হ্যাভারস্যাক থেকে রাঙার মা'র তৈরি চমৎকার স্বাদের হান্টার বিফ পোরা স্যাণ্ডউইচ বের করে কামড় বসাল ও, মাঝে মাঝে ঠোঁটে ফ্লাস্ক ঠেকিয়ে চুমুক দিল আধাআধি ব্র্যাণ্ডি মেশানো কড়া কালো কফিতে। গলা জ্বালিয়ে নেমে গেল গরম তরল, উষ্ণ হয়ে উঠল পেটের ভিতরটা। চাঙ্গা হতে সময় নিল না ক্লান্ত শরীর।

স্যাণ্ডউইচ শেষ করে ঘড়ি দেখল। সোয়া ছ'টা। দিঘির দিকে তাকিয়ে গাছগুলোর মাঝ থেকে আড়াল হিসেবে ওর পছন্দ হলো মোটা একটা চাপালিস গাছ। ওটার পিছনে দাঁড়িয়ে দিঘি ও বাড়ির যে-অংশটা ওর দেখতে পাওয়া দরকার, চোখ বোলানো যাবে সেখানে। আধমিনিট পর ক্রল করে এগোল ও দেড়ফুট উঁচু

ঘাসের ভিতর দিয়ে। এক ঝলক উচ্ছল হাওয়া ঘাসবন দুলিয়ে দিয়ে চলে গেল দিঘির দিকে। ভালোই তো, ঘাসের বনে ওর নড়াচড়া কারও চোখে পড়বে না মাঝে মাঝে এরকম হাওয়া বইলে।

বামদিকে কিছুটা দূরে টিলার গোড়ায় ঘাসবনের প্রান্তে মট করে ভাঙল গাছের সরু একটা শুকনো ডাল। জায়গায় জমে গেল রানা। তারপর আর কোনও শব্দ নেই। লুকিয়ে থাকা শিকারী চিতার মতো কান পেতে আছে ও, পাথরের মূর্তি হয়ে অপেক্ষা করছে। গড়িয়ে গেল পুরো পাঁচটা মিনিট।

বুনো জন্তু বা পাখি গাছের ডাল ভাঙে না। মরা শুকনো ডাল মানেই তাদের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। ভেঙে যেতে পারে এমন কোনও ডালে কখনও বসেই না কোনও পাখি। পালানোর জন্য নিতান্ত বাধ্য না হলে শব্দ করে না এমনকী গয়াল হরিণের মতো বড় প্রাণীও। তা হলে কি মাওলানা আব্দুল হান্নান ও আলাওয়াল হানিফী নিজেদের প্রহরায় সশস্ত্র জঙ্গি রেখেছে? কোমর থেকে ওয়ালথারটা নিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে সাইলেন্সার বের করল রানা, পিস্তলের নলে পেঁচিয়ে আটকে নিল সাইলেন্সার। সেফটি অফ করে অপেক্ষায় থাকল। একটু পর একটা কমবয়সী মাদী হরিণ বেরিয়ে এলো টিলার গোড়ার জঙ্গল থেকে, দুলকি চালে রওনা হয়ে গেল উপত্যকার বাঁ দিক লক্ষ্য করে। বারকয়েক পিছনে তাকাল ওটা, তবে সেইসঙ্গে ঘাস ছিঁড়ে মুখেও পুরল। উপত্যকা পেরিয়ে চলে গেল হরিণটা বাঁ দিকের জঙ্গলের ভিতর। কোনও ভয় বা তাড়াহুড়োর চিহ্ন নেই ওটার আচরণে। শুকনো ডাল বোধহয় ওই হরিণের ক্ষুরের চাপেই ভেঙেছিল। বড় করে শ্বাস ফেলে চাপা উত্তেজনা দূর করতে চাইল রানা। রওনা হয়ে যাওয়া দরকার। সেফটি অন করে কোমরের ডানদিকে বেল্টের নীচে গুঁজে রেখে দিল সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল।

উঁচু ঘাসের ভেতর দিয়ে পাঁচশ' গজ ক্রল করে যাওয়া সময়-

সাপেক্ষ, কষ্টকর কাজ। হাঁটু, হাত আর কনুইয়ের বারোটা বেজে গেল রানার। ছোট ছোট কী পোকা যেন ঢুকে গেল নাকে, হিমশিম খেতে হলো হাঁচি সামলাতে। হাত ঠিক জায়গায় পড়ছে কি না সেদিকে লক্ষ রেখে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল ও। ঝিরিঝিরি হাওয়ায় দুলছে ঘাসের মাথা, দুলন্ত সবুজ সাগরে ওর নড়াচড়া চোখে পড়বার কথা নয় কুঠির কারও। একবার মাথা একটু উঁচু করে কুঠি-বাড়ির দিকটা দেখে নিল রানা। বামে ঘাড় ফেরাতেই আবছা ভাবে ওর চোখে পড়ল জন্তুটা। ঘাসের ভিতর দিয়ে গোপনে এগিয়ে চলেছে ওটা। কোনও ভোঁদড়, দিঘিতে নেমে মাছ ধরবে বোধহয়। নাকি ওটা অন্য কোনও জন্তু? আরে, ও যে-চাপালিস গাছটা বেছে নিয়েছে, মনে হচ্ছে সেটার দিকেই যাচ্ছে জন্তুটা। ওটারও কি আড়াল দরকার?

আবার রওনা হয়ে গেল রানা। এবার খুব সাবধানে। মাঝে মাঝে থেমে মুখ থেকে ঘাম-ধুলো মুছল। চাপালিস গাছটার আড়ালে পৌঁছতে পারলে বিশ্রাম নেয়া যাবে। দিঘির বিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে নির্দিষ্ট গাছটা পনেরো ফুট দূরে থাকতেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের তাগিদে ঘাসের আড়ালে থামল রানা, কান পাতল মাটিতে।

কোনও শব্দ নেই আশপাশে। তারপর ওর বাম কানের কাছে ফিসফিস করে হুমকি দিল একটা কণ্ঠস্বর: 'খবরদার! আধইঞ্চি নড়লেই খুন হয়ে যাবে!'

চার

'খবরদার?'

বুকের খাঁচায় বিরাট একটা লাফ দিল রানার হৃৎপিণ্ড।

ওকে হুমকি দিচ্ছে ভোঁদড়টা? তাও আবার ইংরেজিতে? তবে কণ্ঠস্বরটা কোনও মেয়ে ভোঁদড়ের। বলবার ভঙ্গিতে স্পষ্ট বোঝা গেল, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও বামদিকে। ওর মাথা থেকে পনেরো ইঞ্চি দূরে একটা তীরের তীক্ষ্ণ ধাতব ফলা। তীরটা ছুটে এসে খুলি ফুটো করে মগজে গেঁথে যাবার অপেক্ষায় আছে।

ঘাসের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ধনুকটা। ট্রিগার মেকানিযম ছাড়া একটা ক্রস-বো। দেশি মাল মনে হয়। ছিলা টেনে আটকে রাখা হয়েছে তীর। তীরের লেজের কাছে ধরে থাকা বাদামি আঙুল দুটোর ডগা ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে, ওই আঙুল দুটো তীরের লেজ ছেড়ে দিলেই ও শেষ। হাওয়ায় ঘাস দুলে ওঠায় এবার মেয়েটাকে দেখতে পেল রানা। মেয়ে, নাকি রাক্ষুসী? গভীর কালো চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত অঙ্গার, পুরুষ্টু নীচের ঠোঁটে চেপে বসেছে ওপরের পাতলা ঠোঁট। বাদামি মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঘাসের কারণে আর কিছু দেখতে পেল না পর্যুদস্ত রানা।

কে মেয়েটা? কুঠির প্রহরীদের কেউ? হান্নান বা হানিফীর অতি বিশ্বস্ত চরমপন্থী কোনও নারী জঙ্গি?

ধীরে ধীরে ডানহাতটা কোমরের কাছে সরাতে শুরু করল রানা। ওয়ালথারটা বের করতে পারলে... জিজ্ঞেস করল নরম

সুরে, 'কে তুমি?'

তীরধনুক দুলিয়ে ভয় দেখানো হলো ওকে। 'ডানহাত নাড়িয়ো না, নইলে কাঁধে তীর মারব। ...পাহারাদার নাকি তুমি?'

স্বস্তি বোধ করল রানা, শত্রুপক্ষের কেউ বলে তো মনে হচ্ছে না একে। 'আমি পাহারাদার নই। ...তুমি কি পাহারাদারনী?'

'বোকার মতো কথা বোলো না! ...এখানে কী করছ?' মেয়েটার কণ্ঠ থেকে উত্তেজনার পরিমাণ কমেছে; তবে কথার সুর মোটেই নরম হয়নি। সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জবাব দিচ্ছ না যে?'

মেয়েটাকে সামলানোর প্রয়োজনীয়তা অন্তরের গভীর থেকে অনুভব করল রানা। ওই নীলচে-কালো তীরের তীক্ষ্ণ ফলাটা বিশ্রী হীনম্মন্যতার অনুভূতি সৃষ্টি করছে ওর মনে। নিচু স্বরে বলল ও, 'আগে তোমার তীরধনুক সরাও, রবিনা হুড, তারপর বলছি আমি কে।'

'কথা দিচ্ছেন... দিচ্ছ পিস্তলের দিকে হাত বাড়াবে না?'

'দিচ্ছি। এবার এসো, আগে গাছের আড়ালে যাই।' মেয়েটার জন্য অপেক্ষা না করে ক্রল শুরু করল রানা চাপালিস গাছটা লক্ষ্য করে। নিজের কাজ করে যেতে হবে ওকে, মেয়েটাকে প্রশ্রয় দিলে মুশকিল হয়ে যাবে। কে এ? সন্দেহ নেই, উটকো ঝামেলা। গোলাগুলি শুরু হবার আগেই যেভাবে হোক একে ভাগাতে হবে এখান থেকে। নিজের কাজ সারাই যেখানে মুশকিল, সেখানে দেখা দিয়েছে গোদের ওপর বিষফোঁড়া!

চাপালিসের পায়ের কাছে গিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, গুঁড়ির পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল কুঠিটা। কয়েকটা জানালা থেকে সরে গেছে পর্দা। আঙিনার সবুজ ঘাসে দু-পাশে দুটো চেয়ার পাতা নাস্তার টেবিলটাতে খাবার ভরা প্লেট এনে রাখছে উদ্ভিন্ন-যৌবনা দুই স্বল্পবসনা বার্মিজ যুবতী। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাদের দেহের খাঁজ-ভাঁজ। লোকচক্ষুর অন্তরালে বেশ মৌজে আছে দেখছি

মাওলানা আর মুফতি! কে জানে, উচ্ছৃঙ্খল আরব শেখের অন্ধ অনুকরণ করছে হয়তো! মদ টদও খায় নাকি!

রাইফেল-হ্যাভারস্যাক নামিয়ে রেখে গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে বসল রানা।

ঘাস-বনের শেষে চাপালিসের গোড়ার কাছে এসে উঠে দাঁড়াল তীরন্দাজ মেয়েটা, দূরত্ব বজায় রাখছে রানার কাছ থেকে। তীরটা এখনও ধনুকে জোড়া আছে, তবে ধনুকের ছিলা টানটান হয়ে নেই।

পরস্পরের দিকে গরম চোখে তাকাল দু'জন।

জলপাই রঙা কোঁচকানো, ধুলো-কাদা মাখা প্যান্ট-শার্ট পরে আছে মেয়েটা, মনে হচ্ছে সুন্দরী কোনও বেপরোয়া দস্যু-রানী। কুচকুচে কালো ঘন চুলে বাচ্চা মেয়েদের মতো দুটো বেণী করে রেখেছে। পানপাতার মতো মুখটা নিখুঁত, খাড়া নাক, পাতলা ঠোঁট। চোখে তীব্র সন্দেহের দৃষ্টি। ডান কনুই ছিলে রক্ত ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায়। বাঁ কাঁধের পিছন থেকে উঁকি মারছে তীর ভরা তুণ। দেশি ক্রস-বো ছাড়া অস্ত্র বলতে একটা ছোরা আছে শুধু মেয়েটার কাছে, কোমরের চওড়া চামড়ার বেল্টে ঝুলিয়ে রেখেছে। ডান কোমরের কাছে কাপড়ের থলে, ওটাতে বোধহয় খাবার। বুনো জংলা পরিবেশে তরুণীকে বেমানান লাগল না, যেন এখানে এই অরণ্য-প্রকৃতির মাঝে বিচরণ করে সে অভ্যস্ত।

বন্য রূপসী, মনে মনে বলল রানা, মৃদু হাসল মেয়েটার দিকে চেয়ে। নরম কণ্ঠে আশ্বাসের সুরে বলল, 'খুশি হলাম রবিন হুডের নারী সংস্করণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে—আমি মাসুদ রানা।'

'ভাল ইংরেজি বলছ... কোন্ দেশি?'

'বাংলাদেশি। তুমি?'

অবাক দৃষ্টিতে রানাকে দেখল মেয়েটি।

'আরে! আমিও তো!'

হ্যাভারস্যাক খুলে ফ্লাস্ক বের করে বাড়িয়ে দিল রানা।

পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'বসো। চলবে একটু গরম পানি? ব্র্যাণ্ডি আর কফি মেশানো। ...স্যাণ্ডউইচও আছে আমার কাছে। দেব?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। আরেকটু এগিয়ে রানার কাছ থেকে একগজ দূরে হাঁটু ভাঁজ করে আয়েসী ভঙ্গিতে বসল, হাত বাড়িয়ে ফ্লাস্ক নিয়ে কর্ক খুলে এক চুমুকে খালি করে ফেলল প্রায় অর্ধেক তরল। ফ্লাস্কটা ফিরিয়ে দিয়ে মন্তব্যের সুরে বলল, 'এর চেয়ে দোচুয়ানির তেজ অনেক বেশি। স্বাদও ঢের ভাল। তবুও, ধন্যবাদ।' ক্রস-বো থেকে তীর খুলে তুণে রেখে দিয়ে তাকাল সে বিস্মিত রানার চোখে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'চোরা শিকারী?'

'বাপরে, এ দেখি মদ বিশেষজ্ঞ!' মনে মনে বলল রানা, জবাব দিল না তরুণীর প্রশ্নের, পাল্টা জানতে চাইল, 'তুমিও কি তা-ই? চোরা শিকারী?'

মাথা নাড়তেই মোটা মোটা বেণী দুলল তরুণীর। 'না, চোরা শিকারী নই আমি।'

'আমার নাম বলেছি তোমাকে,' বলল রানা। 'তোমার নামটা তুমি বলোনি।'

'আনিকা আশরাফ।'

চমকটা সামলাতে কষ্ট হলো রানার। আনিকা? ...আশরাফ? মেজর জেনারেল আলী আশরাফ সাহেবের মেয়ে? আস্তে আস্তে উপলব্ধিটা এলো ওর—বাবা-মার খুনের বদলা নিতে এই ভিনদেশের দুর্গম জঙ্গলে চলে এসেছে মেয়েটা তীর-ধনুক নিয়ে। ...একা এসেছে? ...তা-ই তো মনে হচ্ছে!

'একা এসেছ এখানে?'

'হুঁ।' সন্দেহের চোখে রানাকে একবার দেখে নিল আনিকা। সুদর্শন যুবকের কোনও বদ মতলব আছে কি না বুঝতে চাইছে।

'তোমাদের এস্টেট থেকে অনেক দূরে চলে এসেছ তুমি,' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'হয়তো ভাবছ, তীরধনুক দিয়ে খুনিগুলোকে খতম করে দিতে পারবে? চিনের একটা প্রবাদ বলি

শোনো, প্রতিশোধ নিতে চাইলে আগে দুটো কবর খুঁড়ে নিয়ো—একটা নিজের জন্যে।'

চোখে প্রশ্ন আর বিস্ময় নিয়ে রানাকে দেখল আনিকা আশরাফ। 'তোমাকে তো চোরা শিকারী বলে মনে হচ্ছে না! আসলে কে তুমি? এখানে কী করছ? আমি কোত্থেকে এসেছি তা জানলে কী করে?'

দ্রুত চিন্তা করে দেখল রানা, এই বিদঘুটে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে মেয়েটার সঙ্গে হাত মেলানো ছাড়া আর কোনও উপায় খোলা নেই ওর। দীর্ঘশ্বাস চেপে নরম সুরে বলল ও, 'আমার নাম তো বলেছি তোমাকে। ঢাকা থেকে পাঠানো হয়েছে আমাকে টেকনাফের ওই খুনগুলোর জন্য দায়ী নরপিশাচদেরকে খতম করতে। আমাকে পাঠিয়েছেন মেজর জেনারেল...'

'রাহাত চাচা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তোমাকে বিপদমুক্ত করাও আমার একটা দায়িত্ব। মেজর জেনারেলের ধারণা, ওই কুঠি-বাড়িতে যারা আছে, ওরা তোমার ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করবে, আর জমিটা পেয়ে গেলে মেতে উঠবে দেশের সর্বনাশ করার কাজে। তাই, যেমন করে হোক ঠেকাতে হবে ওদের।'

'আপনি রাহাত চাচার কাছ থেকে...'

'আবার *আপনি* কেন? *তুমিই* তো বেশ ছিল।'

রাহাত খানের নাম শুনে মেয়েটির চোখে রানার প্রতি সমীহের ভাব ফুটল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ও রানাকে। কিন্তু ও জানে, ও যে ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়েছে তার কোনও সমাধান হবে না এই যুবকের দ্বারা—কারও সাহায্য কোনও কাজে আসবে না এখন। নিজের অবস্থা চিন্তা করে চেহারায় তিক্ততার ছাপ পড়ল তরুণীর, নিচু স্বরে বলল, 'ওই সন্ধ্যায়—আব্বু-আম্মু আর কালাম কাকুর লাশ যখন পড়ে আছে মেঝেতে—ওরা ফোনে হুমকি দিল

আমাকে। তারপর থেকে প্রতিদিন টাইপ করা চিঠি পাচ্ছি আমি, স্বাক্ষরছাড়া। এস্টেট বিক্রি করে সরে পড়ো, নইলে খুন হয়ে যাবে তোমার বাবা-মা'র মতো। আমার কুকুরটাকে গুলি করে মেরে রেখে গেছে একদিন, পোষা খরগোশ দুটোকে মেরেছে ঘাড় মুচড়ে। খুনের পরদিন সকালে আব্বু-আম্মু আর কাকুকে কবর দিয়ে পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম, ওরা আমাকে খুব বেশি হলে জেলখানার নিরাপত্তা দিতে চাইল। অনেক অনুরোধের পর পুলিশ সুপার আরমান আজিজ সাহেবের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, খুনি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান মায়ানমারের এইদিকটায় আড্ডা গেড়েছে। তারপর এখানে-ওখানে খোঁজ নিয়ে বের করেছি লোকটার আস্তানা।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে পৌঁছলে কী করে?'

'গত পরশু রাত সাড়ে দশটায় নাফ সাঁতরে পার হয়ে একটা গ্রামে পৌঁছাই, ওখানেই গ্রামের সর্দারের কাছে শুনি কোন্ পথে এই জমিদার-কুঠিতে আসতে হবে। তারপর সারারাত হেঁটে এখানে এসে পৌঁছেছি গতকাল ভোরের আগে। তখন থেকেই নজর রাখছি।'

আমাদের আগে দেখা না হওয়াটা দুঃখজনক, নইলে এখানে আসতে পারার আগেই ভাগিয়ে দিতে পারতাম তোমাকে, ভাবল রানা, মুখে বলল, 'এখন কী করবে ভাবছ?'

'আব্দুল হান্নান আর আলাওয়াল হানিফীকে খুন করে নাফ পেরিয়ে আবার ফিরে যাব দেশে।' তরুণীর বলবার ভঙ্গি এমনই যে, রানার মনে হলো, হাঁটতে হাঁটতে পথের ধার থেকে দুটো বুনো ফুল ছিঁড়ে নেবার কথা বলছে মেয়েটা।

দিঘির শান্ত পানির উপর দিয়ে ভেসে এলো পুরুষমানুষের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। গুঁড়ির পাশ থেকে উঁকি দিল রানা। তিনজন লোক বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। কথা বলতে বলতে নাস্তার টেবিলে এসে বসল একজন। পাঞ্জাবী পরিহিত দু'জনের কাঁধে

একে-ফোরটিসেভেন, একহাতে তিনটে করে বোম্বে টোস্ট, অপর হাতে কফির কাপ। গোগ্রাসে গিলছে আর হাসছে লোকগুলো, স্বল্পবসনা বার্মিজ যুবতীদের একজনের নিতম্বে চাপড় মারল চেয়ারে বসা সুইমিং কস্টিউম পরা লোকটা। এর কাছে কোনও অস্ত্র নেই। টেবিলের ওপাশের চেয়ারটা এখনও খালি। বিনকিউলার বের করে আরও ভাল ভাবে দেখল রানা। সশস্ত্র দু'জনকে স্রেফ কিলার মনে হলো ওর। দেহরক্ষী। বার্মিজ যুবতীর নিতম্বে চাপড় মেরেছে যে লাল চকচকে হাফপ্যান্ট পরা নিরস্ত্র, লম্বা, ফর্সা লোকটা, সে-ই মুফতি আলাওয়াল হানিফী।

তরুণী পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পেয়ে সরে তার হাতে বিনকিউলার দিল রানা। বলল, 'লম্বা লোকটা মুফতি হানিফী। অন্য দু'জন ওর বিশ্বস্ত অনুচর বোধহয়। হুজুরদের পাহারাদার। আব্দুল হান্নান এখনও আসেনি।'

বিনকিউলারের ভিতর দিয়ে তাকাল তরুণী। রানা ভাবল, মেয়েটার কী অনুভূতি হচ্ছে বাবা-মার হত্যাকারীদের স্বচক্ষে দেখে?

বার্মিজ মেয়ে দুটো ঘুরে তাকিয়েছে কুঠির দিকে। তাদের একজন মগ ভাষায় কী যেন বলল। বোধহয় স্বাগত জানাচ্ছে কাউকে। আরব শেখদের নকলে ছাঁটা চিবুকে সামান্য সাদা দাড়ি, মোটাসোটা, তেলতেলে, স্বাস্থ্যবান, সুইমিং কস্টিউম পরা এক লোক দরজা দিয়ে আঙিনার রোদে বেরিয়ে এলো হেলেদুলে। লোকটার গলা খাটো বলে দেখতে অনেকটা কোলাব্যাঙের মত লাগে। পত্রিকায় ভিন্ন লেবাসে এই লোকের ছবি মাঝে মাঝে দেখেছে রানা। এ-ই সেই হাজি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান। নাস্তার টেবিলের একপাশে আঙিনায় স্টেশনারি জগিং শুরু করল লোকটা দ্রুত তালে, থামল পনেরো মিনিট পর। ঘেমে একেবারে তর-ব-তর।

আনিকার দিকে ফিরে তাকিয়ে রানা দেখল, ঠোঁটের দু'কোণ

বেঁকে নেমে গেছে মেয়েটার। চোখে তীব্র ঘৃণার দৃষ্টি। বাবা-মা'র হত্যাকারীকে নিষ্পলক দেখছে তরুণী। রানা ভাবতে চেষ্টা করল মেয়েটার ব্যাপারে কী করবে। সমস্যা অনেকগুণ বাড়িয়ে তুলতে পারে মেয়েটা। এমনকী ওর পরিকল্পনাতেও বাগড়া দিয়ে বসতে পারে তীরধনুক দিয়ে মানুষ শিকার করতে চেয়ে। এখন আর কোনও ঝুঁকি নেয়া যায় না। পিস্তলটা বের করে মাথার তালুতে হালকা একটা বাড়ি দিয়ে মেয়েটাকে অজ্ঞান করে ফেললে কেমন হয়? তা হলে ওর হাত-মুখ বেঁধে নিজের কাজে মনোযোগ দিতে পারবে। ডানহাতটা নামিয়ে দিল রানা কোমরের পাশে।

নিঃশব্দে, দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গেল আনিকা আশরাফ, ঘাসের উপর থেকে তুলে নিল ধনুক। তীর জুড়ে ছিলায় টান দিয়ে রানার দিকে তাক করে বলল, 'কোনও চালাকি না! কাছে আসতে চেষ্টা কোরো না! তোমার মতো কোনও শহুরে চিত্রনায়ক আমার মাথায় বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে রাখবে বলে এতো কষ্ট করে এখানে আসিনি আমি।' চোখের ইশারায় ক্রস-বো দেখাল। 'একশ' গজ দূর থেকে কখনও টার্গেট মিস করি না আমি। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে উড়ন্ত পাখিও শিকার করতে পারি। আমি চাই না তোমার পায়ে আমাকে তীর মারতে হোক, তবে বাধ্য হবো তুমি বাড়াবাড়ি করলে।'

কী করবে ভাবতে গিয়ে সময় নষ্ট করেছে বলে নিজের উপর রাগ হলো রানার, নিচু কণ্ঠে বলল, 'বোকামি কোরো না, আনিকা। তীরধনুক নামিয়ে রাখো। চারজন হিংস্র লোকের বিরুদ্ধে তীরধনুক দিয়ে কিছুই করতে পারবে না তুমি।'

চোখ গরম করে রানাকে দেখল আনিকা আশরাফ, ডান পা পিছিয়ে তীরন্দাজদের মতো করে দাঁড়িয়ে হিসহিস করে বলল, 'মরোগে যাও। আমাকে বাধা দিতে আসবে না, খবরদার! শুয়োরগুলো আমার আব্বু-আম্মুকে খুন করেছে, তোমার কাউকে নয়। গতকাল থেকে ওদের ওপর চোখ রাখছি আমি, জানি

শয়তানগুলো কখন কী করে। আব্দুল হান্নান আর হানিফীকে চাই আমার।' ধনুকটা রানার উরুর দিক থেকে না সরিয়ে ভিন্ন সুরে এবার বলল, 'হয় আমাকে আমার কাজ করতে দেবে তুমি, না হলে বিপদে পড়বে। তুমি যার কাছ থেকেই আসো না কেন, ভেবো না তোমার পায়ে তীর মারতে একটুও বাধবে আমার। শপথ করেছি প্রতিশোধ নেব, কাজেই কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে।' সুন্দর মাথাটা ঝাঁকিয়ে বরদাত্রী দেবীর মতো করে রানার দিকে তাকাল সে। 'বলে ফেলো, কী চাও!'

মেজাজটা তেতে উঠল রানার। অবাধ্য, সুন্দরী তরুণীর আপাদমস্তক দেখল ও। মিষ্টি কথায় কাজ হবে বলে মনে হলো না ওর। একে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। রাগে-দুঃখে হিস্টিরিয়ার পর্যায়ে চলে গেছে মেয়েটা, নিজের কাজে বাধা সৃষ্টি হবে বুঝলে ওকে আহত করতে বাধবে না। আত্মরক্ষার উপায় নেই ওর। মেয়েটার অস্ত্র নিঃশব্দ, ইচ্ছে হলেই মেরে দেবে। ওকে ঠেকাতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব নয় রানার পক্ষে। না, এর সঙ্গে সহযোগিতা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। পাগলা কুকুর হত্যায় অংশ নিক মেয়েটা, যা করতে পারে করুক, বাকিটা ও করবে ওর সাধ্যমত।

নিচু স্বরে বলল রানা, 'শোনো, আনিকা, আমরা যদি এক দলে থাকি, তা হলে সুবিধা পাব দু'জনেই। প্রাণ নিয়ে দেশে ফেরার সম্ভাবনাও তাতে বাড়বে অনেক। এখানে আমি যা করতে এসেছি, সেটা আগেও করেছি আমি বহুবার। আমার পেশাই এ-ধরনের কাজ করা। তোমার পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ একজন এদের শায়েস্তা করতে পাঠিয়েছেন আমাকে, তুমি জানো। বিশ্বাস করতে পারো আমাকে। প্রয়োজনীয় অস্ত্রও নিয়ে এসেছি আমি। তোমার তীরধনুকের চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি দূর থেকে কাজ সারতে পারবে আমার এই রাইফেল। এখান থেকেই আঙিনার ওই লোকগুলোর যে-কোনও একজনকে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু তা

হলে অন্যরা পালিয়ে যেতে পারে। মনে হচ্ছে অপেক্ষা করলে বাড়তি সুবিধা পাব। সাঁতার কাটতে দিঘির তীরে আসবে বোধহয় ওই কোলাব্যাঙ আর তার চ্যালা। তখনই কাজ সারব আমি।' খুকখুক করে কাশল্ রানা। 'তুমি আমাকে সে-সময় অনেক সাহায্য করতে পারবে তীর ছুঁড়ে।'

'না।' দৃঢ়তার সঙ্গে মাথা নাড়ল আনিকা আশরাফ। 'তোমার কথায় সূক্ষ্ম চালাকির গন্ধ পাচ্ছি আমি। তুমিই বরং গুলি ছুঁড়ে আমাকে সাহায্য কোরো পারলে। ...তবে, ঠিকই বলেছ, সাঁতার কাটতে নামবে পিশাচ দুটো। গতকালকে সকাল এগারোটার দিকে দিঘিতে নেমে মেয়েগুলোর সঙ্গে...' মুখটা লাল হয়ে গেল তরুণীর, তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল, 'আজকেও গতকালকের মতোই গরম পড়েছে। পানিতে নামবে মনে হয় আজও। দিঘির পাড় দিয়ে ঘুরে ডাইভিং বোর্ডের কাছে চলে যাব আমি, ঝোপঝাড়ের আড়ালে অপেক্ষা করব। কাল রাতে চমৎকার একটা জায়গা বেছে রেখেছি। কোত্থেকে কী হলো বুঝে গার্ড দু'জন তাদের রাইফেল তুলতে তুলতে সরে যেতে পারব আমি অনেক দূরে। আমি তীর মারার পর গুলি চালিয়ো তুমি। সবকিছু পরিকল্পনা করা হয়ে গেছে আমার। ...ঠিক আছে তা হলে, রওনা হয়ে যাব আমি এখন। এতক্ষণে ওখানে পৌঁছেও যেতাম তোমার সঙ্গে বকবক করতে না হলে। যা বললাম, সেভাবে যদি না চলো, তা হলে তোমার পায়ে তীর মারা ছাড়া আমার আর কোনও পথ খোলা থাকবে না।' তীরধনুকটা সামান্য তুলল তরুণী।

মেয়েটার মাথায় সর্বনাশা জেদ চেপেছে, বুঝল রানা। রাগ সামলে বলল, 'ঠিক আছে, যাও। কোলাব্যাঙটা বাদে অন্য যেগুলো আছে, সেগুলোর ব্যবস্থা আমিই করব। সরে আসতে পারলে এখানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো—তখন বেত মেরে তোমার পাছার ছাল তোলা যাবে। আর যদি না আসতে পারো, আমিই খুঁজে নেব তোমার লাশটা।'

'মাথাটা খাটাচ্ছ দেখে ভাল লাগল,' শুকনো স্বরে বলল তরুণী। ধনুকটা নামিয়ে নিল। 'মাংসে বিঁধলে সহজে বের করা যায় না তীর। ...আমার ভাল-মন্দ নিয়ে চিন্তা করে নিজের মগজের বারোটা বাজিয়ে ফেলো না, সাবধানে থেকো। আর... তোমার বিনকিউলারে সূর্যের আলোর যেন প্রতিফলন না হয়। সাবধান।' শেষকথা বলে দেয়া রাজরানীর ভঙ্গিতে করুণা মেশানো দৃষ্টিতে রানাকে একবার দেখে নিয়ে শুয়ে পড়ল আনিকা আশরাফ, ক্রল করে এগিয়ে চলল ঘাসের ভিতর দিয়ে। দিঘির ডানদিকের তীর ঘুরে কাছে পৌঁছবে।

সবুজ আকৃতিটাকে গাছের আড়ালে চলে যেতে দেখল রানা, তারপর বিনকিউলার তুলে আবার তাকাল কুঠি-বাড়ির দিকে। বিড়বিড় করে বলল, 'মরুক ছেমড়ি!' সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে কাজে মন দিতে হবে, কিন্তু আনিকা আশরাফের কথা মনের মাঝে ঘুরপাক খেল ওর—আর কোনওভাবে কি মেয়েটাকে সামলানোর উপায় ছিল? আনিকা তীর ছুঁড়বার পর গুলি করবে, কথা দিয়েছে ও। কাজটা ভুলই হয়ে গেল। কী হবে ও আগে গুলি করলে? নাহ্, সেটা বোধহয় ঠিক হবে না। মাথাগরম মেয়েটাকে ওর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না কিছুতেই। তা হলে কী করে বসবে কে জানে! হয়তো কাভার ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে ওদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে। মনে মনে আচ্ছামত আনিকা আশরাফের কান ডলে দিয়ে একটু ভাল লাগল রানার। কুঠি-বাড়ির সামনে নড়াচড়া দেখে আবার মনোযোগ দিল ওদিকে।

নাস্তা খাচ্ছে মাওলানা হান্নান আর মুফতি হানিফী। বার্মিজ যুবতীরা তাদের পাশ থেকে এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। অস্ত্র কাঁধে দুই প্রহরী পাহারায় আছে টেবিলের দু'দিকে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ওদের দু'জনেরই বেল্টে চারটে করে স্পেয়ার-ম্যাগাজিন গোঁজা রয়েছে। এখন একটা গুলি করলেই চারজনের

যে-কোনজনকে খুন করা যায়। কিন্তু বাকিরা পালাবার সুযোগ পাবে। অপেক্ষা করবে, ঠিক করল রানা।

পঁচিশ মিনিট পর চিমসে চেহারার এক হাড্ডিসার বার্মিজ বুড়ো নাস্তার টেবিল থেকে বাসন-পেয়ালা সরিয়ে নিয়ে গেল। সশস্ত্র লোক দুটো নড়ছে না কোলাব্যাঙ আব্দুল হান্নানের কাছ থেকে। বার্মিজ যুবতীরাও রয়েছে ধারেকাছেই। বাগানের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে শুয়ে পড়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাঙ্গিনী যুবতীকে দিয়ে হাত-পা টেপাচ্ছে লিডার, কী যেন বলছে হানিফীকে। ঘনঘন মাথা দোলাচ্ছে হানিফী, কিন্তু তাকিয়ে আছে অপর যুবতীর দিকে। একে-ফোরটিসেভেন কাঁধে প্রহরী দু'জনকে কিছু বলল আব্দুল হান্নান। প্রহরীদের একজন তার অস্ত্রটা বাড়িয়ে দিল। উঠে বসে ওটা নিল জঙ্গিনেতা, চারপাশে তাকিয়ে কী যেন খুঁজল।

হঠাৎ বিশ্রী আওয়াজে গর্জে উঠল লোকটার হাতের রাইফেল। উড়ন্ত অবস্থায় গুলি খেয়ে দিঘির তীরে মুখ থুবড়ে পড়ল একটা ছিন্নভিন্ন মাছরাঙা।

আব্দুল হান্নানের দক্ষতায় 'মারহাবা, মারহাবা' বলে প্রশংসা করল দেহরক্ষীরা। মুফতি হানিফী মাথা দুলিয়ে তার বক্তব্য জানাল। কথা শেষ করল জোরে 'মাশ্‌আল্লাহ!' বলে।

আব্দুল হান্নানের পুরু, লালচে, কামুক ঠোঁট হাসিতে প্রসারিত হতে দেখল রানা। অস্ত্রটা প্রহরীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মেয়ে দুটোকে নির্দেশ দিল সে। দৌড়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল দুই যুবতী, দু'মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো দুটো খালি সেভেন আপের বোতল নিয়ে।

আব্দুল হান্নানের পিছু নিয়ে দিঘির দিকে হাঁটতে শুরু করল সবাই।

রাইফেল কাঁধে তুলে চাপালিসের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে স্কোপের আইপিসে চোখ রাখল রানা, প্রস্তুত। বামহাত রাখবার মতো একটা গিঁঠ রয়েছে গাছের গায়ে, ফলে লক্ষ্যস্থির করতে সুবিধে

হবে ওর।

ডাইভিং বোর্ডের কাছাকাছি এসে থামল জঙ্গিনেতা ও তার অনুগত সঙ্গীরা। আব্দুল হান্নানের পুরু ঠোঁট ফাঁক হলো কিছু একটা নির্দেশ দিতে গিয়ে। দুই যুবতীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে একমুহূর্ত তাকিয়ে প্রহরী দু'জন চলে গেল ডাইভিং বোর্ড থেকে তিরিশ গজ দূরে। পাশাপাশি দাঁড়াল তারা দিঘির দিকে মুখ করে। কাঁধে ঝোলানো অস্ত্র নামিয়ে তৈরি হলো দু'জন। মনে হয় ওদের মধ্যে লক্ষ্যভেদের কোনও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

আব্দুল হান্নানের নির্দেশে বোতল ধরা হাত ঘোরাতে শুরু করল দুই অর্ধ-নগ্ন বার্মিজ যুবতী।

স্কোপের ভিতর দিয়ে সশস্ত্র লোকগুলোর উত্তেজনায় অধীর চেহারা দেখতে পেল রানা।

হঠাৎ ঘেউ করে উঠল আব্দুল হান্নান। দক্ষতার সঙ্গে আকাশে বোতল ছুঁড়ে দিল মেয়ে দুটো।

এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনল কোলাব্যাঙ। তার 'তিন' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একে-ফোরটিসেভেন তুলে বোতল লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল দেহরক্ষীরা। কর্কশ বিস্ফোরণের আওয়াজে খানখান হয়ে গেল চারপাশের প্রশান্ত পরিবেশ। গাছগুলো থেকে চমকে উড়াল দিল পাখিরা, দিঘির তীরে জন্মানো একটা গাছ থেকে গুলির আঘাতে ভেঙে পড়ল সবুজ পাতাসহ সরু একটা ডাল। রানা ভাবল, ভালই হলো, বোঝা যাচ্ছে, ট্রেইনিং ক্যাম্প থেকে ওরা এরকম গুলির শব্দ পেয়ে অভ্যস্ত—ওর গুলির শব্দে ছুটে আসবে না কেউ।

বামদিকের বোতলটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। একটা গুলি লেগে মাঝখান থেকে ভেঙে গেছে ডানদিকেরটা। কাঁচের টুকরোগুলো দিঘির পানিতে পড়ে ডুবে গেল।

বামপাশের দেহরক্ষী জিতেছে প্রতিযোগিতায়।

গ্যানফায়ারের ধূসর ধোঁয়া উড়িয়ে নিয়ে গেল মৃদু হাওয়া। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি।

দুই প্রহরী এগিয়ে এলো দলনেতার দিকে, বামদিকের লোকটা হাসছে, তার সঙ্গীর চেহারা মলিন। বিজয়ীকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করল আব্দুল হান্নান, লোকটা দীর্ঘাঙ্গিনী যুবতীকে দেখাল আঙুল তাক করে। চট্ করে আব্দুল হান্নানের দিকে ফিরে তাকাল যুবতী, আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। হো-হো করে হেসে উঠল আব্দুল হান্নান। হাসছে আলাওয়াল হানিফীও। যুবতীর কবজি চেপে ধরে নিজের কাছে টানল লক্ষ্যভেদ-প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দেহরক্ষী।

সিঁড়ি বেয়ে ডাইভিং বোর্ডে উঠে দাঁড়াল আব্দুল হান্নান, শেষপ্রান্তে গিয়ে দিঘির টলটলে পানির দিকে তাকাল।

ট্রিগারে আঙুল রাখল রানা। এখন থেকে যে-কোনও মুহূর্তে তীর ছুঁড়বে আনিকা। সঙ্গে সঙ্গে গুলি শুরু করতে হবে ওকে। দু'সেকেণ্ড পর রানার মনে হলো, করছে কী মেয়েটা?

মনস্থির করে ফেলেছে আব্দুল হান্নান, হাঁটু সামান্য নাড়াল সে, মাথার উপর তুলল দু'হাত। বুকের কাঁচা-পাকা, লম্বা, কোঁকড়া লোমগুলো দেখা গেল পরিষ্কার, জোরালো বাতাসে নড়ছে। ডাইভ দেবে লোকটা এক্ষুনি। মনে হলো নাচের ভঙ্গি করছে মস্ত এক পেটমোটা কোলাব্যাঙ। দোল দিয়ে বোর্ডের উপর থেকে উঠে গেল লোকটার পা, শরীরটা কিছুদূর উঠে বাঁকা হয়ে মাথা নিচু অবস্থায় রওনা হবে পানির দিকে, ঠিক তখনই তার বুকের কাছে রূপালী একটা ঝিলিক দেখতে পেল রানা। নিখুঁত ডাইভ দিল আব্দুল হান্নান।

ডাইভের ফলে ছিটকে ওঠা পানির দিকে অনিশ্চিত চোখে তাকাল হানিফী। হাঁ হয়ে গেছে মুখটা। অপেক্ষা করছে। বুঝতে পারছে না, অস্বাভাবিক কিছু সত্যিই তার চোখে পড়েছে কি না। তবে সশস্ত্র প্রহরী দু'জন বিপদ ঠিকই আঁচ করেছে। অস্ত্র হাতে

তৈরি হয়ে গেল তারা। হানিফীর উপর থেকে তাদের দৃষ্টি চলে গেল দিঘির ডানদিকের পারে জন্মানো মোটা একটা গাছের দিকে।

পানির আলোড়ন থেমে গেল; বুদ্বুদ উঠল কিছু। মনে হচ্ছে, গভীর ডাইভ দিয়েছে আব্দুল হান্নান।

মুখের ভিতরটা শুকনো ঠেকল রানার। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। স্নাইপার স্কোপের মাঝ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ডাইভের জায়গাটায় পানির তলা থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে টকটকে লাল কী যেন। তারপর আব্দুল হান্নানের উপুড় হয়ে থাকা দেহটা ভেসে উঠল পানির উপর, ঢেউয়ের দোলায় দুলছে মৃদু মৃদু। পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে তীরের অর্ধেকটা, রূপালী ঝিলিক দিচ্ছে ফলা সূর্যের আলোয়।

তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল দুই বার্মিজ যুবতী, ঘুরেই দৌড় দিল কুঠি লক্ষ্য করে।

চেঁচিয়ে কী যেন নির্দেশ দিল মুফতি হানিফী। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীদের একে-ফোরটিসেভেনের নলে ঝিকিয়ে উঠল কমলা আগুন। টানা গুলিবর্ষণের আওয়াজটা কর্কশ শোনাল। দিঘির ডান তীরের ঝোপ-ঝাড় ও গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ছে।

চিমসে বুড়ো বেরিয়ে আসছিল, তাকে ঠেলে নিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল বার্মিজ যুবতীরা। দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা।

রানার হাতে ঝাঁকি খেল .২৫০-৩.০০০ স্যাভেজ ৯৯এফ। ডানদিকের সশস্ত্র দেহরক্ষী স্লো-মোশন ছায়াছবির ঢঙে ধীরে ধীরে পড়ে গেল উপুড় হয়ে। দ্বিতীয় লোকটা দৌড় দিল বাঁ দিকে, কোমরের কাছ থেকে গুলি ছুঁড়ছে দিঘির ডান পারের গাছগুলো লক্ষ্য করে। তারপর কোন্দিক থেকে গুলি আসছে বুঝতে পেরে আড়াল পাবার জন্য ছুটল সে কয়েকটা ঘন ঝোপের দিকে। তাকে মিস করল রানা, আবার গুলি করল। হাঁটুর কাছে পা ভাঁজ হয়ে গেল দেহরক্ষীর, তবুও দৌড়ের গতি তাকে এগিয়ে দিল

খানিকটা। ধুপ করে মাটিতে পড়ে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে দিঘির পানিতে গিয়ে থামল সে—তখনও ট্রিগারে পেঁচিয়ে রয়েছে আঙুল। পানি ঢুকে মেকানিযম নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কয়েক সেকেণ্ড নীল আকাশে গুলি ছুঁড়ল তার কালাশনিকভ।

রানা দ্বিতীয় গুলিটা মিস করায় বিরাট একটা সুযোগ পেয়ে গেছে মুফতি হানিফী, প্রথম দেহরক্ষীর অস্ত্রটা তুলে নিল সে, কোমর থেকে টেনে বের করে নিল দুটো গুলি ভরা ম্যাগাজিন। পরমুহূর্তে শুয়ে পড়ল মাটিতে। মৃতদেহটাকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করে গুলি ছুঁড়ল রানার অবস্থান আন্দাজ করে নিয়ে। রানাকে দেখেছে অথবা স্যাভেজের মাযলফ্ল্যাশ চোখে পড়েছেঃ লক্ষ্যভেদে খারাপ করছে না লোকটা। তবে গুলির রেঞ্জ কম হওয়ার কারণে দিঘির শেষ প্রান্তে পানিতেই পড়ছে ওগুলো, তারপর লাফিয়ে উঠে রানার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোনওটা আবার বেশি উঁচুতে উঠে উপর থেকে ছোট ছোট ডালপালা ভেঙে ফেলছে ওর গায়ে, চাপালিসের কাণ্ডে লেগে কাঠের কুচি গাঁথছে গালে।

এরই ফাঁকে আরও দু'বার গুলি করল রানা। তাড়াহুড়োয় মুফতি হানিফীর কাছ থেকে বেশ কয়েক ফুট সামনে মাটিতে নাক গুঁজল বুলেট। আবার লক্ষ্যস্থির করল রানা, সোজা হানিফীর বুক বরাবর। একটা ভাঙা ডাল পড়ল রাইফেলের নলের উপর। ঝটকা দিয়ে ওটা সরিয়ে দিল ও। ততক্ষণে লনের টেবিলটার দিকে ছুটতে শুরু করেছে মুফতি হানিফী। দু'বার তার গোড়ালির কাছে মাটি খুঁড়ল রানার বুলেট। শেষ লাফে পৌঁছে গেল লোকটা রট আয়রনের টেবিলের কাছে, ওটা উল্টে ফেলে দিয়ে আড়াল নিল ওপাশে। নিরেট লোহার পিছনে অবস্থান নিয়ে নিরাপত্তার অনুভূতি তার লক্ষ্যভেদের দক্ষতা বাড়িয়ে দিল, একে-ফোরটিসেভেনটা সিঙ্গেল শট-এ নিয়ে অনেকটা উঁচু করে ধরে কখনও টেবিলের ডান পাশ থেকে, কখনও বাম পাশ থেকে চাপালিস গাছ লক্ষ্য

করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল সে।

ম্যাগাযিন পাল্টে নিল রানা। ওর গুলি লোহার টেবিলে লেগে টং-টং আওয়াজ তুলল, তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে দু'একটা বুলেট পিছলে বেরিয়ে গেল মুফতি হানিফীর মাথার উপর দিয়ে। স্নাইপার স্কোপ দিয়ে বারবার এদিক-ওদিক লক্ষ্য স্থির করা কঠিন। ধূর্ততার সঙ্গে জায়গা পাল্টাচ্ছে মুফতি হানিফী, তার গুলি এসে বিঁধছে চাপালিসের গুঁড়িতে। ডানদিকে হামাগুড়ি দিয়ে সরতে শুরু করল রানা, ঠিক করেছে দিঘির পাড় ঘুরে কোনাকুনি গুলি করবে। কয়েক পা এগিয়েই মুফতি হানিফীকে দেখতে পেল ও, টেবিলের আড়াল ছেড়ে ক্রল করে ডানদিকে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল নেবে বলে সরছে সে-ও। এগিয়ে এসে রানার মুখোমুখি হতে চায়। উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেল তুলল রানা। মুফতি হানিফীও দেখেছে রানাকে, হাঁটুমুড়ে বসে পরপর কয়েকটা গুলি করল সে তাড়াহুড়ো করে। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে গুলির শব্দ শুনল রানা, ওর স্নাইপার স্কোপের ক্রস-হেয়ার মুফতি হানিফীর বুকের বাঁ পাশে স্থির হতেই চাপ দিল ট্রিগারে। সরে গেছে হানিফী, তার ডানহাতের কনুইয়ে ঢুকল বুলেট। ঝাঁকি খেল লোকটার হাত, ছিটকে পড়ে গেল একে-ফোরটিসেভেন। বামহাতে ডান কনুই চেপে ধরে হাঁ করে রানার দিকে তাকাল হানিফী, চেহারায় প্রকাশ পেল তীব্র আতঙ্ক। কী যেন বলতে চাইল সে, হয়তো প্রাণভিক্ষা চায়—ঠিক তখনই তার হাঁ করা মুখের ভিতরে ঢুকে ঘ্যাচ করে ঘাড় ফুটো করে বের হলো আনিকার ছোঁড়া দ্বিতীয় তীর। ঘুরে গেল লোকটা, সোনালী রোদে তার ঘাড়ের বাইরে ঝিকিয়ে উঠল তীরের ফলাটা। মুখ থুবড়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল জঙ্গি নেতা।

খুনে পিশাচটা আবার উঠে দাঁড়াবে ভেবে রাইফেল সরাল না রানা। তারপর কয়েক সেকেণ্ড পরেও নড়াচড়া না দেখে নামিয়ে নিল অস্ত্র, হাতের উল্টোপিঠে মুছল কপালের জমে ওঠা ঘাম।

এখনও পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে গোলাগুলির শব্দ, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আওয়াজটা। কুঠির দরজাটা বন্ধ। দুই যুবতী ও বার্মিজ বুড়োর দেখা নেই।

ডানদিকে পা বাড়িয়ে আধমিনিট পর আনিকাকে আসতে দেখল রানা। ওকে দেখে ছুটে এলো আনিকা, রক্তশূন্য মুখটা কাগজের মতো সাদা ওর। কাঁদছে ঝরঝর করে। হাত থেকে ধনুকটা ছুঁড়ে ফেলে ফুঁপিয়ে উঠল, বিড়বিড় করে বলল, 'জানতাম না মানুষ খুন করতে এত খারাপ লাগবে!'

তরুণীর কাঁধে হাত রাখল রানা, নরম সুরে বলল, 'তুমি তো মানুষ মারোনি, আনিকা। মেরেছ নরপিশাচ। আমরা ওদের না মারলে ভয়ঙ্কর ক্ষতি করত ওরা দেশের সবার। নিজেকে সামলে নাও, এখনই রওনা হতে হবে আমাদের। এত গোলাগুলির শব্দ শুনে জঙ্গিদের ক্যাম্প থেকে লোক চলে আসতে পারে।'

'কিন্তু ওদের ডিঙিয়েই তো যেতে হবে আমাদের, তা-ই না?' আয়ত ভেজা চোখ রাখল আনিকা রানার চোখে।

'না, আপাতত আরও উত্তরে সরে যাব আমরা,' বলল রানা। 'ওদিক দিয়ে নাফ পেরোব। ওখানে একটু কাজ আছে, ওটা শেষ করেই ঢাকায় ফিরে যাব আমরা।'

ধনুকটা তুলে নিয়ে মেয়েটির হাত ধরে বাঁ দিকে পা বাড়াল রানা।

পাঁচ

নাফ নদীটা ডাইনে বাঁক নিয়েছে ওখানে, খুব বেশি হলে একশ' গজ চওড়া হবে। নির্জন একটা জায়গা, দু'পাশে মাঝারি উচ্চতার পাহাড়। জনবসতি নেই। নদীর ধারে বুনো কলাগাছের পাশে বসে রাঙার মা'র তৈরি স্যাণ্ডউইচ ও কফি ভাগাভাগি করে লাঞ্চ সেরে নিল রানা ও আনিকা। কলাগাছ কেটে ভেলা বানিয়ে নদীটা পার হতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল ওদের। পাহাড়-জঙ্গল পাড়ি দিয়ে সেই শিকার-কুঠি থেকে এরইমধ্যে সাত মাইল উত্তরে সরে এসেছে ওরা। জঙ্গিদের কাছে ওদের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যেতে পারে ভেবে পথে এড়িয়ে গেছে দুটো রোহিঙ্গা গ্রাম।

বিকেল সাড়ে তিনটায় বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখল ওরা, পশ্চিম দিকে হেঁটে চলল ক্লান্ত শরীর টেনে। ঢাকা থেকে রওনা হবার আগে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে রানা, তা থেকে জানে, এদিকে কাছেই চাকমাদের গ্রাম আছে কয়েকটা। গত কদিন ধরে এই গ্রামগুলোতেই হামলা করেছে পাগলা হাতি। প্রথম দুটো গ্রামে লোক জড় হয়ে গেল ওদের দেখে। বিশেষ করে রাইফেলধারী রানা তাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো। বুঝে ফেলেছে কেন ওদের আগমন। বাংলা জানে না গ্রামবাসী, আভাসে-ইঙ্গিতে উত্তর-পশ্চিমে দেখাল তারা। একটু বিশ্রাম নিয়ে তাদের নির্দেশিত পথে রওনা হয়ে গেল রানা ও আনিকা।

বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে ছোট ছোট অনেকগুলো পাহাড় ডিঙিয়ে উঁচু একটা পাহাড়ের মাথায় বড়সড় একটা গ্রামে প্রবেশ

করল ওরা। ঘন বসতি এখানে। আশপাশে, কিছুটা নীচে ছড়ানো-ছিটানো বেশ কয়েকটা গ্রাম দেখা গেল। টিলার মাথায় কয়েকটা করে বাড়ি নিয়ে একেকটা গ্রাম। টিলার গায়ে জুম চাষ, আর সমতলে ধানের খেত করেছে গ্রামবাসী। নদীর ধারে কিছু ধ্বংস যজ্ঞের নমুনা দেখতে পেল ওরা পরিষ্কার। বুঝতে পারল, নদীর ধার ঘেঁষে এগোলে পাওয়া যাবে সর্বশেষ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম। কচিকণ্ঠের হইচই শুনে বামে তাকাল ওরা। বাচ্চাদের চোখেই আগে পড়েছে—চিল চিৎকার দিয়ে দৌড়ে তো নয়, উড়ে আসছে ওরা বিদেশিদেরকে কাছ থেকে দেখতে। নিমেষে ঘিরে ধরল ওরা রানা ও আনিকাকে। বাচ্চাদের উত্তেজিত চিৎকার শুনে পাঁচমিনিটও লাগল না গ্রামবাসীদের সবার জড় হয়ে যেতে। চাকমা ভাষায় কথা বলছে সবাই হড়বড় করে।

আনিকার দিকে তাকাল রানা, কাঁধ ঝাঁকাল। 'কী বলছে ওরা?'

'জানি না,' ক্লান্ত স্বরে বলল আনিকা। 'এদের ভাষা কিচ্ছু বুঝছি না।'

দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে কয়েকবার 'হাতি' শব্দটা উচ্চারণ করল রানা, কাজ না হওয়ায় হাতির বৃংহিত অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা করল। বেখাপ্পা 'পোঁ' আওয়াজ শুনে সবাইকে হেসে উঠতে দেখে একটা হাত নাকের কাছে তুলে দোলাল ও হাতির শুঁড়ের নকল করে। রাইফেল তুলে দেখাল, ওটাকে মারতে চায় ও। কিন্তু হাসি আর থামে না।

বয়স্ক এক শুঁটকি লোক একহাত তুলে চড়া গলায় বলল কিছু, সঙ্গে সঙ্গে চুপ হয়ে গেল সবাই। মুখের চামড়া কুঁচকে কয়েকশ' ভাঁজ হয়ে গেছে বুড়োর। বোধহয় গ্রামের হেড-ম্যান, পাশের এক যুবকের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার পর সন্তুষ্টির সঙ্গে মাথা দোলাল নিজেই, হাতের ইশারা করল রানার রাইফেলের দিকে, তারপর আঙুল তুলে দেখাল উত্তর-পশ্চিমের অনেকগুলো বাঁশঝাড়ের

দিকে—যেদিকটায় ধ্বংসের আলামত দেখেছে ওরা একটু আগেই। এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে, মনে হচ্ছে ফসলী জমির ওধারে ওটা বাঁশবন নয়, আখের খেত। রানার অনুকরণে হাতির ডাক ছাড়ল বুড়ো। গলার আওয়াজটা তেমন জোরালো নয়, কিন্তু অনুকরণটা এত চমৎকার যে কাছেপিঠে থাকলে খোদ হস্তিনী ছুটে আসত ওই মদ্দা পাটকাঠির কাছে।

'বুড়ো মনে হয় বলছে হাতিটা ওদিকে কোথাও আছে,' বলল আনিকা।

বাঁশঝাড়ের দিকে রানাকে তাকাতে দেখে গুঞ্জন উঠল গ্রামবাসীর মধ্যে। খপ্ করে রানার হাত ধরল বুড়ো, তারপর বাঁশঝাড়ের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল ওকে। এবার এক বুড়িকে ভিড় ঠেলে কাছে চলে আসতে দেখা গেল। আনিকার কব্জি ধরে টান দিল সে; শুঁটকি বুড়োর খপ্পরে পড়া রানার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে ওকেও।

'চলো, যাওয়া যাক, আনিকা,' বুড়োর পাশে পা বাড়াল রানা।

রানা ও আনিকা রওনা হতেই গ্রামের লোক পিছু নিল ওদের। কাউকে নিজের পাশে আসতে দিল না বুড়ো। বুড়ি হাত ছাড়ল না আনিকার। ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্দেশের সুরে কিছু বলল বুড়ো, হাতের ঝাপটায় বুঝিয়ে দিল আর কেউ তাদের সঙ্গে আসুক সেটা সে মোটেই চায় না। পালন করা হলো বুড়োর নির্দেশ, অনিচ্ছুক চেহারায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

বুড়ো-বুড়ির পাশে পঁচিশ মিনিট একটানা জুমখেতের মাঝ দিয়ে পথ করে এগোল রানা ও আনিকা। বাঁশঝাড়ের একশ' গজের মধ্যে পৌঁছে হৈ-চৈ-হট্টগোল কানে এলো ওদের। এইমাত্র ঠনঠন করে টিন পেটাতে শুরু করেছে কারা যেন, সেইসঙ্গে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে অজানা ভাষায়। রানার পাশ থেকে দৌড়ে সামনে বাড়ল বুড়ো। বুড়ি কী যেন বলল তাকে চেঁচিয়ে।

দৌড়ে বুড়োর পাশে চলে এলো রানা। আনিকাও যোগ দিল

ওর সঙ্গে। বুড়ি পিছন থেকে চেঁচাল তারস্বরে, তবে আর আগে বাড়ছে না সে।

বাঁশঝাড়টার পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে এসে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে পেল রানা। একহাতে বুকের কাছে লুঙ্গিটা তুলে অপর হাতে বদনা নিয়ে বাঁশের বন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে মোটাসোটা এক লোক, ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তার পিছনে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল কয়েকটা বাঁশ। তার পরপরই শোনা গেল ক্রুদ্ধ হাতির গর্জন, দেখা দিল ধূসর একটা প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতি। সোজা লোকটাকে লক্ষ্য করে ছুটছে ওটা। শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে আছাড় মেরে পায়ের তলায় পিষতে চায়।

পঙ্খিরাজ ঘোড়ার মতো ছুটছে বদনাওয়ালা, তারপরেও উন্মত্ত হাতির সঙ্গে দ্রুত কমছে তার দূরত্ব। লোকটা বদনা ফেলতে ভুলে গেছে, নাকি সাধের জিনিসটা হারাতে রাজি নয়, বুঝতে পারল না রানা। কাঁধে রাইফেল তুলে ধনুকের ছিলার টঙ্কার শুনতে পেল ও পাশ থেকে। ততক্ষণে ওকে পাশ কাটিয়ে তীরবেগে ফিরতি পথ ধরেছে হেড-ম্যান বুড়ো।

পাগলা হাতিটার বিশাল নিতম্বে গিয়ে গাঁথল তীর। থমকে দাঁড়াল ওটা, মোটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা ও আনিকার দিকে। ঘুরে দাঁড়াল মুহূর্তে। তারপর জুম খেতের কচি ফসল মাড়িয়ে সোজা ছুটে এলো ওদের দিকে। অন্তত দশ ফুট উঁচু হবে ওটা, ওজন কয় টন কে জানে। কপাল সই করে গুলি করল রানা, ঠিক সেই মুহূর্তে ভেজা জমিতে পা পিছলে গেল ওর। ফলে হাতির কান ফুটো করে বেরিয়ে গেল হাই ভেলোসিটি বুলেট। ছোট্ট একটা গর্জন ছেড়ে আকাশে শুঁড় তুলল ওটা, দু-পেয়ে জন্তুগুলো পালাচ্ছে না দেখে রেগে গেল আরও। বিকট গর্জন ছেড়ে তেড়ে আসছে, যেন এক্সপ্রেস ট্রেন। শায়েস্তা করবে বেয়াদব দুটোকে।

দূরত্ব আর ত্রিশ গজ। মাঝখানের ফাঁকটুকু পার হলেই ও-দুটোকে পিঁপড়ের মতো পিষে ফেলতে পারবে বুঝে গজপতির

ছোটার গতি বাড়ল আরও।

'যাহ্, দৌড়াচ্ছে বলে পাঁজর মিস করেছি,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল আনিকা। পরক্ষণেই জরুরি সুরে তাগাদা দিল, 'পালাও, রানা! মেরে ফেলবে!' পিছাতে শুরু করল ও, তবে রানা অনড় দেখে ঘুরে দৌড়াতে শুরু করল না। একের পর এক তীর মারছে, কিন্তু লাগাতে পারছে না কোনও ভাইটাল পয়েন্টে।

আনিকার কথায় কোনও জবাব দিল না রানা, স্কোপের পাওয়ার ছয়-এ নামিয়েও পুরো হাতিটা দেখা যাচ্ছে না। অনেকটা আন্দাজের উপরই গুলি করতে হলো। সই করেছিল ওটার দু'চোখের মাঝখানে, উঁচু করা শুঁড় ভেদ করে ঠিক জায়গামতই ঢুকল বুলেট, কিন্তু আটকে গেল কপালের হাড়ে, ব্রেন পর্যন্ত পৌঁছল না।

এবার সত্যি-সত্যিই ব্যথা পেয়েছে হাতি। থমকে দাঁড়াল একটু। হয়তো ভাবল, এরা তো দেখা যাচ্ছে লোক ভাল না, পালালে কেমন হয়! একটু পাশ ফিরলেই কানের পাশে হাতির দুর্বলতম জায়গায় গুলি করতে পারত রানা, কিন্তু জান্তব ক্রোধেরই জয় হলো শেষপর্যন্ত। আকাশ ফাটানো গর্জন ছেড়ে ওদের দিকে তেড়ে এল শ্বেতহস্তি। আর দশ গজ, তারপরই পিষে ফেলবে বেয়াদব জানোয়ার দুটোকে।

আবার গুলি করল রানা। ওকে গুলি করতে হচ্ছে আন্দাজের উপর, সাধের স্কোপ এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না কিছুই।

দানব হাতির ডান চোখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে দেখল রানা। আবার হাঁক ছাড়ল পাগলা হাতি, কিন্তু সেটা তীব্র যন্ত্রণার।

টলতে টলতে এগিয়ে আসছে হাতি, যেন ধূসর একটা পাহাড়, চাপা দেবে ওকে।

আর পনেরো ফুট দূরেও নেই পাগলা হাতি। শুঁড় বাড়িয়ে

রেখেছে সামনে, আর একটু এগিয়েই ধরবে শিকার।

পিছাল না রানা, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আবারও গুলি করল ও, এবার পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে সোজা হাতিটার মাথায়।

থমকে দাঁড়িয়ে দুলে উঠল পাহাড়, পড়ে যাচ্ছে। বসল, তারপর কাত হয়ে দড়াম করে পড়ল মাটি কাঁপিয়ে। একটা পা নাড়ল কয়েকবার। মোটা শুঁড়টা আছড়ে পড়ল রানার পায়ের উপর।

তাতেই ধরাশায়ী হলো রানা। পড়ে গেল হাতিটার মাথার পাশে। নাকের কাছে দেখতে পেল ওটার কুঁতকুঁতে লালচে বাম চোখ। দেখছে ওকে। তারপর হঠাৎই শিউরে উঠল পাগলা হাতি, প্রাণের আলো দপ করে নিভে গেল চোখ থেকে।

আধমিনিট পর ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা। ওর হাত ধরে টেনে তুলতে চেষ্টা করছে আনিকা। আবার ওর দিকে তুফানবেগে ছুটে আসছে বুড়ো হেডম্যান, রানাকে টেনে তুলে জড়িয়ে ধরল বজ্র আঁটুনিতে। খুশিতে নাচতে শুরু করেছে বুড়ো, একই সঙ্গে অনর্গল চলছে তার মুখ। সম্ভবত প্রশংসাবাক্য আউড়ে চলেছে নিজের ভাষায়।

একদল আদিবাসী পুরুষ ছুটে এলো বাঁশঝাড়ের ওপাশ থেকে। শুধু বদনাওয়ালা সেই লোকটা দৌড়ে গিয়ে ঢুকল আবার বাঁশঝাড়ে।

রানাকে ছেড়ে সামনে বেড়ে নবাগতদেরকে কী সব যেন বলতে শুরু করল বুড়ো উত্তেজিত কণ্ঠে। তার বুড়িও চলে এসেছে। এক হাতে আনিকা অপর হাতে রানার কবজি চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলল সে ওদের।

হেড-ম্যানের বাঁশের কুটিরের সামনে প্রশস্ত উঠানে জড়ো হলো গ্রামের লোক। রানা ও আনিকাকে বেতের দুটো মোড়া দেয়া হলো বসতে। হেড-ম্যান বসল তার রংচঙা উঁচু মোড়ায়। আর সবাই গোল হয়ে বসল উঠানে। দেরি না করে হেড-ম্যানের স্ত্রী

ঢুকে গেল কুটিরের ভেতর, বেরিয়ে এলো জগ ও কাঁচের একটা গ্লাস নিয়ে। কনুইয়ের ভাঁজে বাঁশের মোটা একটা খণ্ড।

গ্লাসে সাদাটে তরল ঢেলে হাসি-হাসি চেহারা করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল বুড়ি।

'কী দিচ্ছে?' আনিকার দিকে তাকাল রানা।

'দোচুয়ানি,' জানাল আনিকা। রানাকে শিউরে উঠতে দেখে বলল, 'গিলে নাও, স্বাদটা খারাপ না। তোমার মত উপকারী একজন মানুষ ওটা না খেলে দুঃখ পাবে ওরা, মনে করবে হেলা করছ ওদের।'

'দোচুয়ানি' শব্দটা শুনে বারকয়েক আনন্দিত চেহারায় মাথা দোলাল হেড-ম্যান। গ্রামবাসীরা কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

নড়েচড়ে বসল রানা। 'আর বুড়ির হাতে ওই বাঁশের মধ্যে কী?'

নির্বিকার চেহারায় আনিকা বলল, 'পোকা। সম্মানিত অতিথিদের জন্যে বিশেষ মুখরোচক খাবার।'

'আমি দোচুয়ানিতে একটা চুমুক দিতে পারি, যদি তুমি একটা পোকা খাও,' মনের মধ্যে শয়তানি খেলে যাওয়ায় বলল রানা।

বিনা দ্বিধায় বাঁশটা বুড়ির হাত থেকে নিল আনিকা, ওটার ভিতর থেকে জ্যান্ত একটা ঘাসফড়িং বের করে মুখে পুরে কচমচিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলল অবলীলায়। চেহারা দেখে মনে হলো না স্বাদটা ওর খারাপ লেগেছে।

আর কোনও উপায় নেই, শ্বাস বন্ধ করে দোচুয়ানিতে চুমুক দিল রানা, মুখটা বিকৃত হয়ে গেল ওর। মনে মনে বলল, এ দেখি র উইস্কির বাপ, কেরু সাহেবের সাক্ষাৎ নানা! খকখক করে কাশতে শুরু করল ও বিষম খেয়ে।

হেসে উঠে ওর পিঠে বেদম একটা চাপড় মারল বুড়ো হেড-ম্যান. চমকে উঠল রানা। কাশি থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ততক্ষণে চারপাশে খবর হয়ে গেছে। চাকমা গ্রামের আশপাশের সবাই জেনে গেছে দুর্দান্ত সাহসী এক শিকারী এসে শয়তান হাতিটাকে মেরে ফেলেছে।

পাটকাঠির মতো সরু আরেকজন আদিবাসী উঠানে এসে হাজির হতেই নড়েচড়ে বসল সবাই। সামনে এসে বিনীত ভঙ্গিতে হেড-ম্যানের সঙ্গে আলাপ করলেন, তারপর ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, 'আমি অদ্রি চাকমা। গ্রামের পাঠশালার মাস্টার। হেড-ম্যান আগাশ চাকমার ভাই। অতিথি শিকারীরা আজ রাতটা গ্রামে কাটালে সম্মানিত বোধ করবে এই গ্রামের সবাই। হাতিটা কাটা হচ্ছে, রাতে ভোজ হবে।'

আপত্তি করল রানা, জানাল দেরি না করে রওনা হয়ে যেতে চায় ওরা। টেকনাফ-কক্সবাজার সড়কে কোন্‌দিক দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে জানতে চাইল ও।

হেড-ম্যানকে কী যেন বললেন মাস্টার সাহেব। বুড়োর জবাব শুনে আবার তাকালেন তিনি রানার দিকে, আরও অনেক নরম সুরে অনুরোধ করলেন থেকে যেতে।

রানা আবারও আপত্তি করায় হেড-ম্যানের সঙ্গে আরেকদফা আলাপ সেরে বললেন, 'আমাদের হেড-ম্যান আগাশ চাকমা বলছে, আপনাদেরকে রাস্তার ধারে পৌঁছে দেয়া যাবে মোষের গাড়িতে করে।'

'ওখান থেকে কক্সবাজারের গাড়ি পাওয়া যাবে তো?' জানতে চাইল রানা।

'যাবে,' মাথা দোলালেন মাস্টার সাহেব। 'ওখানে হেড-ম্যানের ভাইপো পেলে চাকমার গ্যারেজ আছে। আগাশ চাকমার কথা শুনলেই জিপগাড়িতে করে পৌঁছে দেবে সে আপনাদেরকে কক্সবাজারে। হাতির দাঁতদুটোও তুলে দেয়া হবে ওই গাড়িতে।'

মাথা নাড়ল রানা। দাঁত নেবে না ওরা। ও-দুটো হেড-ম্যান ও তাঁর অতিথিপরায়ণা স্ত্রীর জন্য থাকবে এখানেই। কথাটা তর্জমা

করে শোনাতেই হাসি ফুটল বুড়ো-বুড়ির ভাঁজ পড়া গালে। বুঝে নিয়েছে ওরা, কোনও কিছুর আশায় নয়, নিছক ওদের উপকার করতেই পৃথিবীর আরেক প্রান্ত, ঢাকা থেকে এসেছে ছেলেমেয়ে দুটো। কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গেল অনেকের।

'আমি একটা কথা ভাবছি,' রানাকে বলল আনিকা। 'জঙ্গি-নেতা দুটো তো খতম হয়ে গেছে। আমি বরং আমাদের এস্টেটেই ফিরে যাই।'

'না,' মাথা নাড়ল রানা। 'আগে ঢাকায় গিয়ে তোমার রাহাত চাচার সঙ্গে দেখা করা উচিত। তোমার কথা ভেবে কী পরিমাণ উদ্বেগে রয়েছেন তিনি, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তোমার জন্মদিনে তোমার আব্বু জোর করে ধরে নিয়ে যেতেন সারকে। তুমি নাকি তাঁর কোল থেকে নামতেই চাইতে না?'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল আনিকা। এখনও ওকে সত্যিই এতটা ভালবাসেন রাহাত চাচা!

'জঙ্গি দলটাকে আমরা ছাড়ব না,' নরম গলায় বলল রানা। 'ওরা নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত ঢাকায় তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে। তারপর তোমরা চাচা-ভাইঝি মিলে ঠিক করবে কোথায় যাবে, কী করবে।'

চোখের পানি মুছে মাথা ঝাঁকাল আনিকা। যাবে ঢাকায়।

একটু পরে হেডম্যানের কাছ থেকে বিদায় চাইল রানা। বিভিন্ন গ্রামের হেড-ম্যানদের পক্ষ থেকে আবারও অনুরোধ করা হলো ওদেরকে আজকের রাতটা থেকে যেতে। বিশেষ লোভ দেখানো হলো, হাতির মাংসের সুস্বাদু ভোজ হবে আজ, আশপাশের দশ গ্রামের সবাই আসবে, নাচ হবে, গান হবে, বাঁশের চোঙা ভরা পোকা থাকবে, সেইসঙ্গে গেলাস-গেলাস দোচুয়ানি...

এবার ওদের অনুরোধের জবাব দিল আনিকা। বলল, যেমন করে হোক, আজই কক্সবাজার থেকে প্লেন ধরে ঢাকায় ফিরতে

হবে ওদের, উৎসবে থাকতে পারলে সত্যিই খুশি হতো ওরা, চাকমাদের উৎসবে উপস্থিত থাকতে পারা অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার, কিন্তু...

হেড-ম্যানের নির্দেশে মোষের গাড়ির ব্যবস্থা করতে গেলেন অদ্রি চাকমা। পালোয়ান দুই মহিষ নিয়ে এসে পড়ল বারো বছর বয়েসী খুদে এক গাড়িয়াল।

আধঘন্টা পর মোষের গাড়ির দুলুনিতে ঢুলতে ঢুলতে রওনা হয়ে গেল পরিশ্রান্ত রানা ও আনিকা। একসময় রানার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্ত মেয়েটি।

বিদেশি বৈজ্ঞানিক

এক

সকাল সাড়ে দশটা। একটু আগেই থেমেছে অসময়ের টিপ-টিপ বৃষ্টি। একটানা উত্তুরে হাওয়ায় বঙ্গোপসাগরের দিকে ফিরে চলেছে ধূসর মেঘের দল, ভেজা কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে জবুথবু হয়ে আছে শীতের আকাশ।

মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ॥

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর হেডকোয়ার্টার ॥

দেশের বিরুদ্ধে দুনিয়ার কোথাও কোনও ষড়যন্ত্র হলে সেটা নস্যাৎ করবার জন্য গড়া হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। সেই পাকিস্তানী আমলে আর্মি থেকে রিটায়ার করবার পরপরই প্রায় জোর করে এই সংস্থাটি পরিচালনার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তীক্ষ্ণধী মেজর জেনারেল রাহাত খানের উপর—আজও, দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পরও, আছেন তিনি সেই একই পদে। নিজ তত্ত্বাবধানে মনের মতন করে গড়ে-পিটে নিয়েছেন তিনি প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন শাখার দুর্ধর্ষ কয়েকশো যুবককে। চোখ-কান খোলা রেখে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের দক্ষ এজেন্টরা। দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা দেখা দিলেই প্রাণের পরোয়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা সে-ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে। শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও শ্রদ্ধা-সমীহ কেড়েছে অকুতোভয় এইসব বাঙালি ছেলে।

কনফারেন্স হল।

কালো চামড়ার গদিমোড়া চেয়ারে বসে সামনে দাঁড়ানো তরুণের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান, মন দিয়ে শুনছেন বিসিআই-এর প্রথমসারির কয়েকজন এজেন্ট-এর প্রশ্নের জবাবে কী বলে তরুণ। চুরুট নিভে গেছে তাঁর, সেদিকে খেয়াল নেই।

বিশাল ঘরটাতে বিরাজ করছে পরীক্ষা-হলের থমথমে চাপা উত্তেজনা।

পাশাপাশি তিনটে চেয়ারে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইভা-ভোচির মত করে ক্যাপ্টেন তারেক মাহমুদের পরীক্ষা নিচ্ছে সলীল সেন, সোহানা ও রূপা। ইন্টারভিউ-এর প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে ওরা। পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত রয়েছে বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ। দুর্দান্ত এজেন্ট ছিল সে একসময়, দুর্ঘটনায় একটা হাত কাটা পড়ায় এখন বিসিআই-এ প্রশাসনের দায়িত্বে কাজ করছে। চিফের পাশেই একটা চেয়ারে বসে আছে সে চুপচাপ।

আর্মি ও ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স থেকে চৌকশ দশজন তরুণ অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল তিনমাস ব্যাপী বিসিআই ফিল্ড এজেন্টস' ট্রেইনিং-এ অংশ নেবার জন্য। সবাই আসতে চায়, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ তরুণরা বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনে প্রাণ দিতে চায়, বিপজ্জনক সব মিশনে অংশ নিয়ে প্রমাণ করতে চায় নিজ-নিজ সততা, সাহস ও যোগ্যতা। ট্রেইনিং শেষে দশজন তরুণ অফিসারের মধ্য থেকে সন্তোষজনক ফলাফল করতে পেরেছে মাত্র দুজন: ক্যাপ্টেন তারেক মাহমুদ তাদেরই একজন। আনআর্মড কমব্যাট, রাইফেল ও পিস্তল শুটিং, দৈহিক শক্তি ও এনডিউর্যান্স, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা, অনুসরণের দক্ষতা, ক্যামেরা-ওয়্যারলেস-কমপিউটার সহ বিভিন্ন গ্যাজেট ব্যবহারে পারদর্শিতা ইত্যাদি নানান বিষয়ের পরীক্ষায় বেশ ভাল করেছে

সে। খুব অল্প সময়েই কাজ চালাবার মতো শিখে নিয়েছে কয়েকটি ভাষা; সেইসঙ্গে ইওরোপিয়ান, আমেরিকান ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের কালচার, চালচলন ও রীতিনীতি শিক্ষায় প্রমাণ করেছে নিজের যোগ্যতা। আশা করা যায়, বিদেশে অ্যাসাইনমেন্টে গেলে সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে ও পরিবেশের সঙ্গে।

আজকের পরীক্ষায় উতরে গেলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ফিল্ড এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ পাবে ও, আরও উন্নত ট্রেইনিঙের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে পাঠানো হবে ওকে হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য।

উত্তেজিত, সতর্ক চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বিসিআই-এ যোগ দিয়ে দেশসেবার সুযোগ পাওয়ার জন্য কী পরিমাণ উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে এই স্বাস্থ্যবান, টগবগে তরুণ।

'এবার দেখা যাক কুইক অবযারভেশন ট্রেইনিং তোমাকে কী শেখাল,' ক্যাপ্টেন মাহমুদের চোখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল সলীল সেন। 'দরজার কাছে চলে যাও। ওখানে একটা পিপহোল আছে। ওটা দিয়ে ঠিক পাঁচ সেকেণ্ড তাকানোর সুযোগ পাবে তুমি। যা দেখবে, দেখে যা বুঝবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে হবে পরীক্ষকদের কাছে।'

দৃঢ় পায়ে হেঁটে গেল ক্যাপ্টেন দরজার সামনে, চোখ রাখল পিপহোল-এ।

ঘড়ির দিকে তাকাল সলীল, পাঁচ সেকেণ্ড পর টিং শব্দে বাজাল একটা ঘণ্টি, 'সময় শেষ।'

ফিরে এসে টেলিফোনের খুঁটির মত অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে সামনের নীলরঙা দেয়ালের দিকে।

নীরবতা ভাঙল সলীল, 'কী দেখলে বলো।'

'ওটা আউটার লাউঞ্জ,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ।

‘একজন লোক পায়চারি করছে ওখানে। লাউঞ্জের দেয়াল হলদে রঙের...’

‘ওসবের বর্ণনা থাক,’ বাধা দিল রূপা, ‘ওই লোকটার বর্ণনা দাও।’

শুরু করল ক্যাপ্টেন মাহমুদঃ ‘পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি, বা ছ’ফুট হবে লোকটা লম্বায়, ওজন আন্দাজ দু-শো আশি পাউণ্ড। সস্তা বেল্টের ওপর দিয়ে উপচে পড়ছে বিশাল ভুঁড়ি। কাঁধদুটো গোলচে। ঘাড় প্রায় নেই বললেই চলে। যতটুকু আছে, সেটা লাল একটা ময়লা মাফলার দিয়ে ঢাকা। মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাইনি। ...চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। খুঁড়িয়ে হাঁটে। বামপায়ে সমস্যা আছে।’

‘গুড,’ কৃতী-ছাত্রের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে মৃদু হাসল সলীল। ‘এবার জামা-কাপড়ের বর্ণনা শোনা যাক।’

‘মাফলারটা বেশ পুরনো। কোটও তা-ই। ইস্ত্রি করা দরকার ওটা। প্যান্টও পুরনো, বেশি আঁটো, শার্টের একটা বোতাম নেই। পাম্পশু ছাইরঙা। মনে হলো, প্লাস্টিকের তৈরি খুবই সস্তা জিনিস। রাজমিস্ত্রি বা জোগালেরা সাধারণত যেরকম পরে।’ সলীলের দিকে তাকাল তারেক মাহমুদ।

‘এবার ওই লোকের বয়স ও পেশা সম্বন্ধে তোমার ধারণা বলো।’

‘বয়স ঠিক বোঝা গেল না—মনে হয়, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মত হবে; পঁয়তাল্লিশও হতে পারে। সারাদিন শুয়ে-বসে থাকে, পুরনো বইয়ের দোকানদার; কিংবা লটারির ক্যানভাসারও হতে পারে। রাজমিস্ত্রি, তালামিস্ত্রি, বা ছাতা মিস্ত্রিরাও শীতকালে ওরকম কোট গায়ে দেয়। লোকটাকে একজন তালা... না, ছাতা সারাইওয়ালাই মনে হয়েছে আমার।’

‘ওকে ভেতরে আসতে বলো, ক্যাপ্টেন,’ সিগারটা জ্বেলে ধোঁয়া ছাড়লেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, তাঁর ঠোঁটের কোণে

হাসির সূক্ষ্ম একটা রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, স্মার্ট ভঙ্গিতে হাতের ইশারায় ডাক দিয়ে বলল, 'এই যে... এই, মিয়া! এদিকে আহেন। বরো সাবে ডাকে।'

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অফিসে ঢুকল জীর্ণ কোট পরা স্থূলদেহী লোকটি, থতমত খেয়ে থমকে দাঁড়াল দরজার কাছে। বারবার এদিক-ওদিক তাকানো দেখে মনে হলো, বিশাল ঘরটাতে ঢুকতে ভয়ই পাচ্ছে বেচারা।

সোহানা নরম সুরে বলল, 'ক্যাপ্টেন, তুমি কি একবারও ভেবেছ, এই লোকটা বিদেশি কোনও স্পাই হতে পারে? এমন কি হতে পারে না, আমাদেরকে খুন করতেই পাঠানো হয়েছে একে?'

হাসি-হাসি হয়ে গেল ক্যাপ্টেন মাহমুদের চেহারা, তবে হাসল না। 'এই লোক স্পাই?' স্পষ্ট অবিশ্বাস ঝরল তার কণ্ঠে। 'হতে পারে না, আপা। এরকম খোঁড়া আর বিদঘুটে মোটা একটা লোক ইচ্ছে করলেই তো আর স্পাই...'

গম্ভীর হয়ে গেল সোহানা। 'তবুও ওকে সার্চ করে দেখো কোনও অস্ত্র পাওয়া যায় কি না। এখানে চিফ আছেন, তোমার সাবধান থাকা উচিত নয়? ওর পেটে হয়তো কোনও কুবুদ্ধি আছে, কে জানে!'

কথাটা শুনে লোকটার গোবেচারা চেহারায় ম্লান হাসি দেখা দিল।

দক্ষ হাতে নবাগতের কাঁধ থেকে তল্লাসী শুরু করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, চাপড়ে দেখল কোঁচকানো কোট। থলথলে পেটে হাত দিয়েই থমকে গেল হঠাৎ। বড় বড় হয়ে উঠল তার চোখ। কোট সরিয়ে স্প্রিং হোলস্টার থেকে টেনে বের করে নিল সে নিয়মিত তেল দেওয়া একটা .৩৮ ওয়ালথার পিপি পিস্তল।

এবার আরও অনেক যত্ন ও খানিকটা সমীহের সঙ্গে ছাতা মিস্ত্রিকে সার্চ করল সে। বিশেষ মনোযোগ দিল শার্টের কনুই ও

প্যান্টের পায়া দুটোর দিকে। কাজটা সেরে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে তাকাল সলীলের দিকে। 'আর কিছু নেই, সার। পকেটে টুকিটাকি কিছু খুচরো পয়...'

হঠাৎ চমকে থেমে গেল সে। শক্তিশালী একটা ইস্পাত-দৃঢ় বাহু তার গলা পেঁচিয়ে ধরেছে। ছাতা সারাইওয়ালার আরেক হাতে একটা ফোল্ডিং নাইফ। ওটা এখন আর ফোল্ড করা নেই। সাড়ে চার ইঞ্চি ক্ষুরধার বাঁকানো ফলা স্পর্শ করেছে শিকারের কণ্ঠনালী। কানের কাছে লোকটার ভরাট, পুরুষালী কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ক্যাপ্টেন মাহমুদ: 'খবরদার! একচুল নড়লেই দু'ফাঁক করে দেব গলাটা!'

মেজর জেনারেল রাহাত খানের দিকে তাকাল সলীল, সোহানা ও রূপা। সোহেল আহমেদও চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

দরজার কাছে মূর্তির মত স্থির দাঁড়ানো ক্যাপ্টেন ও তার পিছনের ছাতা মিস্ত্রির দিক থেকে চোখ ফেরালেন রাহাত খান, গমগম করে উঠল তাঁর কণ্ঠ: 'ওকে ছেড়ে দাও, রানা।'

বজ্র আঁটুনি শিথিল হয়েছে, টের পেল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, কয়েক পা সরে দাঁড়াল। মুখ রক্তশূন্য। এখন বুঝতে পারছে, হাঁদা বনে গেছে সে; আসলে ওই লোকটা ভোঁদাই-মাল সেজে ঠকিয়েছে ওকে, এমনকী তার গোলচে কাঁধ আর বিরাট ওই ভুঁড়িটা পর্যন্ত নকল!

'কিন্তু... কিন্তু... ছুরিটা কোত্থেকে...' এতক্ষণে বাকস্ফূরণ হলো ক্যাপ্টেন মাহমুদের।

'ওটা আমার মাফলারের ভাঁজে ছিল,' বলল মাসুদ রানা। 'গলার সামনের দিকে মাফলারের তলায় রাখার জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরি।'

'তিরিশ ফুট দূর থেকে তোমার যে-কোনও চোখে ওটা বিঁধিয়ে দিতে পারবে রানা,' গর্বের সঙ্গে বললেন রাহাত খান, 'একশোবারে একশোবারই।' কথাটা বলে ফেলেই বুঝলেন,

রানার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন, কটমট করে তাকালেন তিনি ওর দিকে। 'হাঁ করে কী শুনছ, আর কী কী আছে দেখাও ওকে।'

নির্দেশ পালন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা। ওর মাফলারের তলা থেকে বের হলো সরু একপ্রস্থ তার। ওটার দু'প্রান্তে দুটো রিং। 'শ্বাস আটকে মারার জন্যে। কীভাবে, দেখবে? এই যে...'

লাফ দিয়ে সরে গেল মাহমুদ তিন হাত তফাতে, সজোরে মাথা নাড়ল। দেখবে না। কীভাবে এটা দিয়ে খুন করা হয়, দেখেছে ও গডফাদার ছায়াছবিতে লুকা ব্রাসির খুনের দৃশ্যে। বাপরে-বাপ!

এবার নির্বিকার চেহারায় জানাল রানা। 'আমার হাত-ঘড়িটা টাইম তো দেয়ই, প্রয়োজনে একে টাইম-বোমা হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। বেল্টের বাকলের ভেতরে গোপন কুঠুরিতে আছে যে-কোনও সাধারণ তালা খোলার জন্যে লক-পিক। জুতোর সোলের ভেতরে রয়েছে মিনি ট্র্যান্সমিটার আর একটা চার ভাঁজ করা স্টিলেটো ...ব্যস, আপাতত এ-ই।'

'বিরাট বড় একটা ভুল করে ফেলেছ তুমি, ক্যাপ্টেন,' মাপা স্বরে বলল সলীল। 'এরকম ভুল করলে তো বেঘোরে মারা পড়বে তুমি শত্রুর হাতে।'

ভগ্নহৃদয় ক্যাপ্টেন মাহমুদ ফ্যাকাসে চেহারায় তাকাল পরীক্ষকদের দিকে। কোনও মন্তব্য করল না কেউ, নম্বর টুকছে যার-যার নোট প্যাডে।

'বিসিআই-এ তুমি নিয়োগ পাবে কি না সেটা অনেকখানিই নির্ভর করে তোমার সপ্রতিভ, সদাসতর্ক ও সদাপ্রস্তুত থাকার ওপর,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে টাইপ করা কাগজে অন্যান্য পরীক্ষায় ক্যাপ্টেনের ফলাফল দেখলেন মেজর জেনারেল। 'আর সব বিষয়ে তো খারাপ করোনি দেখছি। যাক, বাকিটুকু নির্ভর করবে পরীক্ষকদের নম্বরের ওপর।'

সিগারটা অ্যাশট্রেতে টিপে নেভালেন রাহাত খান, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওয়েল, তোমাদের দেয়া নম্বরগুলো বন্ধ খামে করে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিয়ো।' দরজার কাছে চলে গিয়ে জানালেন, 'রানা, ওকে নিয়ে পনেরো মিনিট পর আমার অফিসে এসো।' লাউঞ্জে বেরিয়ে গেলেন তিনি কনফারেন্স হল থেকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস বইল কনফারেন্স রুমে। রানার ভুঁড়িতে কনুইয়ের একটা গুঁতো লাগিয়ে দিয়ে, পাল্টা আক্রমণ আসবার আগেই লাফ দিয়ে কেটে পড়ল সোহেল।

বের হলো অন্যরাও। বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে মেজর জেনারেলের পিছু নিল রানা, তারপর তারেক মাহমুদকে নিয়ে সটকে পড়ল করিডোরের প্রথম বাঁকে।

তেরো মিনিট পর রাহাত খানের আউটার-অফিসে হাজির হয়ে গেল ওরা, পেট ও কাঁধের প্যাডিং খুলে আবার আগের সুঠাম দেহ ফিরে পেয়েছে রানা।

রানাকে দেখে সুন্দর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল ইলোরার। ব্যাটা কখন কী করে বসে, ঠিক আছে? কঙ্কন-রিনিঝিনি কণ্ঠে বলল, 'খবরদার, এখানে দাঁড়াবে না! সার এক্ষুনি তোমাদের ভেতরে যেতে বলেছেন।'

ইলোরাকে একফালি মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে দরজায় দু'বার নক করে বিসিআই চিফের অফিসে ঢুকল রানা, ওর পিছনে তারেক মাহমুদ।

'টেক ইয়োর সিট,' সিগার তাক করে টেবিলের উল্টোপাশে চেয়ারদুটো দেখালেন রাহাত খান। তাঁর সামনে টেবিলের উপর দেখা যাচ্ছে পরীক্ষকদের রিপোর্ট।

পাশাপাশি বসল ওরা। বুকের খাঁচায় লাফাচ্ছে ক্যাপ্টেনের হৃৎপিণ্ড।

কাঁচাপাকা ভুরুর নীচ দিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে সরাসরি তাকালেন বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

'যদি মনে করো ট্রেইনিং মাত্র শুরু হয়েছে তোমার, আরও বহুকিছু শিখবার আছে, তা হলে হয়তো কোনও অ্যাসাইনমেণ্টে মাসুদ রানার সঙ্গে শিক্ষানবীশ হিসেবে থাকতে পারবে তুমি। এটাও পরীক্ষার একটা অংশ। সুযোগটা নিতে চাও?'

'আমি একেবারেই নতুন, সার,' হড়বড় করে বলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, একটা সুযোগ পেতে পারে জেনে কৃতজ্ঞ, 'মাত্র শিখতে শুরু করেছি। কোনও অ্যাসাইনমেণ্টে যাবার সুযোগ পেলে সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে করব।'

'আমিও,' মনে মনে বলল রানা। 'নইলে বাঘা বুড়োটা অ্যাসাইনমেণ্টের সামান্য একটু আভাস দিতেই এমন উত্তেজনা অনুভব করছি কেন!'

রিমোট তুলে কয়েকটা সুইচ টিপলেন মেজর জেনারেল, একপাশে সরে গেল দেয়ালের খানিকটা অংশ। ওখানে বড় একটা স্ক্রিন, তাতে ফুটে আছে মানচিত্র। কোন্ দেশের ম্যাপ, আকৃতি দেখে চিনতে পারল না রানা।

'বান্ধেরা লেক, আর আশপাশের দুই বর্গমাইল এলাকা,' রানার না-করা প্রশ্নের জবাবেই যেন বললেন রাহাত খান। 'আসামের সীমান্ত থেকে বেশ কয়েক মাইল ভেতরে, বড়সড় একটা পাহাড়ি হ্রদ বান্ধেরা। চারপাশে ঘন জঙ্গল। আসাম লিবারেশন আর্মির মুভমেণ্ট থাকায় এলাকাটা প্রায় জনশূন্য। এয়ারপোর্ট তো নেই-ই, হ্রদে পৌঁছানোর জন্য কোনও পাকা সড়কপথও নেই। যেতে হবে প্লেনে। সি-প্লেন নামতে পারবে হ্রদে। বান্ধেরার পুব তীরে তাঁবু ফেলেছেন এক পাকিস্তানি ফিযিসিস্ট, ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ। ওখানেই ওঁর সঙ্গে দেখা করবে তোমরা।'

'ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ!' বলল বিস্মিত রানা, 'ইনিই কি সেই বিশ্ববিখ্যাত পাকিস্তানি বিজ্ঞানী, সার?'

'হ্যাঁ। দুনিয়ার সেরা দশজনের একজন। আলট্রা-সাউণ্ড

ওয়েপন, অ্যাটম ফিউযিং আর অ্যারোনটিক্স ফিল্ডে মস্তবড় অবদান আছে তাঁর। মাস চারেক আগে সরকারী টিভি চ্যানেলে পাকিস্তানে মাথা চাড়া দেয়া ইসলামি জঙ্গিবাদ ও ফ্যানাটিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য দিয়ে মহা বিপাকে পড়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। সেসময় কয়েকটা ডেইলি পেপারেও তাঁর সাক্ষাৎকার বেরিয়েছিল। ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কঠোর বক্তব্য দিয়ে আলোচিত-সমালোচিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি গোটা পাকিস্তানে। প্রথমে প্রাণনাশের হুমকি দিল তাঁকে কয়েকটা জঙ্গি সংগঠন। এর পরপরই হামলা হলো তাঁর বাড়ি ও গাড়িতে। এমনকী আত্মঘাতী বোমাসহ ধরা পড়ল তিনজন তাঁর ল্যাবের আশপাশ থেকে। নানান ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত ওদেশের বর্তমান সরকার তাঁকে প্রোটেকশন দিতে পারবে না বুঝে পালালেন তিনি পাকিস্তান থেকে, বিশ্বস্ত এক দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়লেন ভারতে। তারপর থেকে ভারতের বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্সের চোখ ফাঁকি দিয়ে এখানে-ওখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।'

'কেন?' মাহমুদের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা।

ভ্রূ কুঁচকে ওকে দেখলেন বৃদ্ধ, তবে সহজ ভাবেই বলে চললেন, 'ওরা যতই আদর-খাতির করুক, কিছুতেই ভারতে থাকবেন না তিনি। বহুবার বিবৃতি দিয়েছেন, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণেই বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের এই করুণ, অপাংক্তেয় অবস্থা। চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মুক্তমনের মুসলিম তিনি, তাই মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ নেই এমন কোনও মুসলিম দেশে বাস করতে চান। ...বাংলাদেশকেই আসলে তাঁর প্রথম পছন্দ। পড়ে দেখো...'

একটা ফাইল এগিয়ে দিলেন রাহাত খান। ওটাতে ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজের পক্ষে-বিপক্ষে প্রকাশিত পাকিস্তানী বেশ কিছু দৈনিক পত্রিকার কাটিং রয়েছে।

রানা ও তারেক মাহমুদ ওগুলো পড়ে মুখ তোলার পর রাহাত

খান আবার শুরু করলেন, 'গত পরশু আমাদের স্পেশাল বিসিআই ফ্রিকোয়েন্সিতে যোগাযোগ করেছেন উনি।'

'কীভাবে?' তাজ্জব হয়ে গেল রানা। 'আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি উনি কোথায় পেলেন, সার?'

'আমাদের লোকই দিয়েছে, ইসলামাবাদে,' আরও গম্ভীর হয়ে গেল রাহাত খানের চেহারা। রানার চোখে প্রশ্ন দেখে জবাবটা নিজেই দিলেন, 'আমার অনুমতি নিয়েই। ডক্টর ইমতিয়াজের সঙ্গে যোগাযোগের পরদিনই আততায়ীর ভয়ে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয় সে। তার পরের রাতে কোনও ট্রেস না রেখে উধাও হয়ে যান বিজ্ঞানী। হৈ-চৈ পড়ে যায় পাকিস্তান সরকারের ওপর মহলে। খবরটা লিকআউট হতে না দিয়ে গোপনে খুঁজতে শুরু করে তাঁকে পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স। খুঁজতে শুরু করে ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসও। ...দেড়মাস পর পরশুদিন যোগাযোগ করেছেন উনি তাঁর গোপন আস্তানা থেকে। শুধু আমরাই জানি ওঁর লোকেশন। যা আভাস দিয়েছেন, তার সার-সংক্ষেপ হলোঃ নিজের যুগান্তকারী একটা আবিষ্কার তুলে দিতে চান তিনি বাংলাদেশের হাতে, তার বদলে চান এখানে নিরাপদ রাজনৈতিক আশ্রয়।'

'জিনিসটা কী, সার?' সামনে ঝুঁকে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ।

বিরক্ত হলেও সেটা প্রকাশ করলেন না মেজর জেনারেল, গম্ভীর চেহারায় বললেন, 'ওটার নাম দিয়েছেন তিনি সনিক মিরাক্‌ল্। ওঁর বর্ণনা থেকে আন্দাজ করছি, জিনিসটার আকৃতি সাধারণ কোনও হান্টিং রাইফেলের মতই। সরু রেখায় আলট্রাসনিক বিম ছুঁড়ে দেয় ওটা—অনেকটা কনেসেন্ট্রেটেড লেযার বিমের মত। ভদ্রলোক জোর দিয়ে বলছেন, কোনকিছুর দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লে সেটার অ্যাটমিক স্ট্রাকচার-এ চরম বিঘ্ন ঘটায় ওই শব্দতরঙ্গ। ফলাফলঃ বোমা যেমন করে ফাটে, ঠিক তেমনি করে বিস্ফোরিত হয় টার্গেট। মাইণ্ড ইট, অস্ত্রটার রেঞ্জ পাঁচ

হাজার মিটার!'

'বাপরে! শুনলে বিশ্বাস হতে চায় না!' বিড়বিড় করে বলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ।

'আমাদের বিজ্ঞানীরাও একই কথা বলছেন,' সিগার ধরালেন রাহাত খান। 'তবে ওরকম কোনও অস্ত্র তৈরি করা একেবারে অসম্ভব বলেও মনে করছেন না তাঁরা।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমাকে দেখতে হবে সনিক মিরাকল অস্ত্র হিসেবে কতখানি কার্যকর। যদি সত্যিই কাজের জিনিস হয়, আর ওটার ধ্বংসক্ষমতায় তুমি সন্তুষ্ট হও, তা হলে ওটার প্রোটোটাইপ আর নকশার বদলে ডক্টরকে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আশ্বাস দেবে তুমি। উনি যদি অন্য কোনও শর্ত দেন, বিসিআইয়ের টপ সিক্রেট টেন ফ্রিকোয়েন্সির যে-কোনও একটায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে।'

'জী, সার।'

পাশ থেকে একটা ফাইল টেনে নিয়ে খুললেন রাহাত খান, ফাইলে চোখ নামিয়ে বললেন, 'আগামীকাল সকালে রওনা হচ্ছ তোমরা কুমিল্লা থেকে। ট্র্যাভেলিং অ্যারেঞ্জমেণ্ট-এর ডিটেইল্‌স্ জেনে নিয়ো সোহেলের কাছ থেকে। ...এবার তোমরা এসো।'

রানার পাশে হেঁটে বের হলো তারেক মাহমুদ, পিছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবার পর লজ্জিত চেহারায় স্বীকার করল, 'একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন, মাসুদ ভাই।'

'আরে, ও কিছু না! বিসিআইতে এসে প্রথম প্রথম আমরাও কম বোকা বনিনি,' সান্ত্বনার সুরে বলল রানা। 'চলো, ক্যাণ্টিনে যাওয়া যাক। চা খাব। জাঁদরেল বুড়োর ভয়ে গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ!'

ওর বলবার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। অনেক সহজ বোধ করছে ও রানার আন্তরিক ব্যবহারে।

•

দুই

চব্বিশ ঘণ্টা পর সি-প্লেনের পাইলট, লেফটেন্যান্ট নেভি, আলতাফ নাদ্‌ভীর পাশে ককপিটে বসে বিভিন্ন দোয়া-দরুদ পড়ে বুকে ফুঁ দিতে শুরু করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। ভারত সীমান্ত কাছাকাছি আসতেই রেইডার ফাঁকি দেবার জন্য সি-প্লেনটাকে একেবারে নীচে নামিয়ে এনেছে লেফটেন্যান্ট নাদ্‌ভী, তারপর ঢুকে পড়েছে ভারতীয় ভূখণ্ডে। উইণ্ডস্ক্রিন দিয়ে তাকালে মনে হয়, এই বুঝি সবুজ পাহাড়গুলো গুঁতো মারবে প্লেনের পেটে, দূরের পাহাড়সারি দ্রুত ধেয়ে আসছে ওদের বাধা দিতে। একটার পর একটা সবুজ দেয়াল টপকে ছুটে চলেছে খুদে বিমান, মাঝে মাঝে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ছে দুই পাহাড়ের মাঝখানে, উড়ে চলেছে পাহাড়ের গা ঘেঁষে। বুকে আশঙ্কা জাগে, একটা দেয়াল হয়তো টপকাতে পারবে না শেষপর্যন্ত, কিংবা এই বুঝি পাশ থেকে গুঁতো খাবে পাহাড়ের গায়ে।

পিছনের সিটে বসে মাসুদ ভাইকে নিশ্চিন্তে খবরের কাগজ পড়তে দেখে ঈর্ষা হলো মাহমুদের। স্থির করল, যত কঠোর ট্রেইনিংই নিতে হোক, ওরকম খাঁটি টাইটেনিয়ামের মত পোক্ত স্নায়ু চাই ওরও।

আধঘণ্টা পর উইণ্ডশিল্ডে টোকা দিল লেফটেন্যান্ট নাদ্‌ভী, ইঞ্জিনের গর্জনের উপর দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ওই দেখুন বান্ধেরা লেক। আমরা যেখানে নামব, সেখান থেকে রঁদেভু পয়েন্ট কয়েকশো গজের বেশি নয়।'

শান্ত হ্রদের নীল জলরাশির বুকে রাজহংসের মত রাজসিক ভঙ্গিতে নামল নেভির সি-প্লেন। পুব তীরের একশো গজ দূরে ছোট্ট বিমানটাকে থামাল আলতাফ, বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। সিটে হেলান দিয়ে বলল, 'আর কাছে যেতে সাহস পাচ্ছি না, সার। তীর ঘেঁষে অসংখ্য ডুবো-পাথর রয়েছে।'

এবড়োখেবড়ো উঁচু-নিচু দাঁতের মতো চূড়াগুলো দূর থেকে ঘিরে রেখেছে সবুজ ঘাসে ছাওয়া অগভীর বাটির মতো জায়গাটাকে। পিরিচের বুকের মাঝখানে যেন বসে আছে গাঢ় নীল পানির শান্ত হ্রদ। হ্রদের তীরে পড়ে আছে বড় বড় পাথর। ওগুলোর ফাঁকে ফাঁকে জন্মেছে বিশাল সব গাছ, বাঁশঝাড়। কোথাও কোথাও হ্রদের তীরে দেয়াল তৈরি করেছে ঘন সবুজ গাছের গহীন জঙ্গল।

আলতাফ নাদ্‌ভীর কথা শেষ হতে না হতে ছোট একটা নৌকা এগিয়ে আসতে দেখল রানা। তীরবর্তী জঙ্গলে নিশ্চয়ই সরু কোনও খাল আছে, সেটা থেকে বেরিয়ে সোজা সি-প্লেনের দিকে আসছে নৌকাটা। একজন মাত্র লোক বৈঠা বাইছে। তবে তাকে মানব না বলে দানব বললে একটুও মিথ্যে বলা হবে না। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। নৌকা বাইতে গিয়ে হাতের পেশিগুলো কিলবিল করছে।

মিনিট পাঁচেক পর সি-প্লেনের স্টারবোর্ড পনটুনের গায়ে ঢপ্‌ করে ভোঁতা একটা শব্দ হলো। পাশের ছোট্ট জানালা দিয়ে তাকাল রানা, মুখ উঁচু করে ওর দিকেই চেয়ে আছে খাকি পোশাক পরা পুরুষ্টু গোঁফওয়ালা দৈত্যটা। লম্বায় ওর চেয়ে একমাথা বেশি হবে লোকটা, চওড়ায় দেড় কি দুইগুণ।

তারেকের সামনে দিয়ে হাত বাড়িয়ে প্লেনের দরজা খুলল রানা, গলা বের করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ডক্টর মমতাজের কাছে নিয়ে যাবেন আমাদের?'

'হাঁ,' উর্দুতে জবাব দিল লোকটা। পরমুহূর্তে ভুল সংশোধন

করল রানার, 'আরে, ন্যহি, উনকা নাম মামতাজ ন্যহি, ডাক্টার ইমতিয়াজ। হাম ডাক্টার সাহাবকা সেরকেটারি-কাম-বডিগার্ড হুঁ। আইয়ে, ডাক্টার সাহাব আপ দোনোকে লিয়ে বহোত পেরেশানিসে ইন্তেযার ক্যর রাহে হ্যায়।'

দু'মিনিট পর রানা ও তারেক মাহমুদকে নিয়ে তীরের দিকে রওনা হয়ে গেল সে। পিছনে সি-প্লেনের ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল ওরা। রওনা হয়ে গেল আলতাফ, ভিনদেশি রেইডার ফাঁকি দিয়ে ফিরে যাবে স্বদেশে।

রানার ধারণাই ঠিক, জঙ্গলে ঢুকেছে সরু একটা খাল, দুই তীরে উঁচু শালগাছ ও বাঁশঝাড়ের ঘন সারি। খাল না বলে ওটাকে প্রশস্ত নালাও বলা যায়। কিছুটা এগিয়ে বামদিকের পাড়ে কাঁচাহাতে তৈরি করা কাঠের নড়বড়ে ডক দেখতে পেল ওরা। পানির উপর সামান্য এগিয়ে আছে ওটা। শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন নীল স্ট্রাইপ্‌ড্ সুট পরা মাঝবয়েসী এক সুদর্শন ভদ্রলোক। রানা ও মাহমুদ ডকে নামতেই চোস্ত ইংরেজিতে বললেন তিনি, 'খুব খুশি হয়েছি, আপনারা এসেছেন। গাফ্‌ফার খান আপনাদের তাঁবুটা দেখিয়ে দেবে। ওখানেই বিশ্রাম নেবেন আপনারা আগামী তিন-চারটে দিন।'

'এখানে আসতে কোনও খাটনি হয়নি আমাদের, তাই বিশ্রামের কোনও দরকার নেই, ডক্টর ইমতিয়াজ,' পরিচয়-পর্ব সেরে ভদ্রলোকের বাড়ানো হাতটা ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল রানা, 'বরং আপনার সনিক মিরাকলটা দেখতে পেলে খুশি হব।'

'পরেও দেখতে পারবেন ওটা,' ভদ্রতা করে হাসলেন ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ। 'বিশ্রাম নিন, শীতের আসামের অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতি দেখুন, যত খুশি মাছ ধরুন লেকে, সাঁতার কাটুন।' রানা আপত্তি করে কিছু বলতে যাচ্ছে বুঝে এবার বললেন, 'আসলে অস্ত্রটার দু-একটা যন্ত্রাংশ ঠিকমত কাজ করছে না, মিস্টার রানা। ওটা মেরামত করার আগে কোনও ডেমনস্ট্রেশন দেখানো সম্ভব

নয়।'

'পার্টস্‌গুলোর নাম বলুন, রেডিও করে দেখি আমরা আনিয়ে দিতে পারি কি না,' আগ্রহের সঙ্গে বলল রানা।

দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়লেন ডক্টর। 'আসলে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। সাধারণ অস্ত্রে যেসব পার্টস থাকে, সেগুলো দিয়ে তৈরি করিনি আমি সনিক মিরাকল। মিরাকলের প্রতিটা অংশ আমার নিজের হাতে বানানো। বাংলাদেশ সরকার যদি আমার তৈরি অস্ত্রটার ব্যাপারে আগ্রহী হয়, তা হলে ওটার ম্যাস প্রোডাকশন চাইতেই পারে। সেক্ষেত্রে আপনাদের কোনও আধুনিক ল্যাবোরেটরিতে কাজ করবার সুযোগ দিতে হবে আমাকে, তা নইলে জটিল ইলেকট্রনিক সার্কিট আর সূক্ষ্ম পার্টসগুলো তৈরি করা অসম্ভব। কিছু মনে করবেন না, মিস্টার রানা, আশা করছি আমার অপরিহার্যতাই এনে দেবে আমাকে কাঙ্ক্ষিত নিরাপত্তা।'

মূল প্রসঙ্গে ফিরে গেল রানা, 'পার্টস মেরামত করতে কতক্ষণ লাগবে আপনার, ডক্টর?'

'দুই... বড়জোর তিনদিন।' ইতস্তত করলেন ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ। 'আমার অপারগতা ক্ষমা করবেন, মিস্টার মাসুদ রানা।' হাতের ইশারা করলেন বিজ্ঞানী। 'আসুন আপনারা, তাঁবুতে চলুন।'

পথ দেখাল দৈত্য, ঘন বাঁশঝাড় ও শালগাছের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল দ্রুত। বাঁশগাছগুলোতে ফুল আসেনি এখনও। রানা শুনেছে, পঞ্চাশ বছর পরপর নাকি ফুল আসে ওগুলোতে, ওই সময় দেখা দেয় লক্ষ লক্ষ ইঁদুর, সমস্ত ফসল খেয়ে সাফ করে দেয় ওরা। জঙ্গল মরে যায় তখন, এবং শুরু হয় পাহাড়ি দুর্ভিক্ষ আগামী দু'এক বছরের মধ্যেই আসছে বাঁশগাছে ফুল ধরবার সেই ভয়ঙ্কর সময়। মিজোরামের দিকে দুর্বিষহ দুর্ভিক্ষের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ভারত সরকার, রানা জানে। বাংলাদেশ

সরকার এ-ব্যাপারে এখনও উদাসীন।

আকাশ-ছোঁয়া কয়েকটা তেঁতুল গাছের নীচে ফাঁকা জায়গায় তাঁবু দুটো দেখতে পেল ওরা মিনিট বিশেক হাঁটবার পর। কথায় কথায় বিজ্ঞানী জানালেন, বড় তাঁবুটা ব্যবহার করছেন তিনি তাঁর ল্যাবোরেটরি ও কোয়ার্টার হিসেবে।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চৌকো আকৃতির আরবী তাঁবুটাতে ঢুকে পড়লেন তিনি। গাফ্ফার খানের সঙ্গে ছোটটায় গিয়ে ঢুকল রানা ও মাহমুদ। মেঝের দু'দিকে ফেলা দুটো তেরপল দেখাল খান, বিশ্রী উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, 'আপনারা শোবেন ওখানে।'

পিঠ থেকে হ্যাভারস্যাক নামিয়ে বামপাশের তেরপলের উপর রাখল রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, মিস্টার খান, এখানে আসবার আগে বা পরে ডক্টর ইমতিয়াজের কোনওরকম বিপদ হয়েছিল?'

সরাসরি রানার চোখে অন্তর্ভেদী খয়েরী চোখদুটো রাখল দেহরক্ষী। 'কী বলতে চাইছেন বুঝলাম না, জনাব মাসুদ রানা।'

'বলতে চাইছি, ডক্টর ইমতিয়াজ তো তাঁর দেশের, মানে পাকিস্তানের, নামকরা একজন বিজ্ঞানী। দেশ ছেড়ে তাঁর পালানোটা নিশ্চয়ই সহজভাবে নেয়নি পাকিস্তান সরকার? এমন কি হতে পারে, তারা ডক্টর ইমতিয়াজের খোঁজে কাউকে বা কোনও দলকে পাঠিয়েছে?'

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাসল খান। 'হয়তো পাঠিয়েছে, হামি জানে না। তবে, আপ ইত্‌মিনান্‌সে রাহিয়ে, দুনিয়ার কোঈভি জানে না হামলোগ কাঁহা হ্যায়।'

'তারপরও, যদি কেউ টের পেয়ে যায়?'

'কুছ ন্যহি হোগা। হামার নযর বাচাকে ক্যাম্পকে নযদিগ আসতে পারবে না কোঈ দুশমন,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল খান। শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটা পাকিস্তানী .৩২ মিশ্রী খান

রিভলভার বের করল সে, রানা ও মাহমুদকে ইশারা করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। 'হাম হ্যায় ডাক্টার সাহাবকা বডিগার্ড। তার জান্যে হামার জান কবুল। আসুক দেখি কেউ। জান লিয়ে ওয়াপস যাতে পারবে না। ...দেখিয়ে উধার।' তিরিশ গজ দূরে একটা ঝড়ে ওপড়ানো গাছ দেখাল সে রিভলভারের নল দিয়ে। গাছের কাণ্ডটার ব্যাস একফুটের বেশি হবে না। 'খেয়াল দিজিয়ে। উধার এক ছোটা গিটঠু দেখা যায়? ও-ই উধার?'

গিঁঠের উপর রানার দৃষ্টি স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় রিভলভারটা তুলল খান, কব্জির নীচে বাম হাতের ঠেকা দিয়ে এক সেকেণ্ড তাক করেই গুলি করল পরপর দু'বার। গুলির আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর অস্ত্রটা নামিয়ে নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'দুইটা গুলির একটাও যদি ওই গিটঠুর এক ইঞ্চিসে যিয়াদা দূরে লাগে, আপনা কান কাটকে কুত্তাকো খিলাব হামি।'

'দারুণ শুটিং করেছেন তো!' আন্তরিক প্রশংসা ঝরল তারেক মাহমুদের কণ্ঠে, 'একেবারে টার্গেটেই লেগেছে আপনার একটা গুলি।'

'ঠিক,' বলল রানা। 'সত্যিই দারুণ হাত আপনার।'

'এবার আমি দেখি তো চেষ্টা করে,' শোল্ডার হোলস্টার থেকে বিসিআই ইশ্যু ওয়ালথারটা বের করল মাহমুদ, পাশ ফিরে পিস্তল তাক করল কাণ্ডের ওই গিঁঠের দিকে, তারপর হালকা ভাবে স্পর্শ করল হেয়ার-ট্রিগার। কড়াৎ শব্দে লাফিয়ে উঠল .৩৮ ওয়ালথার পিপি। মনটা খারাপ হয়ে গেল বেচারার, গাছের গায়ে তৃতীয় গুলির চিহ্ন নেই কোথাও। সেফটি-ক্যাচ তুলে দিয়ে অস্ত্রটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল মাহমুদ।

রানা বলল, 'চলুন, দেখা যাক কার গুলি কোথায় লাগল।'

খানের গুলির তৈরি ফুটো আর ওই গিঁঠটাকে এক টাকার একটা কয়েন দিয়ে ঢেকে দেয়া যাবে। একটা গুলি তো সরাসরি

গিঁঠের মাঝখানে লেগেছে। দ্বিতীয় গুলিটা লেগেছে প্রথম গুলির এক ইঞ্চি দূরে।

'অওর দেখ্না ক্যয়া হ্যয়? ইয়াহাঁসেই দিখাই যা র‍্যহা, আপ মিস কিয়া,' টিটকারির সুরে মাহমুদকে বলল গাফ্ফার। 'বোঙ্গালি বাবু হ্যায় তো, বান্দুক-পিস্তল হাথ্মে উঠানা আপলোগোঁকা কাম ন্যহি।'

'গাছের ওপাশে গিয়ে ওদিকটা একটু দেখুন,' পরামর্শ দিল গম্ভীর রানা।

'ক্যয়া হোগা দেখ্নেসে?' গোঁফে তা দিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসল গাফ্ফার খান। 'আপ বোঙ্গালিলোগ টার্গেটমে গোলি লাগানেকা লায়েকহি ন্যহি হ্যায়! বোঙ্গালি কাভি হাথিয়ার পাকাড়না সিখা?' হেসে উঠে ক্যাপ্টেন মাহমুদকে দেখল সে আপাদমস্তক।

রানার মনে হলো, সেঁটে এক চড় মেরে ফাটিয়ে দেয় হামবাগ লোকটার বাম কান। বলতে ইচ্ছে হলো, তা হলে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিদের ভয়ে ইঁদুরের মত গর্তে লুকিয়েছিলি কেন তোরা? ইণ্ডিয়ান আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলি কাদের ভয়ে? কিন্তু মেজাজটা সামলে নিল ও। মাথা গরম করে মারামারিতে জড়িয়ে পড়তে এখানে পাঠানো হয়নি ওকে।

কিন্তু বাঙালিদের প্রতি ছুঁড়ে দেয়া পাকিস্তানী দানবের অপমান আর সহ্য হলো না তরুণ ক্যাপ্টেন তারেকের, রানা ঠেকাবার আগেই 'বেত্তমিজ! বেল্লিক! ব্যাটা বদমাশের ছাও!' বলে হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে প্রৌনে সাতফুটি গাফ্ফারের উপর, প্রতিপক্ষকে ক্ষণিকের জন্য অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে দুইহাতে ধুপধাপ চার-পাঁচটা ঘুসি বসিয়ে দিল তার বুকে আর চোয়ালে।

ঘুসির ধাক্কায় কয়েক পা পিছিয়ে থমকে দাঁড়াল গাফ্ফার, তারপর ভালুকের মত দীর্ঘ দু'হাতের মুঠো পাকাল পাল্টা ঘুসি ছুঁড়তে।

প্রতিপক্ষ প্রস্তুতি নিচ্ছে দেখে তার দিকে সোৎসাহে এগোল তরুণ ক্যাপ্টেন; দেড়গুণ আকারের শত্রুর মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছে না বিন্দুমাত্রও।

মাহমুদকে থামাতে গিয়েও থামাল না রানা। দেখাই যাক না, এই দৈত্যের বিরুদ্ধে আনআর্মড কমব্যাট কতটা কাজে লাগাতে পারে মাহমুদ।

ভালুকের মতো হেলেদুলে দু'ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল গাফ্ফার খান, তারপর ডানহাত ঘুরিয়ে কাঁধের জোরে ঘুসি মারল মাহমুদের চোয়াল লক্ষ্য করে। বসে পড়ে ঘুসিটা এড়িয়ে গেল মাহমুদ, দুটো আপারকাট মেরে বিস্মিত খানকে একটু পিছাতে বাধ্য করে কাঁধ দিয়ে গুঁতো বসিয়ে দিল তার পেটে। ওর মনে হলো, পাথরের দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে কাঁধ। উঠে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে শত্রুর লম্বা হাতের আওতার বাইরে সরে যেতে চেষ্টা করল ও। তারই ফাঁকে পাশ থেকে আবার ঘুসি মারল খানের পাঁজর লক্ষ্য করে।

মাহমুদের হাতের মুঠিটা এবার খপ্ করে ধরে ফেলল গাফফার খান তার বিশাল থাবায়, তারপর সন্তুষ্টির গর্জন ছেড়ে মোচড় দিল জোরে। তীব্র ব্যথায় বাঁকা হয়ে গেল মাহমুদ, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে বাধ্য হলো। বাঁ হাত তুলে শত্রুর কড়ে আঙুল ধরতে গিয়ে বুঝল, আনআর্মড কমব্যাটে গাফফার খানও কম দক্ষ নয়। পাশ থেকে এক্ষুনি ওর ঘাড়ের ওপরে নেমে আসবে লোকটার হাতের তালুর শক্ত কিনারা, প্রচণ্ড আঘাতটা ঠিকমত লাগলে জ্ঞান হারাবে ও। কাঁধে ব্যথা বাড়বে বুঝেও ঝটকা মেরে ডানহাতটা ছুটিয়ে নিতে চেষ্টা করল মাহমুদ, পারল না। তারপরেই দেখতে পেল, ভোজবাজির মত খানের হাতে চলে এসেছে একটা ক্ষুরধার ছোরা। কারাতের কোপ নয়, ওর ঘাড় বরাবর নেমে আসছে গাফফার খানের হাতে ধরা ছোরাটা। হাসছে লোকটা, গলার গভীর থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হচ্ছে, বীভৎস

দেখাচ্ছে চেহারা।

মৃত্যু আর কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার, বুঝে ফেলল মাহমুদ। কারও সাহায্য চাওয়া বা পাওয়ার আগেই কল্লাটা গড়াগড়ি খাবে ঘাসের উপর। চোখের কোণ দিয়ে বামপাশে ঝাপসা মত কী যেন দেখল মাহমুদ। পরমুহূর্তে টের পেল, বিদ্যুৎ-বেগে কাছে চলে এসেছে মাসুদ ভাই। গোক্ষুরের ছোবল দেয়ার ভঙ্গিতে রানার ডানহাতটা ধরে ফেলল গাফফার খানের ছুরি ধরা হাতের কবজি, ছুরিটাকে থামিয়ে দিল মাঝপথে। ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল গাফফার খান, বিশ্রী কয়েকটা গালাগালি দিয়ে মাহমুদের হাত ছেড়েই দেরি না করে বামহাতে ঘুসি ছুঁড়ল রানার চোয়াল লক্ষ্য করে।

মাথাটা সামান্য সরিয়ে নিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে ঘুসিটা বেরিয়ে যেতে দিল রানা। ফসকানো ঘুসির বেগে ভারসাম্য হারিয়ে দানবটা ডানদিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখেই সুযোগটা নিল ও—এক টানে কবজিধরা হাতটা ওর মাথার উপর দিয়ে নিয়ে এল নিজের ডানপাশে। রানার সামনে ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে এখন দানব। ডানহাতের কবজি রানার মুঠি থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে, একইসঙ্গে বাম কনুইয়ের আঘাতে রানার পাঁজরের চার-পাঁচটা হাড় ভেঙে দেয়ার জন্য উপরে তুলছে হাতটা। থাবা দিল রানা খানের বাবরি লক্ষ্য করে, আচমকা হ্যাঁচকা টান খেয়ে আকাশের দিকে উঠে গেল দানবের দৃষ্টি। পরমুহূর্তে পিছনদিকে হেলে পড়ে যেতে শুরু করল রানা—একটা পা তুলে দিয়েছে লোকটার কোমরে। ওর সঙ্গে পিছনে হেলে পড়ছে গাফফার খানও। নিজের কোমর মাটিতে ঠেকতেই দ্বিতীয় পা-টাও দৈত্যের চওড়া কোমরে তুলল রানা; তারপর একইসঙ্গে ছুঁড়ল দুই পা আসমানের দিকে। এবার নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিল লোকটার ছুরিধরা কবজি।

রানার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল চারমণী বস্তা, শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে ধড়াস করে পড়ল উপুড় হয়ে, কপাল ঠুকে গেল

শক্ত মাটিতে। উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, অবাক হয়ে দেখল, রক্তাক্ত নাক-মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে দানবও। মুখ দিয়ে পাঞ্জাবী গালাগালির তুফান বের হচ্ছে। চোখ নামিয়ে একবার দেখল ছোরা ছুটে গেছে তার হাত থেকে, তারপর নিচু একটা গর্জন ছেড়ে পাগলা ষাঁড়ের মতো আবার তেড়ে এলো সে রানার দিকে। ধারণা করেছিল পালাবে রানা, কিন্তু লোকটাকে অনড় দেখে চরম বিস্মিত হলো। আওতার মধ্যে পৌঁছে যেতেই লাফিয়ে শূন্যে উঠল রানা, প্রাণপণ শক্তিতে ফ্লাইং কিক ঝেড়ে দিল ওর নাক-মুখ সই করে। কড়মড় করে আওয়াজ হলো কয়েকটা দাঁত ভাঙার। চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা এবার। পড়েই বের করল ওর রিভলভার।

তীক্ষ্ণকণ্ঠের আদেশ ভেসে এল রানার পিছন থেকে: 'খান! এক্ষুনি অস্ত্র ফেলো! ওদের হাতের দিকে চেয়ে দেখো, গাধা কোথাকার!'

ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে রানা ও মাহমুদের হাতে দুটো পিস্তল দেখতে পেল গাফ্ফার খান। দুটোই চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

সামনে চলে এলেন ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ। শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনার ফিটনেসের প্রশংসা করতে হয়, মিস্টার রানা। আর মিস্টার মাহমুদের সাহসের। বোঝাই যাচ্ছে দোষটা বদরাগী, বেয়াড়া গাফফারের। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কী নিয়ে লাগল ও আপনাদের সঙ্গে?' আরও কয়েক পা এগিয়ে গাফ্ফারের রিভলভারটা তুলে নিলেন বৈজ্ঞানিক। 'তোমার অস্ত্রটা আপাতত সিজ করলাম আমি, খান। আর কোনও গোলমাল চাই না আমি, খবরদার!'

রানা ও মাহমুদও নিজ নিজ অস্ত্র ভরে রাখল হোলস্টারে। থোহ্ করে তিনটে রক্তাক্ত ভাঙা দাঁত মাটিতে ফেলল খান।

'গোটা বাঙালির জাত তুলে যা-তা বলছিল গণ্ডারটা,' নিচু স্বরে বলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ বিজ্ঞানীর প্রশ্নের উত্তরে। 'ছোরা বের করেছিল আমাকে খুন করবে বলে। মাসুদ ভাই বাধা না দিলে

আজ আমার লাশ পড়ে যেত এখানে!'

'পরে ওকে শাসন করব আমি,' বলে তাঁবুর ভিতর চলে গেলেন বিজ্ঞানী।

নিজেদের তাঁবুতে ফিরল রানা ও মাহমুদ। যে-কোনও মুহূর্তে আবার আক্রমণ আসতে পারে মনে করে সতর্ক রয়েছে দুজনেই। চুপচাপ বসে থেকে ধকলটা কাটিয়ে উঠল গাফফার খান। মিনিট পাঁচেক পর ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল তাঁবুর খোলা ফ্ল্যাপের সামনে। রানা ও মাহমুদকে শাসিয়ে চাপাকণ্ঠে উর্দুতে বিষোদ্গার করল কিছুক্ষণ, কিন্তু আগ বাড়িয়ে মারামারি করবার আর কোনও ইচ্ছে দেখা গেল না লোকটার মধ্যে। মারামারি করাটা মালিকের স্বার্থবিরোধী হয়ে যাবে, বুঝেছে বোধহয়। উঠতে যাচ্ছিল মাহমুদ, কিন্তু কাঁধে রানার হাত পড়তেই বসল আবার। কোনও জবাব দিল না কেউ খানের অশ্রাব্য খিস্তির।

গাফফার খানের কণ্ঠ শুনে আবার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ।

বিজ্ঞানীর নির্দেশে রানা ও মাহমুদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করতে বাধ্য হলো গাফফার খান। অপছন্দের কাজটা সেরে মুখ গোমড়া করে রাখল সে। দৃষ্টির আগুনে ক্যাপ্টেন মাহমুদকে ভস্ম করে দিয়ে অন্তত গুটিঙে যে ওর জয় হয়েছে, সেটা প্রমাণ করে ওই বোঙ্গালি দুজনকে কিছুটা শায়েস্তা করতে চাইল। বাঁকা হেসে বলল, 'দেখা যাক, গাছের পিছে আপনাদের কালিজার কওন টুকড়া আছে।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা ও মাহমুদ।

বিজ্ঞানীও এগিয়ে এলেন। দুটো গুলির দাগ দেখে প্রশংসা করলেন বডিগার্ডের। কিন্তু গাছটা ডিঙিয়ে ওপাশে গিয়েই বিস্ফারিত হয়ে গেল দেহরক্ষীর দু'চোখ। তার রিভলভারের সফ্ট-নোজ গুলি গাছের গুঁড়ির ভিতরে রয়ে গেছে, এটা ভাল করেই জানে সে। কিন্তু দেখা গেল, মাহমুদের ওয়ালথারের হলো-পয়েন্ট

বুলেট গুঁড়ি ফুটো করে বেরিয়ে গেছে—বেরোনোর জায়গাটা দিয়ে ঢুকে যাবে তার মুঠো পাকানো হাত! তার যে গুলিটা সেণ্টার থেকে এক ইঞ্চি দূরে লেগেছে, ওটার ভিতর দিয়েই গেছে ক্যাপ্টেন মাহমুদের গুলি।

বোঙ্গালি বাবুর দক্ষতা দেখে কালচে হয়ে গেল গাফ্ফার খানের চেহারা।

রানা বলল, 'ওর বুলেটের গর্তের ভেতর দিয়ে গেছে তোমার গুলি, মাহমুদ। তাই দেখা যাচ্ছিল না।'

'আপনি এবার দুটো কথা শোনাবেন না বুদ্ধুটাকে, মাসুদ ভাই?' হাসি হাসি চেহারায় জিজ্ঞেস করল মাহমুদ।

জবাব না দিয়ে সামান্য একটু মাথা নাড়ল রানা।

এই ঘটনার পর থেকে পরস্পরকে গরম চোখ দেখাল খান ও ক্যাপ্টেন মাহমুদ, কথা বলল না কেউ কারও সঙ্গে, তবে বিরোধটা বাড়লও না আর। বোঙ্গালিদের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে গাফ্ফার খান বাহাদুরের বেলুন থেকে বেরিয়ে গেছে বেশ অনেকটা গরম বাতাস।

দুপুরে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিল ওরা। তারপর সূর্যটা ঢলে পড়তেই পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়াটার ওপাশে মিলিয়ে যেতে শুরু করল দিনের আলো, প্রশান্ত হ্রদের গাঢ় নীল পানির বুকে এসে পড়ল ভাঙাচোরা কয়েক ফালি সোনালী রোদ। তারপর সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামল একসময়। কালোর সঙ্গে নীলের মিশেল দেয়া নরম মখমলের চাঁদোয়ার মতো মাথার উপর ঝুলে থাকল আকাশ, তাতে মিটমিট করল লক্ষ লক্ষ লাল-নীল-হলুদ নক্ষত্র। অল্পক্ষণেই সেগুলোকে ম্লান করে দিয়ে পুব-পাহাড়ের মাথায় উঠে পড়ল চাঁদটা। হ্রদের স্থির পানিতে চতুর্দশী চাঁদের নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেখা দিল। তারপর একসময় শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া মৃদু কাঁপন তুলল নিথর পানির বুকে, প্রথমে হেলেদুলে উঠল হাসিখুশি চাঁদমামা, তারপর খিলখিল করে হেসে কুটিপাটি। হ্রদের বুক ছুঁয়ে

পাহাড়ে-জঙ্গলে সরে এলো হাওয়ার শিহরন। মৃদু হাওয়া প্রশান্তির আলতো পরশ বোলাল জঙ্গলের পাতায় পাতায়, ফিসফিস করে বলল কত কী গোপন কথা। রানার মনে হলো, এ যেন পৃথিবীর বুকে অদ্ভুত সুন্দর এক অপার্থিব অভিজ্ঞতা।

পরবর্তী দুটো দিন কাটল নীরস ভাবে। মেঘহীন নীল আকাশে ঝলমল করল মাঘের সূর্য। ঝিরিঝিরি বাতাস বইল প্রায় সর্বক্ষণ, হ্রদের পানিতে ঢেউ উঠল ছোট ছোট। রানা ও মাহমুদ সময় কাটাল মাছ ধরে, নৌকা নিয়ে বেড়িয়ে, সাঁতার কেটে। ডক্টর ইমতিয়াজ ব্যস্ত থাকলেন তাঁর ল্যাবোরেটরিতে, এলাকার চারপাশে টহল দিয়ে বেড়াল গাফ্ফার সতর্ক বুলডগের মত।

তৃতীয় দিনটা এলো কেমন যেন বিষণ্ণতা নিয়ে। ভোর থেকেই শুরু হলো জোরালো উত্তুরে হাওয়া, সরসর আওয়াজে শিহরন তুলল গাছের পাতায়, শীতল স্পর্শে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল গায়ে। আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা দেখে মনে হলো বৃষ্টি নামতে পারে। বিকেলের দিকে হাসিমুখে ওদের তাঁবুতে এসে ঢুকলেন ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ, তাঁর সনিক মিরাকল তৈরি, প্রদর্শনীর আগে ল্যাবোরেটরিতে রানা ও মাহমুদকে দেখাতে চান জিনিসটা।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে জ্যাকেটের কলার উপরে তুলে দিয়ে গলা পর্যন্ত চেইন টানল রানা, তারপরও পাহাড়ি শীত অনায়াসে কামড় বসাল ওর হাড়ে-মজ্জায়। জগিং করতে করতে ওর পাশে চলল তারেক মাহমুদ।

ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ গোছানো স্বভাবের মানুষ, তাঁর ল্যাবোরেটরিটাও পরিপাটি করে সাজানো। তাঁবুর গোটানো ফ্ল্যাপ পার হয়ে হাতের ডানদিকে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম টু-ওয়ে ট্র্যান্সমিটারটা দেখতে পেল ওরা। বামদিকে মেঝেতে ডক্টরের বিছানা। তাঁবুর মাঝখানে পেটমোটা একটা চুলোয় আগুন জ্বলছে। পিছন-দেয়ালের কাছে ওঅর্ক-বেঞ্চ। ওটার উপর পড়ে থাকা জিনিসটা দৃষ্টি কাড়ল রানার।

'এ-ই আমার সনিক মিরাকল, মিস্টার রানা,' গর্বের সঙ্গে বললেন ডক্টর ইমতিয়াজ।

বিগগেম হান্টিং রাইফেলের চেয়ে আকারে বড় হবে না ওটা, স্টকটাও কোনও একটা রাইফেলেরই, তবে ওখানেই শেষ হয়ে গেছে সব সাদৃশ্য। আড়াই ফুট দীর্ঘ ব্যারেলটার ব্যাস দু'ইঞ্চি, ব্যারেলের শেষে ফিট করা হয়েছে প্যারাবোলিক রিফ্লেক্টর, লক্ষ্যস্থির করবার জন্য ওটার গায়ে একটা খাঁজ। স্টকের নীচে প্রায় কাঁচের মত স্বচ্ছ একটা প্লাস্টিকের বাক্স, ওটার ভিতরে কয়েকটা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট ও সরু তামার তারের কয়েল।

'খেয়াল করলে দেখবেন ওটাতে কোনও ট্রিগার নেই,' বললেন ডক্টর ইমতিয়াজ। 'ট্রিগারের কোনও দরকারই নেই আসলে। স্টকের এই বাটন টিপলেই প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিকাল সার্কিটগুলো অ্যাকটিভেটেড হয়।' অস্ত্রটার দিক থেকে রানার দিকে তাকালেন ডক্টর, বুঝে নিয়েছেন বাংলাদেশি প্রতিনিধি দলের নেতা ও। 'আপনি হয়তো জানতে চাইবেন সনিক মিরাকল কীভাবে কাজ করে। খুব সহজ ভাষায় বলছি। মিয়া তানসেনের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন—সুরের সাহায্যে কাঁচ ফাটিয়ে দিতে পারতেন তিনি। ঠিকভাবে উপযুক্ত শব্দ-তরঙ্গ পাঠাতে পারলে শুধু কাঁচ কেন, যে-কোনও কঠিন পদার্থকেই চুরমার করে দেয়া সম্ভব। অনেক দূর থেকেও। আলট্রাসনিক তরঙ্গ নিয়ে আমার গবেষণায় আমি দেখেছি, এমন একটি অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব, যেটা দিয়ে ক্যামেরার মত অটো-ডিসট্যান্স সেট করা যাবে, যে-পদার্থকে ডিযিন্টিগ্রেট করতে চান, অটোমেটিকালি তার মলিকিউলার ফরমেশন নির্ধারণ এবং রিফ্র্যাকশনের মাধ্যমে নিখুঁত...'

'ডক্টর,' খুকখুক করে কাশল রানা, 'ভুল লোককে বলছেন আপনি এসব। আমার ব্রেনওয়েভের অনেক উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে তথ্যগুলো।'

'ও, আচ্ছা, আচ্ছা! আপনি জানতে চান জিনিসটা কাজ করে কি না, এই তো?' মৃদু হাসলেন ডক্টর ইমতিয়াজ, বুঝতে পেরেছেন, উলুবনে মুক্তো ছড়াতে যাচ্ছিলেন তিনি। একটা ওভারকোট গায়ে চড়ালেন তিনি। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'করে। আপনার সহকারীকে নিয়ে তৈরি হয়ে আসুন, দেরি না করে রওনা হয়ে যাব আমরা টার্গেট প্র্যাকটিস করতে।'

তাঁবুতে ফিরে আরও একটা করে সোয়েটার গায়ে দিল রানা ও তারেক মাহমুদ, তারপর আবার বের হলো। খানকে আশপাশে কোথাও দেখতে না পেয়ে আপনমনে জিজ্ঞেস করল রানা, 'গেল কোথায় লোকটা?'

'দুপুরে দেখলাম ছিপ-বড়শি নিয়ে হ্রদের দিকে যাচ্ছে,' বলল মাহমুদ, 'রাতে রান্নার জন্যে মাছ ধরতে বোধহয়।'

ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজের 'টার্গেট রেঞ্জ' প্রায় একমাইল দূরে। ক্রমে উপরে উঠে যাওয়া অব্যবহৃত পাহাড়ি হাঁটা-পথে একটানা একঘণ্টা চড়াই ভেঙে তিনটে মাঝারি উচ্চতার পাহাড় ডিঙিয়ে চতুর্থ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠে ওখানে পৌঁছাতে হলো ওদের।

'এসে গেছি,' গভীর একটা চওড়া খাদের কিনারায় থেমে বললেন ডক্টর। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছেন।

কিনারা থেকে সরাসরি অন্তত আটশো ফুট নীচে নেমে গেছে খাদের খাড়া দেয়াল। দুশো গজ দূরে একই সমান উচ্চতায় খাদের ওদিকের কিনারা। ওখানে বড় ধরনের ভূমিধস হয়েছিল। কিনারা থেকে ঝোপঝাড়, বড়বড় গাছ ভেঙে নিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়েছে প্রকাণ্ড সব পাথর-খণ্ড, দগদগে ঘায়ের মত ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে জায়গাটা।

'ওই দেখুন, ওটা আমার সনিক মিরাকলের কার্যকারিতার জলজ্যান্ত প্রমাণ,' আঙুল তুলে ভূমিধসের জায়গাটা দেখালেন ডক্টর ইমতিয়াজ।

'আমরা নিজেরা একবার অস্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই, ডক্টর,' নরম সুরে বলল রানা। তবে বলবার সুরে বুঝিয়ে দিল, এ ছাড়া শুধু লেকচারে সন্তুষ্ট হবে না ও।

মাথা দোলালেন ডক্টর, মাফলারটা একহাতে ভালমত পেঁচিয়ে নিলেন গলায়। 'নিশ্চয়ই দেখবেন, মিস্টার রানা। ওদিকের ঢালে ওই গাছটা দেখতে পাচ্ছেন? ওই যে, যেটার মাথায় দুটো শকুন বসে আছে?'

'পাচ্ছি।'

'এবার খেয়াল করে দেখুন।' অস্ত্রটা কাঁধে তুললেন ডক্টর ইমতিয়াজ, ডানহাতের কনুই ভাঁজ করে উপরে উঠিয়ে বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে চাপ দিলেন স্টকের লাল বাটনে। মনে হলো স্টকের ভিতরে ব্যস্ত হয়ে গুঞ্জন তুলেছে অসংখ্য ভ্রমর।

খাদের ওদিকে তাকিয়ে গাছটাকে ছিটকে হাজারো টুকরো হয়ে যেতে দেখল বিস্মিত রানা ও মাহমুদ। ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা ছিঁড়েখুঁড়ে দক্ষিণে ভাসিয়ে নিয়ে গেল জোরালো বাতাস।

'মিস্টার মাহমুদ, এবার আপনি ধরুন দেখি,' ক্যাপ্টেনের হাতে সনিক মিরাকল ধরিয়ে দিলেন ডক্টর ইমতিয়াজ, কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছলেন হাতের উল্টোপিঠে। 'ওই পাথরটায় তাক করুন। দেখতে পাচ্ছেন? ওই যে ওটা—সবচেয়ে বড়টা। যেটার একটা পাশ চ্যাপ্টা। দেখুন লাগাতে পারেন কি না! রিকয়েল নেই, নিশ্চিন্তে মারুন।'

নার্ভাস চেহারায় সনিক মিরাকল কাঁধে ঠেকিয়ে লক্ষ্যস্থির করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, তারপর ডক্টরের মত করে চাপ দিল লাল বোতামে। গুঞ্জন উঠল স্টকের ভিতর।

এবারের বিস্ফোরণের আওয়াজটা হলো আগের চেয়ে অনেক তীক্ষ্ণ, অনেক জোরালো। চারটে অসমান খণ্ডে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল নিরেট বোল্ডার।

রানার দিকে তাকালেন ডক্টর ইমতিয়াজ। 'এবার আপনি,

মিস্টার রানা। নিজে ব্যবহার করে দেখুন এই মিরাকলের ক্ষমতা কতখানি। আপনার সঙ্গীর চেয়ে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদে আরও দক্ষ, কাজেই কঠিন টার্গেটই দিচ্ছি—ওই দূরের টিলার চূড়ায় একটা মরা গাছ দেখতে পাচ্ছেন? পারবেন ওটা উড়িয়ে দিতে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।' ক্যাপ্টেন মাহমুদের হাত থেকে অস্ত্রটা নিয়ে কাঁধে তুলল রানা। ওভারকোটের পকেটে দু'হাত ভরে নিশ্চিন্ত চেহারায় দূরের গাছটার দিকে তাকালেন ডক্টর ইমতিয়াজ।

বাটন স্পর্শ করল রানা। আবার সেই গুঞ্জন উঠল, তার পরপরই টুকরো টুকরো হয়ে নানাদিকে ছিটকে গেল দূরের ওই গাছ। বিস্ফোরণের আওয়াজটা এসে পৌঁছুল দেড় সেকেণ্ড পর।

'সন্তুষ্ট?' কৌতুকভরে রানার চোখে তাকালেন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। 'চলুন, ফেরা যাক। মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে।' রানার হাত থেকে অস্ত্রটা নিয়ে নিলেন তিনি, তারপর বললেন, 'ফেরার আগে একটা কাজ বাকি রয়ে গেছে।'

কয়েক পা সরে পাহাড়ের মাথায় খাদের ধারে পড়ে থাকা পাথরগুলোর কাছে থামলেন ডক্টর ইমতিয়াজ, দু'হাতে শক্ত করে ব্যারেলটা ধরে মাথার উপর তুলে ফেললেন সনিক মিরাকল, তারপর রানা কিংবা তারেক বাধা দেবার আগেই গায়ের জোরে নামিয়ে আনলেন ওটা পাথরগুলোর উপর। ফেটে গেল প্লাস্টিকের বাক্স, ওটার ভিতর থেকে খসে খাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল ভাঙা ট্র্যানযিস্টর, ক্যাপাসিটর ও অসংখ্য ইলেকট্রনিক সার্কিট ও যন্ত্রাংশ।

আরও কয়েকবার আছড়ে অস্ত্রটাকে ভাঙাচোরা ধাতব নল ও কাঠের জঞ্জাল বানিয়ে ফেললেন ভদ্রলোক, যখন বুঝলেন ওটা আর কারও কোনও কাজে আসবে না, তখন ছুঁড়ে ফেলে দিলেন খাদের ভিতর। চোখের পলকে নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল

সনিক মিরাকলের ধ্বংসাবশেষ। একটু পর শক্ত কিছুর উপর ওটার পতনের আওয়াজ ভেসে এলো আবছাভাবে।

'কেন, ডক্টর?' নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ফিরে চলুন, তারপর বলব,' ঘুরে দাঁড়ালেন ডক্টর ইমতিয়াজ, গম্ভীর চেহারায় রওনা হয়ে গেলেন ফিরতি পথে।

ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল আকাশ ভেঙে। বাড়ল বাতাসের জোর।

রানার পাশে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাপ্টেন মাহমুদ বলল, 'পাগল নাকি লোকটা!'

জবাব দিল না রানা।

ওরা তাঁবুতে ফিরে পোশাক পাল্টানোর পনেরো মিনিট পর নড়ে উঠল তাঁবুর ফ্ল্যাপ, ভিতরে ঢুকলেন ডক্টর ইসমাইল ইমতিয়াজ।

'বসুন,' তাঁকে নিজের বিছানাটা দেখাল রানা।

মাথা নাড়লেন ডক্টর। 'বসব না। আলাপটা সেরে ফেলতে এলাম।'

'বলুন?'

'আমি কি বাংলাদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পাচ্ছি?' রানার চোখে তাকালেন ডক্টর ইমতিয়াজ, রানা চুপ করে থাকায় আবার বললেন, 'অত্যাধুনিক একটা ল্যাবোরেটরি দিতে হবে আমাকে, সেই সঙ্গে সমস্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। বদলে আপনাদের হাতে তুলে দেব আমি সনিক মিরাকল তৈরির নকশা।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'আমাদের দেশে একটা মাত্র ল্যাবোরেটরি আছে, যেটাতে আধুনিক সবরকম ইকুইপমেন্ট পাবেন আপনি। তবে ওখানে যিনি গবেষণা করেন, তাঁকে কাজ করতে হয় কড়া নিরাপত্তা ও প্রহরার মধ্যে, ল্যাবোরেটরির সমস্ত নিয়ম মেনে। ওখানে অ্যারোনটিক্সের ওপর রিসার্চ করছেন...'

'কোনও আপত্তি নেই আমার। ...অ্যারোনটিকাল সেক্টরেও কিছু কাজ করব আমি। আমার যে-কোনও আবিষ্কার নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা। কথা দিতে পারি, কোনও আপত্তি করব না।'

'ডক্টর নাদিরার নাম শুনেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। জবাবের অপেক্ষা না করে নিজেই বলল, 'চিনের কাছ থেকে উপহার পাওয়া দুটো ঈগল ফাইটার জেট নিয়ে আমাদের একমাত্র টপ-প্রায়োরিটি সিক্রেট ল্যাবোরেটরিতে গবেষণা করছেন তিনি। আপনি নিজেও হয়তো আগ্রহী হবেন তাঁর কাজে। "দুরন্ত ঈগল" প্রজেক্টে আপনার মত প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে পেলে বোধহয় কৃতজ্ঞ বোধ করবে আমাদের সরকার।'

একটু দ্বিধায় ভুগলেন ডক্টর ইমতিয়াজ, ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'নামটা চেনা চেনা লাগছে। একটা গুজব কানে এসেছে বটে আমার, বাংলাদেশ নাকি চিনের সাহায্য-সহযোগিতায় একটা সুপার ফাইটার জেট তৈরি করেছে। ডক্টর নাদিরা বোধহয় ওগুলোর ডেভেলপমেন্ট ও ইমপ্রুভমেন্ট নিয়েই কাজ করছেন? ল্যাবোরেটরি শেয়ার করতে ভাল লাগবে না, তবে এর চেয়ে অনেক কঠিন শর্তেও রাজি না হয়ে আসলে উপায় নেই আমার। পালাতে পালাতে পেরেশান হয়ে গেছি আমি।'

'আপনি চান আমরা আপনাকে নিয়ে যাই আমাদের দেশে,' বলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, 'আর সেজন্যেই নষ্ট করে ফেললেন আপনার সনিক মিরাকল?'

'হ্যাঁ।' নিজের মাথায় টোকা দিলেন ডক্টর ইমতিয়াজ। 'ওটার ডিযাইন আছে শুধু এখানে। আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় আর নিজের ইচ্ছেমত গবেষণার সুযোগ দেবার বদলে ডিযাইনটা পেতে পারে বাংলাদেশ।'

'ভালমত না ভেবে ঝটপট এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'বসের সঙ্গে

যোগাযোগ করব, আশা করি কালকেই জানতে পারবেন আমাদের সিদ্ধান্ত।'

মাথা দোলালেন ডক্টর ইমতিয়াজ। 'বেশ। বহু পথ হেঁটেছি আমি!' ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, মনে হলো হঠাৎ করেই যেন রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বললেন, 'আমাকে আমার ল্যাবোরেটরিতেই পাবেন।'

'সিদ্ধান্ত যা-ই হয়, কাল দুপুরের আগে আপনাকে জানিয়ে দেব আমি,' পিছন থেকে বলল রানা।

কেটে গেল বাদলঝরা সন্ধ্যা, নামল নিকষ কালো রাতের আঁধার। এখনও ঝরঝর ঝরছে বারিধারা।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে অস্থির বোধ করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, বারবার ভাবল মাসুদ ভাইকে ডেকে তোলে, কিন্তু এত গভীর ঘুম থেকে তুলতে শেষপর্যন্ত ইচ্ছে হলো না। হঠাৎ এত ঘুম কেন, ভেবে একটু অবাকই লাগল ওর।

দুপুরের আগে অবশেষে গভীর ঘুম থেকে জাগল রানা। শুয়ে থেকেই হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল ও, বিড়বিড় করে বলল, 'মরে গেছি! বাবারে! হাড় মুড়মুড়ি ব্যারামে ধরেছে আমাকে! সারা শরীর টিসটিস করছে ব্যথায়!' আস্তে আস্তে উঠে বসল ও শক্ত মেঝেতে, চোখ পিটপিট করে দেখল ক্যাপ্টেন মাহমুদকে, তারপর ঘুম-জড়ানো স্বরে বলল, 'আলতাফকে রেডিও করে বলো, এসে নিয়ে যাক আমাদেরকে এখান থেকে।'

হ্যাভারস্যাক খুলে খুদে ট্র্যান্সমিটারটা বের করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। 'সঙ্গে নিশ্চয়ই ডক্টর ইমতিয়াজকেও নিচ্ছি আমরা?'

আড়ষ্টভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা। 'সেটাই তো আমাদের মিশন, তা-ই না?'

তিন

পরদিন সকাল সাড়ে ন'টা।

বসের ডাক পাওয়ার জন্য নিজের অফিস কামরায় তারেক মাহমুদকে নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। একটু আগে দু-কাপ কফি রেখে গেছে রানার সেক্রেটারি মিথিলা। কফির কাপে মৃদু চুমুক দিয়ে টেবিলের ওদিকে বসা ক্যাপ্টেনের দিকে মেজর জেনারেলের ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল রানা। এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বলল, 'দোয়া-দরুদ যা জানো পড়তে থাকো, মাহমুদ। একটু পরেই পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল জানিয়ে দেয়া হবে তোমাকে।'

কফির কাপটায় তৃতীয় চুমুক দিতে যাচ্ছিল রানা, খ্যানখেনে সুরে বেজে উঠল ইন্টারকম। একটা বাটন টিপে স্পিকার অন করল ও। ইলোরার কণ্ঠ ভেসে এল। তাগাদার ভঙ্গিতে বলল সে, 'মাসুদ রানা, ক্যাপ্টেন মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে এক্ষুনি তোমাকে দেখা করতে বলেছেন বস্। ইমিডিয়েটলি।'

'ও, বস্?' হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। মধু-ঝরানো কণ্ঠে বলল, 'তোমার আর্জেন্সি দেখে আমি ভেবেছিলাম ডাকছ তুমি!'

'সাবধান!' নিচুকণ্ঠে বলল ইলোরা। 'বসের লাইন কিন্তু খোলা!'

হেসে উঠল রানা। 'ওসব চাপাবাজি রাখো তো, সুন্দরী। আগে বলো আজ রাতে কোথায় আমরা একসঙ্গে ডিনার...'

'ডিনারের অনেক দেরি আছে,' ভারী, গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল ইন্টারকমে। আঁৎকে উঠল রানা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার

ছেড়ে, কাপ থেকে ছলকে টেবিলের উপর পড়ল কফি। 'আপাতত এসো, হাতের কাজটা সেরে নেয়া যাক,' বলেই খটাস্ করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন রাহাত খান।

খিলখিল করে হেসে উঠল মিথিলা।

হাস্যরতা সেক্রেটারির দিকে ভ্রূ কুঁচকে কটমট করে তাকিয়ে তিন সেকেণ্ডে ওকে ছাই বানিয়ে দিল রানা, তারপর তারেক মাহমুদকে ইশারা করে বেরিয়ে পড়ল নিজের অফিস-কামরা থেকে। কফি ফেলেই ছুটল ওরা লিফটের দিকে।

ইলোরার কৌতুকপূর্ণ তির্যকদৃষ্টি গায়ে না মেখে মেজর জেনারেলের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, টাইয়ের নট ঠিক করে নিয়ে দু'বার টোকা দিল দরজায়।

'কাম ইন!' ভেসে এলো পরিচিত গুরুগম্ভীর কণ্ঠ।

রানার পিছু নিয়ে ঢুকল তারেক মাহমুদ, মুখটা শুকনো।

'বসো।' সিগার তাক করে চেয়ার দেখালেন রাহাত খান। ওরা বসতেই রানার দিকে তাকালেন। 'ডক্টর ইমতিয়াজকে ছেড়ে এসেছ কোথায়?'

'কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে, সার,' জবাব দিল রানা। 'আমাদের তুহীন আর রূপম তাঁর দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে।'

'বডিগার্ডকে ওই দুর্গম এলাকায় ফেলে আসতে গড়িমসি করেনি ডক্টর?'

'সামান্যই। যুক্তিবাদী মানুষ, সার। বডিগার্ড লোকটা হরিণ শিকার করতে বেরিয়ে গেছে, কখন ফিরবে তার ঠিক নেই; এদিকে সি-প্লেন হাজির। ভারতীয় এলাকায় তার অপেক্ষায় অনির্দিষ্ট সময় বসে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এসব বিবেচনা করে অখুশি হলেও ওর জন্যে একটা চিঠি লিখে রেখে রওনা হয়ে গেছেন।'

সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে মুখটা আড়াল করলেন মেজর জেনারেল। 'মাহমুদ, রিপোর্ট লেখা হয়েছে তোমার?'

'জী, সার।'

'তা হলে, মাহমুদ, রিপোর্টে যা লিখেছ সংক্ষেপে তা মুখে শোনাও আগে।'

নড়েচড়ে বসল ক্যাপ্টেন।

'আমাদের পুরো অ্যাসাইনমেন্ট পরিকল্পনা-মাফিক এগিয়েছে, সার,' সন্তুষ্টির সঙ্গে বলল সে। 'অ্যাসাইনমেন্ট টোটালি সাকসেসফুল, সার। সনিক মিরাকলটা অবশ্য সঙ্গে করে আনতে পারিনি আমরা। তবে ডক্টর ইমতিয়াজ যেহেতু ওটার নাড়ি-নক্ষত্র জানেন, কাজেই বড় কোনও ক্ষতি হয়নি। শীঘ্রি আমরা আরেকটা সনিক মিরাকল...'

'ওটা যে-কেউ বানাতে পারে,' উৎসাহী তরুণকে থামিয়ে দিলেন নিরাসক্ত রাহাত খান।

'সার?' চোখ বড় বড় করে একবার রাহাত খান, আরেকবার রানাকে দেখল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। 'কিন্তু ওরকম একটা অস্ত্র...'

রানার দিক থেকে তারেকের দিকে সিগার তাক করলেন মেজর জেনারেল। 'রানা, ওকে বলো ওটা কী।'

'তুমি একটা খেলনা দেখেছ, মাহমুদ,' বলল রানা। 'খেলনাটা গুঞ্জন তোলে, আর গাছ বা পাথর বিস্ফোরিত হয়। তুমি একবারও খেয়াল করোনি কোথায় আমরা লক্ষ্যস্থির করব, সেটা ঠিক করে দিচ্ছিল স্বয়ং ইসমাইল ইমতিয়াজ। গোটা ব্যাপারটা ছিল একটা পাকিস্তানী ধাপ্পাবাজি।'

'জী?'

'ধাপ্পাবাজির খেলায় ওর বেঁধে দেয়া নিয়মে না খেললে তুমিও ধরতে পারতে,' বলল রানা। 'যখন আমার পালা এলো, মরা গাছটায় তাক করতে বলল আমাকে, মনে আছে?' মাহমুদ মাথা ঝাঁকানোয় বলে চলল রানা, 'ওই গাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ফাঁকা জায়গায় তাক করলাম আমি। তাতে ফলাফল পাল্টায়নি, ঠিকই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে গাছটা।'

বারকয়েক হাঁ করে আবার মুখ বন্ধ করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, কথা বলতে পারল না। তারপর ভাষা ফিরে পেল, 'কিন্তু... কিন্তু...'

'ডিনামাইট,' এক কথায় জবাব দিল রানা। 'আর সেজন্যেই এমন একটা দিন বেছেছিল লোকটা, যখন আমাদের দিক থেকে টার্গেটের দিকে বইবে বাতাস। নইলে ধোঁয়ার গন্ধ নাকে আসত, ওর চালিয়াতি ধরে ফেলতাম আমরা। আরও দেখো, নিজেদের পছন্দমত কোনও টার্গেট বেছে নিয়ে আমরা একটা-দুটো গুলি করার আবদার যাতে না করতে পারি, সেজন্যে ডেমনস্ট্রেশন হয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি ভেঙে ফেলেছিল ও খেলনাটা। ভালো মতো পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ রাখেনি। বৃষ্টির ছুতোয় আমাদের নিয়ে ফিরতি পথ ধরেছিল ঝটপট।'

রানা চুপ করে যাওয়ার পরও কিছু বললেন না রাহাত খান। ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, 'যা বললেন সেসব কি অনুমান, নাকি প্রমাণও আছে এসবের, মাসুদ ভাই?'

'প্রমাণ আছে,' বলল রানা। 'রাতে তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়লে, চড়াই-উতরাই ভেঙে আমি ফিরে গিয়েছিলাম ওই খাদের ধারে। খাদ পার হয়ে টার্গেটগুলোর গোড়া থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছি। ওখানে একজনের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে ফিরতে প্রায় ভোর হয়ে গিয়েছিল, সেজন্যেই গতকাল ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছে আমার। সংগ্রহ করা নমুনাগুলো আমাদের ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। ফুলার্স আর্থ আর মোম মাখানো কাগজ পাওয়া গেছে ওগুলোতে।'

'ফুলার্স আর্থ?'

'তিনভাগ নাইট্রোগ্লিসারিনের সঙ্গে একভাগ ফুলার্স আর্থ দেয়া হয় এ-ধরনের ডিনামাইটে। মিশ্রণটাকে একসঙ্গে রাখতে মুড়ে রাখা হয় মোম মাখানো কাগজ দিয়ে।'

সিগারে টান দিয়ে ওটা নিভে গেছে দেখে অ্যাশট্রেতে নামিয়ে

রাখলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক-সময়ে ওগুলো ফাটাল কী করে ওই নকল ইসমাইল ইমতিয়াজ?'

'ও ফাটায়নি, সার। ও শুধু ইশারা দিয়েছে। নিজে যখন লক্ষ্যস্থির করল, তার আগে মাফলার ঠিক করেছিল। তারেকের বেলায় কপাল থেকে ঘাম মুছেছিল। আর আমার বেলায় ওভারকোটের পকেটে পুরে দিয়েছিল দু'হাত। খাদের ওদিকের পাড়ে ফিল্ডগ্লাস নিয়ে লুকিয়ে বসে ছিল তার সহকারী গাফফার। ইশারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ডেটোনেটর অ্যাকটিভেট করেছে সে।'

বিস্ময় কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন মাহমুদ, 'আপনি কি শিওর, না আন্দাজ করছেন, মাসুদ ভাই?'

'শিওর। রাতে ওখানে গাফ্ফার খানের ক্যাম্পে গিয়েছিলাম আমি।'

'কপাল ভাল যে বেঁচে ফিরতে পেরেছেন,' অস্ফুট স্বরে বলল তরুণ ক্যাপ্টেন। 'লোকটার হাতের টিপ সাজ্মাতিক।'

ওর কথাটা শুনতে পেয়ে রানা বলল, 'সত্যিই, হাতের টিপ খারাপ ছিল না লোকটার।'

রানার মুখে "ছিল" শুনে একটু থমকে গেল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। তার মানে বদমাশটা খতম! সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'এতসব কেন করল ওরা, মাসুদ ভাই?'

'আসাম থেকে নকল বিজ্ঞানীকে নিয়ে ফেরত আসবার আগেই ওই প্রশ্নের জবাবটা বুঝে ফেলা উচিত ছিল তোমার,' গম্ভীর চেহারায় বললেন রাহাত খান।

'কিন্তু আমাদেরকে ডক্টরের যে ডোশিয়ে দেখানো হয়েছে, তাতে সাঁটা ছবি আর ওই লোকের চেহারা তো একদম একইরকম, সার!' বিড়বিড় করল মাহমুদ।

'ট্রু কপি,' বলল রানা। 'কিন্তু নিখুঁত প্লাস্টিক সার্জারিতেও সূক্ষ্ম

একটা দাগ থেকে যায়। ওই লোকটার মুখের বামপাশেও ওরকম একটা চুলের মত সরু দাগ ছিল। ইসমাইল ইমতিয়াজ দুনিয়ার অন্যতম সেরা একজন ফিযিসিস্ট। কয়েক মাস আগে নিখোঁজ হয়ে গেছেন তিনি, অথচ তাঁকে জোরেশোরে খুঁজছে না পাকিস্তান সরকার, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার? বিজ্ঞানীকে উদ্ধারের ব্যাপারে পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্সের সেরকম কোনও তৎপরতার খবর আসেনি আমাদের কাছে। ওরকম কোনও তথ্য পাওয়া গেলে ব্রিফিঙের সময় সার উল্লেখ করতেন। এ থেকে আমি ধরে নিই, আসল বিজ্ঞানী পালাননি। তা হলে ওই লোকটা কে? কার প্রতিনিধিত্ব করছে ও? লোকটার তাঁবুতে আমরা যখন ঢুকলাম তখন একটা আমেরিকান ট্র্যান্সমিটার দেখেছিলাম, তুমি খেয়াল করেছিলে? ওটাই বলে দিচ্ছে লোকটার আসল পরিচয়।'

'ঠিক!' ঘন ঘন কয়েকটা ঢোক গিলল ক্যাপ্টেন মাহমুদ। 'সিআইএ!' চট করে রাহাত খানের দিকে তাকাল সে। 'সার, আমি কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'করো।'

'আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি তো জেনে গেছে ওরা! এ-ক'দিনে যত গোপন তথ্য...'

হাসির সূক্ষ্ম রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল মেজর জেনারেলের ঠোঁট থেকে। 'যখন বিজ্ঞানীকে ফ্রিকোয়েন্সি জানানো হয়, তার পর থেকেই আমাদের ওই ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিয করে রাখা হয়েছে।' তাকালেন তিনি রানার দিকে। 'গো অন, রানা।'

'নকল বিজ্ঞানী বলেছিল, পার্টসগুলো তৈরি করতে হবে অত্যাধুনিক গবেষণাগারে, তার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে। রাজনৈতিক আশ্রয় ও গবেষণার সুযোগ চেয়েছিল সে। আসলে চেয়েছিল আমাদের টপ সিকিউরিটি গবেষণাগারে ঢুকতে। অ্যারোনটিকাল সেক্টরেও কাজ করতে চায় জানিয়ে আমাকে খেলিয়ে তুলতে চাইল নকল ডক্টর ইমতিয়াজ। আমিও টোপ ফেললাম, বললাম: ডক্টর

নাদিরার সঙ্গে দুরন্ত ঈগল প্রজেক্টে হয়তো রিসার্চ করতে পারবে সে। গড়িমসির ভাব করে ঢোঁপটা গিলল। দুরন্ত ঈগলের ব্যাপারে চিনের কাছ থেকে কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে না সিআইএ, কাজেই নজর দিয়েছিল ওরা আমাদের ওপর। হয়তো ধরে নিয়েছিল, তৃতীয় বিশ্বের গরীব এই দেশটা থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হবে। আমরা যখন টের পেতাম বিস্ময়কর অস্ত্র সনিক মিরাকল আসলে ভুয়া, ততক্ষণে আমেরিকার দালাল নকল ইসমাইল ইমতিয়াজ চলে যেত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অ্যাকসেস কোড জেনে নিয়ে ল্যাবোরেটরির কম্পিউটার টার্মিনালে বসতে পারলে ডিভিডিতে গোপন গবেষণার যাবতীয় তথ্য রাইট করে নিয়ে সরে পড়ার প্ল্যান ছিল ওর। তার পালানোর ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখা হয়েছিল নিশ্চয়ই। টপ প্রায়োরিটি রিসার্চ ল্যাবোরেটরির সিকিউরিটি সিস্টেম নতুন করে ঢেলে সাজাচ্ছেন আমাদের বিশেষজ্ঞরা। আমরা আশা করছি সিকিউরিটি ফ্ল-র ব্যাপারে শীঘ্রি মুখ খুলবে নকল বিজ্ঞানী, জানা যাবে কীভাবে কী করার ইচ্ছে ছিল তার। এরইমধ্যে সিআইএ-র প্লটিং সম্বন্ধে মুখ খুলেছে লোকটা। জানা গেছে পাকিস্তানি সামরিক সরকার আমেরিকার সুনজরে থাকতে সিআইএ-র কথায় নেচেছে। পত্রিকার খবর, গাড়িবোমা, আত্মঘাতী বোমা—সব ভুয়া।'

রানা চুপ করে যাওয়ার পর নীরবতা নামল বিসিআই চিফের অফিসে। মাঘের শীতেও দরদর করে ঘামছে তারেক মাহমুদ, বারকয়েক ঢোক গিলল। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ওকে নেয়া হবে না বিসিআই-এ। জীবনের প্রথম অ্যাসাইনমেন্টেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ও। লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল ছেলেটা, মুখ নিচু করে কোলের উপর ফেলে রাখা হাতের দিকে চেয়ে বসে থাকল চুপচাপ।

'তুমি এসো, তারেক,' জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন রাহাত খান।

চমকে উঠে দাঁড়াল তরুণ ক্যাপ্টেন, বুকের কাছে ঝুলে পড়েছে মাথা। সালাম দিয়ে স্খলিত পায়ে বেরিয়ে চলে গেল।

রানার দিকে তাকালেন বিসিআই চিফ। 'ওয়েল, রানা? হোয়াট অ্যাবাউট হিম?'

'ওকে দিয়ে হবে, সার,' নির্দ্বিধায় বলল রানা, 'সাহস আছে ওর। দেশপ্রেমেরও কমতি নেই। বাকিটুকু ঠিকই শিখে নেবে।'

'আচ্ছা। চিঠি পরে যাবে, তবে যেরকম ভেঙে পড়েছে, ওর পরীক্ষার ফলাফল আনঅফিশিয়ালি ওকে জানিয়ে দিতে পারো তুমি।' পাশ থেকে মোটা একটা ফাইল টেনে নিলেন রাহাত খান, মনোনিবেশ করলেন ওতে।

এর মানে, এবার বিদায় হও, বাছা। আমার কাজ আছে।

নিঃশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, পা টিপে বেরিয়ে এলো বুড়ো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের খাঁচা থেকে। দরজাটা ভিড়িয়ে দেয়ার আগে কানে এল, মৃদুকণ্ঠে বললেন ওর পিতৃসম ব্যক্তিটি, 'ইট উঅয আ গুড জব, মাই বয়!'

'থ্যাঙ্ক ইউ, সার,' বলে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। কট্টর বুড়োর প্রশংসা পেয়ে আনন্দে বুকটা ভরে গেছে ওর।

***

মাসুদ রানা

বিপদে সোহানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

[পাঁচটি উপন্যাসিকা]

বিপদে সোহানা

নড়বড়ে এক স্কটিশ দুর্গে সোহানাকে আটকে রেখে রানাকে হাতের মুঠোয় পেতে চাইছে পুরনো এক শত্রু। বোঝাই যায়, খবরটা শুনে মাথা খারাপ হয়ে গেল রানার। তারপর?

খুনের দায়

নিউ ইয়র্কের রানা এজেন্সিতে হাজির হলেন লইয়ার অ্যাডাম ক্লিপটন: একজন মানুষকে খুঁজে দিতে হবে। দায়িত্ব নিল গিলটি মিয়া, তাকে খুঁজে বেরও করল। কিন্তু সেইদিনই খুন হয়ে গেল লোকটা। এবং দায় চাপল...

এমনি আরও তিনটি রোমাঞ্চকর কাহিনি

রানা-সোহানা

খুনে পিশাচ

ও

বিদেশি বৈজ্ঞানিক

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!

www.Banglapdf.net